একাত্তরের স্মৃতি

(অধ্যায় ১, ৩- ৬, ৮- ১০ ও ১২)

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ১৪ই জানুয়ারী ১৯২০ সালে বর্তমান মাগুড়া জেলার আলোকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যে অধ্যয়ন করে ১৯৪২ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। পি এইচ ডি করেছেন ইংল্যান্ডের নটিংহাম ইউনিভার্সিটিতে ১৯৫২ সালে।

তাঁর শিক্ষকতার জীবন শুরু হয় ১৯৪৪- এ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে। ১৯৪৮- এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধান পদে ছিলেন। ১৯৬২ সালে প্রফেসর পদে উন্নিত হন। ১৯৬৯ এ তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯৭১- এর জুলাই মাসে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত তিনি বিদেশে চাকরি করেছেন। ১৯৭৫ এর জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত ইংল্যন্ডের কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির ক্লেয়ার হলের ফেলো ছিলেন। এরপর মক্কার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর অব ইংলিশ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৫ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসায়েন ইংরাজী ও বাংলায় একাধিক বই লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস (দুই খন্ডে) এবং Islam in Bengali Verse (ফররুখ আহমদের সিরাজম মুনিরার কাব্যানুবাদ) বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

প্রকাশক : মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের পক্ষে
মুহম্মদ আশরাফ হোসেইন

প্রথম প্রকাশ: ১ অগ্রহায়ণ ১৪০০,
২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪১৪
১৫ নভেম্বর ১৯৯৩

যোগাযোগ : নতুন সফর প্রকাশনী
৪৪, পুরানো পল্টন (দোতলা)
ঢাকা- ১০০০, ফোন : ২৪৩৮৮৮

Published Electronically by
www.storyofbangladesh.com

সূচী

মুখবন্ধ

ক'দিন আগে একজন জুনিয়র বন্ধু ফোন করে বললেন যে তিনি একটি বই পুনর্মুদ্রন করতে চান। জুনিয়র বন্ধুটি যেহেতু ইতিমধ্যেই তিন তিনখানা সাহসী বই লিখেছেন- (১) আমি আলবদর বলছি, (২) দুই পলাশী দুই মীরজাফর, (৩) দুই পলাশী দুই আম্রকানন এবং যে কারণে আমি তার সাহসের এযাবৎকাল প্রায় দুই দশকব্যাপী প্রশংসা করে চলেছি, তাই এই নতুন সাহসী কাজে তার উৎসাহ এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগে আমি না করতে পারিনি। যে বইটি পুনর্মুদ্রন করতে চান সেই বইটি জীবন স্মৃতির কিছু বিষয়ে লিখিত। মরহুম ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন এর 'একাত্তরের স্মৃতি'।

বইখানির বিষয়াদি ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে লিখিত। বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। এর আগে সেসব বিষয়াদি আশরাফ হোসাইন সম্পাদিত মাসিক 'নতুন সফর' এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ আশরাফ হোসাইন লেখকের বাড়ীতে ১০৯নং নাজিমুদ্দীন রোডে গিয়ে বসে বসে দিনের পর দিন নোট লিখে নিতেন। তারপর ধারাবাহিকভাবে সেসব প্রতিমাসে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতেন। আমার মত অনেকেই সেসব পড়ে অভিভূত হতাম বটে। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের পক্ষে সেসব প্রকাশিত অংশবিশেষ সংকলিত করে লেখকের জীবিতকালেই বই আকারে (২০৭ পৃষ্ঠা) প্রকাশ করি। বইটি আমরা কোনরূপ বাণিজ্যিক কারণে প্রকাশ করিনি, করেছিলাম হরিয়ে যাওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য রেকর্ড করে রাখার জন্য। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জানা- শোনার পরিধি- কিঞ্চিৎ হলেও সুস্পষ্ট করার কারণে। ভূরি ভুরি অসত্য, আধা সত্য, আজগুবি ও মনগড়া প্রপ্যাগান্ডার বিপরীতে সঠিক তথ্যাদি রেকর্ড করে রাখার উদ্দেশ্যে।

শুরুতে লেখকের কিছু পরিচিতি এবং আমার সাথে তাঁর সম্পর্কের কিছু জরুরী কথা বলা প্রয়োজন। সেসব বিষয় এখানে উলেখ করা এজন্য নয় যে, লেখকের অহেতুক একটি ইমেজের ছবি তুলে ধরা, বরং এজন্য যে তিনি ইতিমধ্যেই যেভাবে প্রায় হারিয়ে গেছেন- অথচ তাঁর মাপের একজন জ্ঞাণী- গুণী- মহান ব্যক্তির জীবন থেকে অনেক কিছুই শিখবার আছে। অনুকরণ করারও অনেক বিষয়ই আছে।

বর্তমান বাংলাদেশের মাগুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি বিগত শতাব্দীর ১৯২০ সালের ১৪ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ

করেন। নিজস্ব মেধার কারণেই সেই সময়কালের পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবেই স্কুল- কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পর্যায়ের লেখাপড়া কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করে ১৯৫২ সালে ইংল্যান্ডের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র দু'বছরের গবেষণা কাজ শেষ করে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরেজী সাহিত্যে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী কৃতিত্বের সাথে লাভ করেন। এ সময়ে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি- এর ইংরেজী বিভাগের লেকচারার পদে আসীন ছিলেন। সেখান থেকেই ডেপুটেশনে উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য ইংল্যান্ডে যান। এর আগে ১৯৪২ সালে ইংরেজীতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. ডিগ্রী করেন। এরপর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে লেকচারার পদে প্রথম কর্ম জীবনে পদার্পণ করেন। উলেখ্য যে সে সময়কালে কলকাতা এবং বিশেষ করে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই সময়েই তিনি ওখানকার ইংরেজী কমরেড পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখতেন। কমরেড ছিল মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের ইংরেজী ভাষার মুখপত্র স্বরূপ। এর আগে যখন তিনি ঢাকায় এম.এ. ক্লাসের ছাত্র তখনই ঢাকায় যে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠিত হয়- অর্থাৎ পাকিস্তান বাস্তবে হাসিল হবার কয়েক বছর আগেই- তখন তাঁকেই করা হয়েছিল এই পরিষদের প্রধান বা চেয়্যারম্যান। সৈয়দ আলী আহসান যিনি কিনা তার চেয়ে তিনমাসের বয়সে ছোট এবং চাচাতো ও খালাতো ভাই তিনি ছিলেন সেক্রেটারী। সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন তাদের আরও একটু ছোট সৈয়দ আলী আশরাফ। অর্থ্যাৎ তারা সবাই ছিলেন একই পরিবারের। প্রত্যেকেই ছিলেন মেধাবী এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র। পরবর্তী জীবনে প্রত্যেকেই শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। কলকাতায় যখন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ইসলামিয়া কলেজের লেকচারার পদে যোগদান করেন, তখনই সেখানে যে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি কায়েম হয়, তারও তিনি চেয়্যারম্যান হয়েছিলেন। খেয়াল করার বিষয় এই যে পাকিস্তান কায়েম হবার কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি শুধু পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখার কঠোর কর্মীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুসলমানদের কালচারাল বিষয়ে নেতৃত্বের পর্যায়েও কঠোরভাবে কর্মরত। এরপর পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট কায়েম হলে পর তিনি বদলি হয়ে আসেন সিলেটের এম.সি. কলেজে। সেখান থেকেই বছর খানেকের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেই তিনি বিশ বছর ইংরেজী বিভাগের লেকচারার পদ থেকে প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান পর্যন্ত পদে কাজ করার পর ১৯৬৯ সালে

রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভি.সি. পদে আসীন হন। সেখানে প্রায় আড়াই বছর থেকে পরে ১৯৭১ এর জুলাই মাসে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একই পদে বদলি হন। এরপর তাঁর জীবনের ঘটনাদির কিছু বিবরণ তিনি সেই সময়ের বিশ বছর আগে লিখিত উল্লেখিত বইটিতে লিখে রেখেছেন।

আমার সাথে তাঁর পরিচয়ের কোন সুযোগ হয়নি ১৯৭৯ সালের আগে যদিও আমি যখন একাত্তরের সেই ভয়ানক দিনগুলিতে আইনের ক্লাসের ছাত্র ছিলাম, এবং তিনি ভি.সি. ছিলেন। ঢাকায় তখন আমি এস এম হলের অনাবাসিক ছাত্র হিসাবে তাঁর সাথে সামনা সামনি দেখা- সাক্ষাৎ হয়নি প্রায় নিয়মিত ল' এর ক্লাস করার সময়ে। তবে নামে চিনতাম বৈকি।

১৯৭৯ এর শেষে কিংবা ১৯৮০ এর প্রথমে তাঁর সাথে ১০৯নং নাজিমুদ্দীন রোডে তাঁর একটি মেসেজ পেয়ে সেখানে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। মেসেজটি ছিল লন্ডনের আমার এক ঘনিষ্ঠজনের। সাজ্জাদ সাহেব তখন মক্কার উমুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজীর অধ্যাপকের চাকুরী করতেন। লন্ডন হয়ে ঢাকা আসবার সময় আমার সেই বন্ধু ডঃ মতিয়ুর রহমান তাঁর মাধ্যমেই আমাকে মেসেজটি পাঠিয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য হল যে আমি সেই সুযোগে তাঁর সাথে প্রথম পরিচিত হতে পারলাম। এর আগে একাত্তরের পর তাঁর মত আরও অনেক জ্ঞাণী- গুণীরা যে বাংলাদেশে ধিকৃত হয়ে চলেছিলেন তা আমাকে চরম ব্যাথা দিত। আমি তাঁদেরই একজনের সাথে সৌভাগ্যবশতঃ পরিচিত হতে পারলাম।

এরপর তিনি ক'দিন পর সৌদি আরবে চাকুরীতে চলে গেলে পর আমি পত্রে তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখি। তিনিও নিয়মিত আমার পত্রের উত্তর দিতেন। ১৯৮২ সালের অক্টোবরে আমি একটি বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডন চলে যাই। সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে পত্রে যোগাযোগ একইভাবে করে চলি। মধ্যে আমি যখন ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে ঢাকা ফিরে আসি, তখন তিনি শারীরিক অসুস্থ্যতার জন্য মক্কা থেকে পূর্ণ অবসর নিয়ে ঢাকা চলে আসেন। এ সময় বছর খানেক আমি ও উনি উভয়েই ঢাকায় থাকি। তখন মাঝে মধ্যেই দেখা- সাক্ষাৎ হত। কথাবার্তাও হত অনেক বিষয়ে। এরপর আমি আবার লন্ডন চলে যাই আমার সেখানে থিসিস এর কাজ শেষ করার জন্য। এই কাজ শেষ হতে অনেক সময় লাগে। একটি কারণ এই ছিল যে আমি এক্সটারনাল ছাত্র হিসেবে থিসিস করতাম পূর্ণকালীন ছাত্র হবার মত অর্থ- ফি দেয়ার সামর্থ ছিলনা এবং একই সাথে পার্ট টাইম কাজ করতে হত জীবন ধারণ এবং একই সাথে দেশে পরিবারের খরচপাতি যোগান দেয়ার জন্য।

তবে তাঁর সাথে পত্র যোগাযোগে কোনরূপ গাফিলতি করিনি। আর তিনিও প্রতিটি পত্রেরই জবাব দিতেন বলা যায় তড়িৎ। কোন সময় একটু দেরী হলে এপোলোজি চাইতেন। আমি লজ্জা পেতাম, তাঁর সাথে এভাবে প্রায় ৮/৯ বছর যাবৎ যেসব পত্রালাপ করেছি তাঁর উত্তর ছিল মোট ৬৪টি। এসবের ৬২টি চিঠি পরে ২০০৪ সালের শেষে তাঁর ইন্তেকালের ১০ম মৃত্যু বার্ষিকীতে (১২/০১/০৫ইং) 62 Letters of Dr Syed Sajjad Husain এই শিরোনামে প্রকাশ করতে পেরে আমি আল্লাহর হাজার হাজার শোকরিয়া করেছিলাম। তাঁর যে দু'টি চিঠি এই বইটিতে সংযোজিত করতে পারিনি তার কারণ এই যে ঐ দু'টি তখন আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হাতের কাছে পাইনি, অনেক পরে বইটি ছাপানোর পর পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমি লন্ডন থেকে ১৯৮৯ এর শেষে ঢাকা ফিরে আসার পর আর মাত্র পাঁচটি বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। এ সময় প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত। দেশ নিয়ে আলোচনাও করতাম। এ সময় তিনি লেখালেখি করতেন। আমি প্রায়ই ডিকটেশন নিতাম বিশেষ করে ইংরেজী ডিকটেশনগুলি যা আমি নিজেই কম্পিউটারে টাইপ করে দিতাম। আমি নিজেও কোন কিছু লেখা তাকে দেখাতাম বিশেষ করে ইংরেজী শুদ্ধ করার জন্য। এ সময়েই তাঁর ইংরেজীতে লেখা জেলখানায় বসে মেমোইরস আকারের পান্ডুলিপিটি লন্ডনের সেই একজন ঘনিষ্ঠজনের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়। ওটির একটি ফটোকপি বাঁধাই করে তিনি আমার হাতে দেন। আমি কিছু বন্ধু- বান্ধবদের কাছে ধর্ণা দিয়ে ওটি মুদ্রিত বই আকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করি। ওটির প্রুফ উনি দেখে দিচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্য এই যে ওটির সম্পূর্ণ প্রুফ দেখে শেষ করার আগেই ১৯৯৫ সালের ১২ই জানুয়ারী তিনি অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৭৫বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এর আগের দিন ১১ই জানুয়ারী সন্ধ্যার আগে আমার সাথে তাঁর শেষ সংক্ষিপ্ত দেখা হয়। সে দিনই প্রায় ঘন্টাখানেক আগে তিনি একটি সুদীর্ঘ ইংরেজী নিবন্ধ লিখে লন্ডনের ইংরেজী পাক্ষিক ইমপ্যাক্ট এর ঢাকায় আগত একজন সাংবাদিকের হাতে দিয়ে দেন। ঐ পত্রিকায় তিনি ছদ্মনামে লিখতেন। তবে সেই নিবন্ধটি সেভাবেই প্রকাশিত হলে পর সম্পাদক সেই আইটেমটির শেষে নোট দিয়ে তার আসল নামঠিকানা প্রকাশ করে তাঁর ইন্তেকালের খবরও দেন। সেই পাক্ষিকটি- ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল- এ আমি নিজেও মাঝে মধ্যে ছোট- খাটো নিবন্ধাদি লিখতাম এবং তাই সেই সম্পাদকের সাথে পরিচয় ছাড়াও মরহুম সাজ্জাদ সাহেবের কয়েকটি ছদ্মনামও আমি জানতাম। একটি ছিল নাসিম হায়দার। ঢাকায় প্রকাশিত তার লেখায় ছদ্মনাম ছিল আল- বোগদাদী, (বাগদাদ থেকে পূর্ব পুরুষরা এসেছিলেন),

আলতাফ আলী (তাঁর দাদার নাম) ইত্যাদি। আমার সাথে পত্রালাপেও তিনি কোন কোন সময় আলতাফ আলী ব্যবহার করতেন। এ ধরণের ছদ্মনাম ব্যবহারের কারণ আন্দাজযোগ্য। একদিকে সাবধানতা, অন্যদিকে ভীতিও।

তাঁর শেষ জীবনে আমার যে প্রায় ১৫ বছরের যোগাযোগ তাতে আমার মনে হয়েছে যে শত ভয়- ভীতি, হুমকি, জীবন- জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর মুসলিম জাতিসত্ত্বার এবং সেই কারণে পাকিস্তান কায়েমের মূল আদর্শ এবং লক্ষ্য থেকে তিলমাত্রও নড়চড় হননি। একই সাথে ১৯৭১ উত্তর বাংলাদেশ যেন সেই সত্ত্বার ভিত্তিতেই টিকে থাকে, তাইই তিনি কামনা করতেন। তবে এও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের চতুর্মূখী আগ্রাসী থাবা- যে থাবারই অংশ ছিল সেনা আক্রমণ- তা থেকে তুলনামূলকভাবে অতি ক্ষুদ্র বাংলাদেশ আত্মসম্মান নিয়ে চিরস্থায়ীভাবে সার্বভৌম অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকবে তাতে তিনি গভীর সন্দেহ পোষন করতেন। তাঁর ইন্তেকালের ক'দিন আগে সেই নাজিমুদ্দিন রোডের বাড়ীতে বসেই তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি তো চলে যাচ্ছি (অর্থাৎ পরপারে) এরপর যাদের রেখে যাচ্ছি তারা স্বাধীনভাবে বাঁচবে নাকি গোলাম হবে, সে দুশ্চিন্তা নিয়েই যেতে হচ্ছে"।

প্রসঙ্গতঃ একটি ঘটনা বোধ করি এখানে উলেখ করা যায়। ঘটনাটি আমি ওনার ইন্তেকালের অনেক পর কিছুদিন আগে শুনেছি। যার মুখে শুনেছি এবং রিকনফার্ম করেছি তিনি এখানও সুস্থ সবল ভাবে বেঁচে আছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরতও আছেন শেষ বয়সে। তিনি একাত্তরের পর স্বল্প সময়ের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতবাস করেছিলেন, কেননা, তিনি একজন ইসলামী বিষয়ে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি বা শেষ সময়ে যখন সাজ্জাদ সাহেব ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজে ফেলোর অফার পান, তখন তাঁর পাসপোর্ট নেয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যেহেতু তিনি 'দালাল' আইনে অভিযুক্ত হয়ে জেলে হাজতবাস করেছেন দুটি বছর তাই তার পাসপোর্ট পাবার জন্য খোদ প্রাধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের লিখিত ক্লিয়ারেন্স নেয়ার নিয়ম ছিল। এই ক্লিয়ারেন্স নেয়ার জন্য সেই লেকচারার সাহেব সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী সেই লেকচারারকে যেহেতু ঘনিষ্ঠভাবেই চিনতেন, তাই তিনি ক্লিয়ারেন্স লিখে দেন। সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী এও নাকি আফসোস করে বলেন যে "আমার বাংলাদেশে আমার শিক্ষকই থাকতে পারছেন না"। বলাবাহুল্য যে এই তিনি যখন ১৯৪০ এর দশকে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র, তখন সাজ্জাদ সাহেব ঐ

কলেজেরই ইংরেজীর লেকচারার ছিলেন। এই একই রাজনীতিকের একটি উদ্ভট উক্তি, করাচীর এল্ফিস্টোন রোডের মত অতি পুরাতন রাস্তা নাকি পূর্ব পাকিস্তানের পাটের টাকায় সুদৃশ্য করা হয়েছিল, তার উলেখ 'একাত্তরের স্মৃতি' তে লেখক নিজেই উলেখ করেছেন। এটি ১৯৫৬ সালের কথা। ওখানে ঘটনাচক্রে করাচীর সদর এলাকায় দেখা হওয়াতে তিনি তেমনটি মন্তব্য করেছিলেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি তার গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে সাথে তিনি পাকিস্তানের শাসকদের অবিবেচক এবং নির্বুদ্ধিতার বিষয়ও শুধু ঐ বইটিতেই নয়, বরং আরও অনেক জায়গাতেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। আমাকেও মাঝে মধ্যে বুঝিয়ে বলতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর জেলখানায় বসে ইংরেজীতে দু'বছরকাল ব্যাপী লেখা অনেকটা আত্মজীবনীমূলক বইখানি- THE WASTES OF TIME: REFLECTIONS ON THE DECLINE AND FALL OF EAST PAKISTAN (1995)- ঐতিহাসিকভাবে সেসব অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সমাহার বটে। এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমি জেনেছিলাম। এখানেও একটি দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে পারলে ভাল হত।

সাজ্জাদ সাহেবের জীবিতকাল নয়, বরং তাঁর ইন্তেকালের ১০ মাস পর ঐ পরিবারেই আমাদের বড় ছেলে বিয়ে করে। এ কারণে ঐ পরিবারের অনেক তথ্যাদি পরে আমার জানার সুযোগ হয়েছিল। ঐ পরিবারের একই আলোকদিয়ার বাড়ীতে যারা চাচাতো ও খালাতো ভাই- বোন হিসেবে বড় হয়েছিল, তাদেরই সবচেয়ে বয়সে যিনি বড় ছিলেন, অর্থ্যাৎ আমার বড় ছেলের বউ এর নানী তার মুখেই শুনেছি যে সাজ্জাদ সাহেব সেই ছোট বেলাতেই সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর তিন মাসের বয়সে ছোট ছিল এবং কম বুদ্ধিমান ছিল। একই সাথে পরবর্তীতে আমরা যা দেখি তা হল, অন্য অনেকের মত তিনি আদর্শিক প্রশ্নে কোন কমপ্রোমাইজ করতেন না। অটল অনড় থাকতেন। অন্যদিকে ক্ষণিকের বাহবা পাবার জন্যও তিনি সস্তা কোন কথা বলতেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এই মহামানবটি কোনরূপ ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। পরিবারে পীরমুরিদীর রেওয়াজ বা সিলসিলা থাকলেও তিনি তা পছন্দ করতেন না। অথচ নিজে ছিলেন মনে- প্রাণে পাক্কা ঈমানদার মুসলমান। একই সাথে আধুনিক চিন্তা, চেতনা এবং অভ্যাসের একজন উন্নত রুচির মানুষ। বাইরের কোন দাওয়াতে এমনকি ইফতার পার্টিতে গেলেও তিনি তার জামার পকেটে ফর্ক- স্পুন ও টিস্যু পেপার নিয়ে যেতেন- হাত- ধোয়া মোছার জন্য পানির খরচ বাঁচাবার এবং

কাউকে বিরক্ত না করার জন্য। অনেকে এতে আড়চোখ করত। কিন্তু তিনি কোন কিছু মনে করতেন না।

১৯৭৪ সালের শেষে এবং পঁচাত্তরের প্রথম দিকে সাজ্জাদ সাহেব ইতিহাসের ডঃ মোহর আলী, রাজনীতি বিজ্ঞানের ডঃ হাসান জামান কিছু কিছু ছোটখাট গবেষণার কাজ নিয়ে ইংল্যান্ডে যান। তখনও আমি লন্ডনে থাকতাম। এ সময়ে সাজ্জাদ সাহেবের সাথে কোন যোগাযোগ আমার হয়নি; কেননা, উনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে একজন গবেষণা ফেলো হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তবে মোহর আলী এবং হাসান জামান যেহেতু লন্ডনেই ছিলেন কিছুদিনের জন্য তাই এদের দু'জনের সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। একদিন মনে পড়ে হাসান জামানকে একটি দোকান থেকে সস্তায় হোমিওপ্যাথি ঔষধ কিনে দিয়েছিলাম। আর একদিন ডঃ মতিয়ুর রহমান তার অর্থ কষ্ট কিছুটা হলেও কমানোর জন্য মাত্র ১০টি পাউন্ড এর একটি নোট আমার হাতে করেই তাকে পৌঁছিয়েছিলেন।

ঐ সময়ে সাজ্জাদ সাহেবের সাথে দেখা- সাক্ষাৎ পরিচয় না হলেও পরে ১৯৮৪ সালে তিনি যখন মক্কা থেকে চাকুরীতে ছুটি নিয়ে লন্ডন হয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন, তখন সেখানে তিনি উঠেছিলেন ডঃ মতিয়ুর রহমানের বাড়ীতে ৬৫ এলফিনস্টোন স্ট্রীটের ঠিকানায়। তার বছর আড়াই আগেই মতিয়ুর রহমান ইন্তেকাল করেছিলেন। উনার ঐ বাড়ীতে উঠার একটি কারণ এই ছিল যে তিনি মতিয়ুর রহমানের সর্বশেষ বইটির পান্ডুলিপি সংশোধন করছিলেন, এ বিষয়টি তিনি আমাকে সরাসরি বলেননি, নির্ভরযোগ্য সূত্রে শুনেছি খুব সম্ভব ইতিহাসের অধ্যাপক ওয়াহিদুজ্জামান ভাই এর কাছে। আরও শুনেছি যে তিনি মতিয়ুর রহমান এর ছ'টি মূল্যবান ঐতিহাসিক বই এর সবগুলিই দেখে দিয়েছিলেন ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন উন্নত শৈলী- সংযোজন করার জন্য। মতিয়ুর ১৯৫০ এর দশকের শুরুতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন, তিনি মরহুম আবুল কাসেম এর সাথে বাংলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস- প্রিন্সিপ্যালও ছিলেন। ছাত্রলীগ করতেন। তবে ১৯৮২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী লন্ডনে ইন্তেকাল করলে পর তারই ইচ্ছা অনুসারে তার নিজের জন্মস্থান আহম্মদপুর- নবীনগর ব্রাক্ষনবাড়িয়া নয়, বরং ইসলামাবাদের জাতীয় কবরস্থানে দাফন করা হয় (কবর নং ৪/৩১)। এক সময় ২০০৩ সালে আমি সে কবর জেয়ারত করেছি, একই সাথে পাবনার সাংবাদিক ফজলুর রহমানের কবরও। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে সেই একই কবরস্থানে জেয়ারত করি মরহুম মাহমুদ আলীর কবরও। উপরে যে ক'জন

ক্ষনজন্মা পুরুষের নাম করলাম তারা সাজ্জাদ সাহেবের মতই একই মুসলিম জাতিসত্ত্বার আদর্শে বিশ্বাস করতেন। যেমন পাকিস্তান জাতিসত্ত্বার চিরন্তন রূপে বিশ্বাস করার কারণেই চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় সেই একাত্তরের পর এখানও বাংলাদেশে ফিরেন নাই। তাঁর মা বিনীতা রায় এবং ছেলে দেবাশীষ রায় পালাক্রমে বাংলাদেশের মন্ত্রীর পদে আসীন হলেও। আমার সাথে ত্রিদিব রায়ের ইসলামাবাদে দেখা হয় সর্বশেষ ২০০৪ এ। এত বয়সেও তার মানসিক সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সাজ্জাদ সাহেবের মধ্যে স্বাতন্ত্র চেতনা খুবই তীক্ষ্ণ ছিল। এ কারণে তিনি বিগত শতাব্দীর নব্বই এর দশকের শুরুতে ইন্তেকালের অল্প কিছুদিন আগে একখানা ইংরেজী- বাংলা ডিকসনারী তৈরী ও সম্পাদনায় হাত দেন। এটির বাংলা শব্দাদির ব্যবহারে তিনি স্বাতন্ত্র্যের সচেতন দৃষ্টি রেখেছিলেন। সেটির কাজ তিনি শেষ করেছিলেন বটে, তবে আজও মুদ্রিত আকারে সেটি আলোর মুখ দেখেনি। দেখবে কিনা এখানো বলা যাচ্ছে না। তাঁর এ ধরণের স্বাতন্ত্র্য চেতনা এবং কাজ কর্মকে অনেকে ‘সাম্প্রদায়িকতা’ লেবেল দিতে চেয়েছে। এ কারণে আরও তার বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হয় যে তিনি ঢাকা হাই মাদ্রাসা পড়া ছাত্র ছিলেন। অথচ আমি অনেক উদাহরণ দেখেছি যে তার অনেক উচ্চশিক্ষিত অমুসলমান ঘনিষ্ঠ বন্ধু- বান্ধব ছিল। তার ইন্তেকালের আগে দেখতাম যে তাঁরই বাসার বৈঠকখানায় একজন প্রৌঢ় হিন্দু ভদ্রলোক তার ছেলের ইংরেজী পি.এইচ.ডি. থিসিস নিয়ে কোন কোনদিন একা এবং কোনদিন ছেলেসহ আলোচনাদি করতেন। এজন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম তার কোন কোন প্রাক্তন ছাত্র ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে নাস্তিক মার্কসিষ্ট হয়েছিলেন তাতে তিনি কষ্ট পেলেও মেনে নিতেন।

১৯৮৪ সালেরই ঘটনা। একদিন লন্ডন থেকে ট্রেনে করে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে তাঁরই কাজে তাকে সঙ্গ দিয়েছিলাম। তিনি ১৯৭১ এর পর লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতেন একটি পায়ে জোর পেতেন না। সেই ট্রেনেই একজন ভারতীয় হিন্দু অধ্যাপকের সাথে অল্পক্ষণের মধ্যেই খুব খাতির জমিয়ে বসলেন। সেদিনই কেমব্রিজের একটি লাইব্রেরী থেকে তিনি আমাকে কয়েকটি বই কিনে উপহার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল ড্যমিনিক ও ল্যাপ্যারির ‘ফ্রিডম এ্যাট মিড নাইট’। সেই চুরাশির জুনে তিনি যখন বেশ কদিন লন্ডনে ছিলেন, তখন কেউ কেউ তার সাথে দেখা করতে চাইলে আমিই সময় ফিক্স করে দিতাম। তবে মনে পড়ে একজনের সাক্ষাৎকারে তিনি রাজী হননি, ব্যক্তিটি ছিলেন তার একাত্তরের

ঢাকার শেষ সময়ের ভিসি এর পি.এ., তিনি তখন কোন একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স করার জন্য লন্ডনেই ছিলেন এবং আমার সাথে পরিচয় ছিল।

লন্ডনের আর একদিনের ঘটনা আমার মনে পড়ে। তিনি আমাকে নিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের মার্কস এন্ড স্পেনসারের দোকান থেকে একশ পাউন্ড দামের একটি স্যুট কিনেন, এবং চার্চ স্যু এর দোকান থেকে ষাট পাউন্ড দিয়ে এক জোড়া জুতা কেনেন। মার্কস এন্ড স্পেন্সার মধ্যবিত্তদের পোষাকের দোকান হলেও চার্চ স্যু কিন্তু তা ছিল না, এখনও নয়। চার্চ স্যু’ই আমি যতটুকু জানতাম লন্ডনের সবচেয়ে দামী এবং অভিজাত জুতার দোকান। পরনের কাপড়- চোপড় এর ব্যাপারে তাঁকে খুবই কেতাদুরন্ত দেখা যেত। একই সাথে খাবার ব্যাপারে বেশ চুজি ছিলেন। এ কারণেই কিনা তিনি খুব ভাল কিছু রান্না- বান্না নিজেই করতেন। এমনকি নাজিমুদ্দীন রোডের বাড়ীতেও ভিন্ন অনেক কাজের এবং রান্না- বান্না করার লোকজন থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করে মেহমানকে খাওয়ানোর জন্য।

তার এ ধরণের কেতা দুরস্ত হাব- ভাবের জন্য অনেকেই তাঁর বিরূপ সমালোচনা করত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি শিক্ষকতা করতেন তখনও তার নিন্দুকের অভাব ছিল না। এমনকি ঘোর পাকিস্তানপন্থীরাও। কেননা, তাঁর কাছে অন্যায়- যেই করুক না কেন, অন্যায় বলেই তিনি তেমন খারাপ কাজের জন্য সবাইকে তিরস্কার করতেন। যেমন করতেন ভূল ইংরেজী উচ্চারণের জন্যও। একাত্তর সালে যখন তিনি নিজের আদর্শিক রাজনৈতিক অবস্থান নেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণাগুলি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। তাই ঐ সময়ে কলকাতা বেতার থেকে সরাসরি দেবদুলালরা নয় বরং আখতার মুকুল ধরনের অনেকেই তাঁকে শাসাতে থাকে যে তাঁকে তাঁর অফিসেই খুন করা হবে। সেই খুনটিই ওরা সেই অফিসেই না করতে পারলেও সেই ইউনিভার্সিটিরই একটি কক্ষে তেমনটি করে মৃত মনে করে ২০শে ডিসেম্বর (৭১) অতি ভোরে তার ‘মৃতদেহ’ গুলিস্তানের সেই মুসলমান আমলের যুদ্ধে ব্যবহৃত কামানের পাশে ফেলে রেখেছিল। কেমন করে সেই মৃত লাশটি বেঁচে গিয়ে আরও প্রায় ২৪টি বছর বেঁচে থেকে এদেশের অসংখ্য অজ্ঞ মানুষের জন্য বেশ কিছু শিক্ষনীয় বিষয় লিখে রেখে গেছেন- তাঁর একাত্তরের স্মৃতি বইখানি তারই একটা উজ্জ্বল নমুনা বলেই আমি বিশ্বাস করি।

২৩শে মে, ২০০৯ইং - মোহাম্মদ তাজামুল হোসেন

কৈফিয়ত

আমার এই স্মৃতিকথা সাহিত্য সংস্কৃতি জনকল্যাণ সংস্থা সেবা'র চেয়ারম্যান আশরাফ হোসেইনের অনুরোধে, তাগিদে এবং অনুপ্রেরণায় লিখতে শুরু করি। আসলে লিখতে নয় আমি মুখে মুখে কথাগুলো বলে যেতাম, আশরাফ হোসেইন ওগুলো লিখে নিতো এবং এ রচনা তারই বিভিন্ন সংকলনে এবং পরে মাসিক নতুন সফরে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে।

কেনো এ স্মৃতিচারণা করতে রাজী হয়েছি সে কথা একটু বলা দরকার। ৭১ এর পর আমরা যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থন করিনি তারা কলাবোরেটের হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলাম। আমি ৭১ এর ডিসেম্বর থেকে ৭৩ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলে ছিলাম এবং তখন থেকে পাকিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইতিহাস সম্বন্ধে এমনসব কথা শুনেছি যা শুধু উদ্ভটই নয়, সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আমাদের কথা বলার সুযোগই ছিল না। আমরা যে, একটা আদর্শে বিশ্বাস করতাম সে স্বীকৃতি পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগের মধ্যে ছিল না।

৪০ সাল থেকে ৪৭ সাল পর্যন্ত যে অসংখ্য তরুণ পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিল, আমি তাদের অন্যতম। কৃতিত্বের জন্য একথা বলছি না, নিজের পরিচয় দেবার জন্য কথাটি উল্লেখ করছি। ৪১-৪২ সালে আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্র, তখন আমাকে সভাপতি করে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠিত হয়। সৈয়দ আলী আহসান ছিল এ সংসদের সেক্রেটারী। আমাদের লক্ষ্য ছিল, বাংলা ভাষায় মুসলিম কালচারের পরিচয় থাকে এমন সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখকদের উদ্বুদ্ধ করা। ১৯৪৪ সালে কলকাতা ইষ্ট পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটি (এর সভাপতি ছিলেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন) যে সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে তাতে ২৪ বৎসর বয়সে সাহিত্য শাখার সভাপতির দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলাম। এরপর সে বছর জুলাই মাসে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে লেকচারার হিসাবে যোগ দেই।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের অনুরোধে, দৈনিক আজাদে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতাম। ১৯৪৬ সালে যখন মাওলানা আকরম খাঁ ইংরেজি সাপ্তাহিক কমরেডের স্বত্ব খরিদ করে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্হা করেন, নেপথ্যে থেকে সেটা সম্পাদনার ভারও আমি গ্রহণ করেছিলাম। তখন দু-একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে সমগ্র মুসলিম সমাজ এই পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য দিনরাত খেটেছে।

আমরা এ স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম যে, ভারতের পূর্বাঞ্চল যদি পাকিস্তানে যোগ দিতে পারে, তাহলে প্রায় দু'শ বছরের গ্লানি এবং অত্যাচার থেকে তারা রক্ষা পাবে।

আমি এ ইতিহাসের উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, পাকিস্তানের প্রতি আমার এবং আমার মতো আরো অনেকের যে অনুভূতি সেটা সন্তানের প্রতি জনকের অনুভূতির মতো। এ রাষ্ট্র আমরাই সৃষ্টি করেছিলাম, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার মুসলিম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন না পেলে, এ অঞ্চল কখনও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না।

আমি পাকিস্তানের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত - কর্মী হিসেবে। আমি রাজনীতিক নই, কোনকালে মুসলিম লীগের সদস্যও ছিলাম না। কিন্তু যে আদর্শের ওপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, তার প্রতি ছিল আমার অকুণ্ঠ সমর্থন। অথচ লক্ষ্য করলাম ৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট এ নতুন রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এক বছর না যেতেই পূর্ব পাকিস্তানিদের বুঝানো হল যে, তাদের অর্থনীতি এবং তামুদ্দনিক দুর্গতির কারণ পাকিস্তান।

৪৮ সাল থেকে ৭১ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি ষড়যন্ত্রের এ অঙ্কুর কিভাবে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার মত ব্যক্তির ছিল না। কিন্তু তা করবার যথা সাধ্য চেষ্টা করতাম। কিন্তু নসিবের এমন পরিহাস যে, ১৯৫৯ থেকে আইয়ুব খানের আমলে আমরাই চিহ্নিত হলাম পাকিস্তানের প্রধান শত্রু হিসাবে। ঐ সালে যখন রাইটার্স গিল্ড গঠনের আলোচনা হচ্ছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকারের কথা বলায় আইয়ুব খানের সেক্রেটারী কুদরত উল্লাহ শাহাব চিৎকার করে আমাকে শাসিয়েছিলেন প্যরিটি বা সমতার কথা যেন উচ্চারণ না করি।

আমি যেটা দুঃখ্য ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি সে ঘটনা হলো এই যে, একদিকে পূর্ব পাকিস্তানে যেমন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কতিপয় রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবীর অদূরদর্শিতার কারণে পাকিস্তানের ভিত্তি ক্রমশঃ দূর্বল হতে আরম্ভ করে। একবার করাচীতে ডক্টর কোরায়শীর মত ব্যক্তিত্বকে আমি প্রকাশ্য সভায় এই বলে ভর্তসনা করি যে, তিনি অকারণে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা ব্যক্ত করতে শুরু করেছেন।

গোলাম মুহাম্মদ যেদিন খাজা নাজিম উদ্দীনকে বরখাস্ত করেন এবং তার কিছু কাল পর গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন তখন থেকেই অবক্ষয়ের স্রোত আরো দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হতে থাকে। এরপর আসে মিলিটারী শাসন। তখন ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শ এবং লক্ষ্য চাপা পড়ে যায়। পাকিস্তানের রাজনীতি পরিণত হয় নিছক একটা ক্ষমতার দ্বন্ধে। এদিকে বিরোধী দলের চাপের মুখে ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক, সরকার এমন কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার পরিণতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ আরো মজবুত হয়ে দাড়ায়। প্রতিবেশী ভারতের কোন অঙ্গ রাজ্যের যে সমস্ত ক্ষমতা ছির না, সে সমস্ত ক্ষমতাই পূর্ব পাকিস্তানকে প্রদান করা হয়। রেলওয়ে, সিভিল সার্ভিস সব ব্যাপারেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি হয়েছিল। কিন্তু অর্বাচীন, নির্বোধ রাজনীতিকদের আচরণে বিরোধী দল পাকিস্তানের জনসাধারণকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, তাদের কোন অধিকার নেই। তারা হিন্দু সমাজের অচ্ছুতদের চেয়েও এক নিকৃষ্ট জাতে পরিণত হয়েছে।

সমাজের বহুলোক সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, পাকিকস্তনে আমরা স্বাধীন হতে পারিনি। ১৯৪৭ সালে নাকি শুধু শাসক বদলের ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশের পরিবর্তে আসে পাকিস্তানীরা। এই যে, শত সহস্র লোকজন রাজনীতিবিদ, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, ইন্জিনিয়ার, ছাত্র যারা ৪৬ সালে ভোট দিয়ে মুসলিম লীগকে জয়ী করেছিল, বেঙ্গল এসেম্বলির যে মুসলিম সদস্যদের ভোটে মাউন্ট ব্যাটেন প্ল্যান গৃহীত হয়, তারা রাতারাতি হয়ে গেলেন বিদেশীদের অনুচর। এখনও এসব কথা শুনি আর ইতিহাসের পরিহাস সম্পর্কে ভাবি।

আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করে চিরকালই অত্যন্ত পীড়িতবোধ করি। আমাদের লোকজন অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত । যে ফজলূল হক সাহেব ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন, ১৯৪৬ সালের ইলেকশনে তিনি মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেন। যে ভাসানী সাহেব সিলেটের গণভোটের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি ১৯৫৪ সালে কাগমারীতে এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে প্রায় প্রকাশ্যেই পাকিস্তানের আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৪৬ সালে ইলেকশনে মুসলিম লীগের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছিল, তিনি গোস্বা করে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ইউনিভার্সিটির যে সমস্ত মুসলিম শিক্ষকের উৎসাহ এবং অনূপ্রেরণায় ৪০ এর দশকে আমরা ছাত্ররা, পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম, কয়েক বছরের মধ্যে তাদের দু'-একজনের মতামতের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের

প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানান ডঃ শহীদুল্লাহ। কার্জন হলের এক সভায় ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি ঘোষণা করেন, আমরা প্রথমে বাঙালী পরে মুসলমান। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এত ধার্মিক ছিলেন যে, একটা সময় ছিল যখন তিনি ছবি তোলাকেও নাজায়েজ মনে করতেন। আবুল মনসুর আহমদের মতো তীক্ষ্নবুদ্ধির লেখক, যিনি লাহোর প্রস্তাব এবং পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস জানতেন, তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে, প্রথমাবধি ভারতের উত্তর- পূর্বে এবং উত্তর- পশ্চিম দু'টো আলাদা রাষ্ট্র হলেই ভাল হতো। ৭১ সালে বাংলাদেশ আবির্ভূত হওয়ার পর তিনি ইত্তেফাকে প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীকে জানান যে, বাংলাদেশের অভ্যূদয় আসলে লাহোর প্রস্তাবের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন। অথচ, তিনি অবশ্যই জানতেন যে, ৪৭ এর ১৪ই আগস্টের আগে আমাদের যে অবস্থা ছিল তাতে, স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করার মতো কোন সামর্থ্য এ অঞ্চলের ছিল না।

এসব অসংগতির কথা যতই মনে হয় ততই এ বিশ্বাস জন্মে যে, চরিত্রগত কারণেই হয়তো আমরা কোন বিশ্বাসকে বেশীদিন অকড়ে ধরে রাখতে পারি না। চারিত্রিক দূর্বলতার কারণে ইতিহাসে বহুবার আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। ৭১ সালে শুরু হয়েছিল স্বাধীন রাষ্ট্রকে নতুন করে স্বাধীন করার এক অদ্ভুত নাটক। স্মৃতিকথায় আমি বলেছি, যে সমস্ত ঐতিহাসিক কারণে পাকিস্তান অনিবার্য হয়ে ওঠে, তার কথা স্মরণ থাকলে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা বন্টনের সমস্যা আমরা অনায়াসে সমাধান করতে পারতাম। আমি আরো দেখিয়েছি যে, ৭১ সালের ২৫শে মার্চ আর্মির যে ক্র্যাকডাউন শুরু হয়, তার পিছনে ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের উস্কানি। আর নির্বোধ আর্মি অপরিকল্পিতভাবে জনসাধারণের ওপর হামলা করে ষড়যন্ত্রের এ ফাঁদে পা দেয়।

আমি জানি অনেকেই হয়তো আমার মতামত গ্রহণ করবেন না। কিন্তু আমাদের দিক থেকে যেভাবে সমস্যাটা দেখেছি, তার একটা রেকর্ড ভবিষ্যতের জন্য রেখে যাওয়া অত্যাবশ্যক। যে হারে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটছে তাতে আরো কত আজগুবি কাহিনী ৭১ সাল সম্পর্কে শুনতে হবে, তা কে বলবে?

আমার মনে আছে ১৯৭২ সালে আমরা যখন জেলে, তখন ইংরেজী অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক মরহুম আবদুস সালাম নতুন বাংলাদেশ সরকারের বৈধতা (Legitimacy) সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, যে উপায়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলো, সেটা একটা বিপ্লব। কিন্তু এই বিপ্লবকে আইনের চোখে বৈধ করতে হলে আরও পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সেদিনকার পত্রিকার সংখ্যা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে সালাম সাহেবকে বরখাস্ত করা হয়। কারণ

বাংলাদেশ সরকার কোন সমালোচনাই বরদাশত করতে রাজী ছিল না। আজও সে অসহিষ্ণুতার ভাব পুরোপুরি কাটেনি। সে জন্য আমি আশা করি না যে, সব পাঠক সহিষ্ণুভাবে আমার বক্তব্যকে গ্রহণ করবে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে সালাম সাহেব পরোক্ষভাবে যে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন এবং যে কথা আমরা আগাগোড়াই বলে এসেছি, তার যথার্থতা প্রমাণিত হয় তখন, যখন - প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই হবে এদেশের মূলনীতি। এ ঘোষণার মধ্যে এই স্বীকৃতিই ছিল যে, এ অঞ্চলে সংখ্যাগুরু সমাজের যে বিশ্বাস এবং জীবনধারা তার উপর নির্ভর করেই নতুন রাষ্ট্রকে এগুতে হবে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ বললে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের কোন যৌক্তিকতা থাকে না। একথা ভারতীয় সাংবাদিক বসন্ত চ্যাটার্জী পর্যন্ত স্বীকার করে গেছেন। বাংলাদেশেরই একশ্রেণীর লোক এই দিব্য সত্যকেও মানবে না। তারা মনেপ্রাণে, ভাবাদর্শে এবং জীবনধারায় নিজেদের এক কাল্পণিক প্রাণীতে রুপান্তরিত করার স্বপ্নে মেতে আছেন।

আরো আশ্চর্য লাগে এই ভেবে, যারা পূর্বাঞ্চলের অধিকার এবং বাংলা ভাষার দাবী নিয়ে এ অঞ্চলকে বিচ্ছিনতার সংগ্রামে উদ্বূদ্ধ করেন তাদেরই একদল বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে নারাজ। এরা চাচ্ছে যত শীঘ্র এ অঞ্চলটা ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়, ততই যেন মঙ্গল। এসব প্রস্তাব তারা যখন তোলে তখন বাংলা ভাষার দাবীর কথা তাদের মনে থাকে না, মনে থাকে না, এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিভাগপূর্ব দুর্দশার কথা।

৬০ এর দশক থেকে আমাদের অনবরত বলা হতো যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের ঠেলায় এদেশের জনগণ নাকি মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছিল। অনেকে বই লিখে এ শোষণের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্বন্ধে অভিযোগ ৬০ এর দশকের শেষদিকে এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানেও কেউ কেউ বলতে শুরু করেন যে, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা যদি পাকিস্তানে থাকতে না চায়, তাদের বেরিয়ে যেতে দিলেই পাকিস্তানের মঙ্গল হবে। ৭০ সালে আমি যে ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে তেহরান গিয়েছিলাম তার একজন সদস্য ছিলেন লয়ালপুর এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির ভিসি। তিনি একদিন কথায় কথায় বললেন যে, ইষ্ট পাকিস্তান যদি সত্যিই বেরিয়ে যেতে চায় তাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। কারণ এই যে, অনবরত অভিযোগের ফলে রাষ্ট্রের কাঠামো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। '৭১ সালে যুদ্ধ করে আমরা সত্যিই

বেরিয়ে এসেছি। আজ পাকিস্তান পারমাণবিক বোমা তৈরীর ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাদের রুপীর মুল্য আমাদের প্রায় তিনগুণ। পাকিস্তান এক সমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু আমরা এই বিশ বছরে কী পেয়েছি? আমাদের ভোগান্তির শেষ নেই। কল-কারখানা দুর্নীতির চাপে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশে স্রোতের মত ইন্ডিয়ার পণ্য আসছে, তা নিয়ে কেউ কেউ চিৎকারও করে। দেশের জনগণের অবস্থা ১৯৭০ সালের তুলনায় অনেক নেমে গেছে। বার্মার মত সর্বধিকৃত রাষ্ট্রের সঙ্গে মোকাবেলা করার শক্তিও আমাদের নেই। ওরা যখনই ইচ্ছা লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এর জোরালো প্রতিবাদ করার সাধ্য আমাদের নেই।

ইন্ডিয়ার কথা তো আলাদা ইন্ডিয়ায় মুসলমানদের উপর শত অত্যাচার হলেও আমাদের প্রতিবাদ করার সাহস হয় না। কাশ্মীরের অধিবাসী যারা ইন্ডিয়ার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে তাদের বাংলাদেশী খবরের কাগজে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হচ্ছে না। কাশ্মীর নিয়ে '৪৭ সালেই বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং জাতিসংঘের সামনে প্রশ্নটা উপস্থাপিত হলে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরবাসীরা তাদের ভবিষ্যত নির্ধারিত করবে। কিন্তু আজ আমাদের সরকার এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করতে সাহস পান না। কারণটা স্পষ্ট।

১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর যখন বিজেপি'র লোকেরা চারশত বছরের পুরানো ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধূলিসাৎ করে দেয়, তখন এর বিরুদ্ধে সরকার প্রবল প্রতিবাদ করতে পারেনি। সামান্য একটু কথা বলা হয়েছিল তাতেই ইন্ডিয়া উষ্মা প্রকাশ করে। এই তো আমাদের স্বাধীনতার স্বরূপ।

রাজনীতিতে যেমন অর্থনীতিতেও তেমনি আমরা সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে আছি। প্রতিমাসে কয়েক হাজার লোককে বেতন দিতে হচ্ছে। তারা কোন মিলশ্রমিক নয় কিন্তু পে- রোলে তাদের নাম রয়েছে। এই দুর্নীতি বন্ধ করার ক্ষমতা সরকারের নেই। কারণ একদিকে তারা ভোটার অন্যদিকে এরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আরো একটা কান্ড ঘটাতে পারে এই ভয়ে সরকার তাদের বেতন দিয়ে যাচ্ছেন এবং শুনেছি এক আদমজী মিলে মাসে কয়েক কোটি টাকা লোকসান হয়।

তবু শুনি সরকার আশা করেন, বিদেশীরা এদেশে মূলধন খাটিয়ে দেশের শিল্পায়নে সাহায্য করবে। এই মর্মে নেতারা অনবরত বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। তারা নিশ্চয়ই জানেন নর্দমায় টাকা ঢালবার উদ্দেশ্যে কোন দেশী বা বিদেশী পুঁজিপতি এগিয়ে আসবে না। পাকিস্তান আমলে যে শোষণ হতো বলে শুনেছি তখন

তো এ রকম অবস্হা ছিল না। তাহলে ঘুরে ফিরে আবার প্রশ্ন করতে হয় কোন অর্থে '৭১ সালে আমরা শৃঙ্খলমুক্ত হতে পেরেছিলাম?

কিন্তু এসব কথা প্রকাশ্যে বলবার উপায় নেই। আর আমরা যারা ১৯৭১ সালে বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থন করিনি তাদের সম্বন্ধে যদৃচ্ছা মিথ্যা কথা বলে বুক ফুলিয়ে চলা যায়। বছর ছয়েক আগে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এক চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ করা হয়। তারা লিখেছিল '৭১ এর গণহত্যার অন্যতম নায়ক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সৌদী আরব থেকে ৭ দিনের ভিসা নিয়ে এসে পাকাপাকিভাবে ঢাকায় বাস করছে। আমি ১৯৮৫ সালে অবসর গ্রহণ করে দেশে ফিরে আসি। আগাগোড়াই বাংলাদেশি পাসপোর্টে চলাফেরা করেছি কিন্তু এ সত্ত্বেও যাচাই করার প্রয়োজন এরা বোধ করেনি।

"৭১ এর দালালরা কে কোথায়" নামক বইটিতেও আমার নাম স্থান পেয়েছে। গত ২৯শে অক্টোবর ১৯৯৩ সালের এক কাগজে এক ব্যক্তি লিখেছেন তিনি নাকি আমাকে বাংলা একাডেমীতে দেখেছিলেন। কিন্তু ঘৃণায় আমার দিকে তাকাতে পারেননি। অথচ কথা হচ্ছে ১৯৭১ সালের পর আমি কোনদিনই বাংলা একাডেমীতে বা ইউনিভার্সিটিতে পা দেইনি। লেখক কাকে দেখেছিলেন জানি না কিন্তু এ রকম একটা মিথ্যা গল্প বানিয়ে প্রকাশ করতে তার এতটুকু বাধা হয়নি। আরো মজার কথা ঐ লেখকই অভিযোগ করেছেন যেহেতু আমি কর্মজীবনে স্যুট পরতাম সুতরাং আমার মত বিদেশী পোশাক পরিহিত লোকের পক্ষে 'স্বাধীনতার বিরোধিতা করা মোটেই বিচিত্র নয়।' যারা ইন্ডিয়ায় গিয়েছিল তাদের মধ্যে যে শত শত লোক স্যুট পরতেন সেটা এই যুক্তিতে গৌণ হয়ে গেল।

এ রকম অপবাদ আরো হয়তো বেরিয়েছে অথবা বেরুবে। আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি - কয় বছর আগে গণ- আদালত করে যখন নানা দাবী উত্থাপিত হয়, আমি অরাজকতার প্রতিবাদ করে মর্নিং সান পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার প্রতিবাদ করে আমারই পরিচিত এক ব্যক্তি বললেন যে, '৭১ এর যুদ্ধে সমর্থন যে করেনি তার পক্ষে এ রকম কথা বলার অধিকার নেই।' এ রকম আরেকটা ঘটনা ঘটে যখন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের সমর্থনে এক বিবৃতিতে আমি স্বাক্ষর করি এখানেও, প্রতিবাদ করে বলা হলো যে এসব কথা বলার অধিকার আমার মতো ব্যক্তির থাকতে পারেনা।

আমি জন্মগতভাবে পূর্ব বাংলার সন্তান। এ অঞ্চলের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার আমার নেই বলে শুনছি। অধিকার দখল করে বসছেন প্রধানতঃ এমন একদল যারা, '৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর

রাতারাতি প্রমোশন এবং উন্নতি লাভের আশায় এ নতুন রাষ্ট্রে ছুটে এসেছিলেন। এদের মধ্যে কেউ ছিলেন উকিল, কেউ সাংবাদিক, কেউ লেখক, কেউ শিল্পী, কেউ ডাক্তার- ইঞ্জিনিয়ার যারা কলকাতার জগতে প্রতিযোগিতায় বেশীদূর এগুতে পারতেন না, বিখ্যাত হওয়াতো দূরের কথা। অনেকে নিঃস্ব অবস্থায় এসে পাকিস্তানে বহু সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। যারা পাকিস্তান না হলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতেন তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পদগুলো দখল করতে পারলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এদের মুখেই শুনলাম শোষণ এবং বঞ্চনার কথা সবচেয়ে বেশী। এবং এদেরই একদল আজ বাংলাদেশকে আবার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দিচ্ছেন।

এই দুঃস্বপ্নের রহস্য আমরা কি করে বুঝবো?

বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য। এর স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব যদি রক্ষিত হয় তবে আমরা যে স্বকীয়তার কথা বলতাম সেটা কিছুটা রক্ষা পাবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ এ অঞ্চলকে পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ যাই বলি না কেন এর মাটিতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং ঘটতে পারে না। সে আকাশ, সে বাতাস, সে গাছপালা, সে নদ- নদী সবই রয়ে গেছে। আমরা এর শুধু ভৌগোলিক নাম বদলিয়েছি। তবে বর্তমানে যে অপচেষ্টা চলছে তার লক্ষ্য হলো, আমাদের শত শত বছরের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে একেবারে মুছে ফেলা। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এ বিপদের আশঙ্কায় খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়তে হয়। আমার বক্তব্য তাই লিপিবদ্ধ করে গেলাম। কেনো পাকিস্তান চেয়েছিলাম, ৭১ সালে আমরা কেনো বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থন করতে পারিনি এবং বর্তমানে কেন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের সম্বন্ধে আমাদের উৎকণ্ঠা সবচেয়ে বেশী তার কৈফিয়ত হিসাবে এই স্মৃতিচারণার মূল্য।

আমি আবার আশরাফ হোসেইনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। সে অনবরত পেছনে না লেগে থাকলে এ বই লেখাই হতো না। যেহেতু আগাগোড়া সমস্ত বইটা ডিকটেশনে লেখা সেজন্য, কোন কোন ঘটনা বা কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বর্ণনার স্বাভাবিকতা যাতে নষ্ট না হয় এই ভেবে, ওগুলোতে হস্তক্ষেপ করলাম না।

অক্টোবর ১৯৯৩ - সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

অধ্যায় ১

সংকটের সূচনা

৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন রাজনৈতিক দূর্যোগ ঘনিয়ে আসে তখন আমি রাজশাহীতে। ভাইস চান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত। ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরই দেশের আবহাওয়ায় একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। নির্বাচনের পূর্বেই আওয়ামী লীগ নেতারা ঘোষণা করেছিলেন যে, তাদের ছয় দফা দাবী আলোচনা সাপেক্ষ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ব্যপারে স্থির নিশ্চয় হলেও এর খুটিনাটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে রাজী থাকবেন। অথচ যখন দেখা গেল দু'টো আসন ছাড়া আওয়ামী লীগ সবগুলো আসনই দখল করতে সমর্থ হয়েছে তখন তারা বললেন যে, ছ'দফার কোন নড়চড় হবে না। এই অনমনীয় মনোভাব সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ বহির্ভূত অনেকের ধারণা ছিল যে শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ করা সম্ভব হবে। কারণ ছ'দফায় স্বায়ত্তশাসনের কথা ছিল, স্বাধীনতার দাবী ছিল না। কিন্তু নির্বাচনে বিজয়ের পরক্ষণেই ঘোষণা করা হল যে আওয়ামী লীগ নেতা রাজনৈতিক আলোচনার জন্য ইসলামাবাদে যাবেন না এবং গণপরিষদের বৈঠক পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। সংসদে নবনির্বাচিত সদস্যরা ঢাকায় বসে হলপ গ্রহণ করলেন যে তারা ছ'দফা থেকে কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না।

এ সমস্ত ঘটনায় আমরা অনেকেই শংকিত বোধ করতে শুরু করি। জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যখন প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগ নেতাকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী রূপে স্বীকৃতি দান করেন তখন ক্ষণকালের জন্য মনে হয়েছিল যে বিপদ কেটে যাবে, কিন্তু এই সময়েই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিহারী এবং ইসলামপন্থী লোকজনের উপর অত্যাচারের কাহীনি প্রচারিত হতে থাকে। এই অত্যাচার কোন কোন ক্ষেত্রে নিধনযজ্ঞে পরিণত হয়। সারা ফেব্রুয়ারী মাস ধরে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এ সময় কত লোক নিহত হয়েছে তার কোন হিসাব প্রকাশিত হয়নি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ যখন বলতে শুরু করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা ইচ্ছামত একটি শাসনতন্ত্র গঠন করবে, তখন দুর্যোগের আশঙ্কা আরো ঘণীভূত হয়ে ওঠে। ইয়াহিয়া সাহেব আওয়ামী লীগের চাপের মুখে গণপরিষদের বৈঠক ঢাকায় স্থানান্তরিত করতে সম্মত হন। কিন্তু আওয়ামী লীগের হুমকিতে ভীত হয়ে জুলফিকার আলী ভূট্টো ঘোষণা করেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যদি শাসনতন্ত্র গঠিত হয়, তাহলে তাদের পক্ষে গণপরিষদে যোগদান করা নিরর্থক হয়ে উঠবে। তাছাড়া তিনি এ আশঙ্কাও প্রকাশ

করেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা ঢাকায় জিম্মি হয়ে পড়বেন। পিপলস পার্টির বহির্ভূত সদস্যরাও যাতে ঢাকায় আসার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন সে উদ্দেশ্যে ভূট্টো সাহেব তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকেন।

এই পরিস্থিতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ না করেই জেনারেল ইয়াহিয়া গণপরিষদের বৈঠক মূলতবি ঘোষণা করেন। এটা ১লা মার্চের ঘটনা। তখন রাজশাহীতে কতগুলো পরীক্ষা শুরু হয়েছে। গণপরিষদ মূলতবির খবর আমার নিজের কানে পৌছবার আগেই শুনলাম, পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা বর্জন করে হল থেকে বেরিয়ে এসেছে। পরীক্ষারত ছাত্ররা কীভাবে গণপরিষদের খবর পেয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এতগুলো ছাত্র সমবেতভাবে কীভাবে হল ত্যাগ করলো সেটা এখনও আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন পূর্বসিদ্ধান্ত কাজ করেছে। সে যাই হোক, সন্ধ্যায় একদল ছাত্র এসে দাবী করলো যে খুলনায় অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাগুলি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। অবশ্য তার আগেই অন্যান্য কেন্দ্রের পরীক্ষাও তারা বর্জন করতে শুরু করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছিল না।

৭ই মার্চ

রাজনৈতিক আপোষের সমস্ত সম্ভাবনাই যেনো নিঃশেষিত হতে লাগলো। ৭ই মার্চ রমনা ময়দানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তারপর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি। সেই সময়ের ইত্তেফাকে একটি সম্পাদকীয়র কথা মনে পড়ে। ইত্তেফাক আওয়ামী লীগের সমর্থন করতো। কিন্তু দেশে একটা গৃহযুদ্ধ ঘটুক এটি তারা কামনা করেনি। তাই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শুভবুদ্ধির অবক্ষয় নিয়ে আক্ষেপ করা হয়। যদ্দুর মনে পড়ে প্রশ্ন করা হয়, আমরা কী সত্যি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছি! ১৫ই মার্চ থেকে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আলোচনা আরম্ভ হয়। তখনো যে সমস্ত কথা শুনেছি তাতে আতঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা হয় যে ইয়াহিয়া এসেছেন অতিথি হিসেবে, অর্থাৎ তিনি যে দেশের প্রেসিডেন্ট সেটা আর সত্য নয়া। এতদসত্তেও ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে ওঠে যে জেনে শুনে সজ্ঞানে দেশটাকে গৃহযুদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আমাদের জীবদ্দশায় তিরিশের দশকে স্পেনের গৃহযুদ্ধের স্মৃতি আমাদের মনে উজ্জ্বল ছিলো; তার ভয়াবহতার কথা আমরা ভুলতে পারিনি। ইরাকে এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে সহিংস অভ্যুত্থানের কথা আমরা জানতাম। মহাযুদ্ধের শেষে গ্রীসে

এবং যুগোশ্লাভিয়ায় অন্তর্দ্বন্ধের ফলে যে রক্তপাত ঘটে সে কথা তখন নেতৃবৃন্দের মনে নিশ্চয়ই ছিলো। তাই কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে অনুরূপ প্রথায় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আমরা রাজনৈতিক সমাধানের পথ সন্ধান করবো।

২২ বা ২৩ তারিখে যখন উদ্বেগ চরমে উঠেছে, আমি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম সাহেবকে ফোন করি। তিনি বললেন যে তিনি আশা করেন যে শেষ পর্যন্ত একটা সমঝোতা হবে। এতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু সব উদ্বেগ ও আতঙ্ক দূরীভূত হয়নি। রাজশাহীতে রাজনৈতিক সংবাদের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হতো ঢাকায় প্রকাশিত খবরের কাগজ এবং গুজবের উপর। গুজবে স্বভাবতই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হতো, আর এ কথাও মনে হয়েছে যে ইউনিভার্সিটির ভিতরে এবং বাইরে একদল লোক ছিল যারা উদগ্রীব হয়ে গৃহযুদ্ধের অপেক্ষা করছিল। একদিন খবর পেলাম, কোনো হলের একটি ছাত্র এ্যাকসিডেন্ট করে জখম হয়েছে। খোঁজ করে জানা গেল সে গেরিলা যুদ্ধের প্রাকটিস করছিল। পাইপ বেয়ে ছাদে উঠবার সময় পড়ে যায়। এ রকম ছোট- খাট ঘটনা প্রায় রোজই হতো।

২৩শে মার্চ

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস। সত্তর সালেও মহাসমারোহে এই দিবস পালন করা হয়। ইউনিভার্সিটির সমস্ত ইমারতের উপর পাকিস্তান পতাকা উড্ডীন করে আমরা দিবসটি উদযাপন করেছিলাম, কিন্তু '৭১ সালের ২৩ শে মার্চ ভোর বেলা উঠে দেখলাম, এডমিনিষ্ট্রেশন বিল্ডিং এর উপর ছাত্ররা বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছে, সবুজ পটভুমির উপর একটি রক্তবর্ণ গোলক এবং তার উপর পূর্ব পাকিস্তানের নকশা। ছাত্ররা এটাকে বাংলাদেশের পতাকা বলতো। তখন পরিস্থিতি এত নাজুক যে পতাকাটি নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করলে অনিবার্যভাবে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ ঘটতো। আমরা বাধ্য হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলাম। ২৪ তারিখে আবার ঢাকায় ফোন করলাম। এবার আমার এক আত্মিয়ার কাছে। মেয়েটির বিবাহ হয়েছিল এক রাজনৈতিক পরিবারে। ভাবলাম সে হয়তো সঠিক খবরটি দিতে পারবে। সে বললো আজকের মধ্যে হয় একটা ফয়সালা হবে নয়তো ইয়াহিয়ার সঙ্গে যে আলোচনা হচ্ছিল তা ভেঙ্গে যাবে। শুনলাম ঢাকার আবহাওয়া খুবই থমথমে।

২৬ শে মার্চের প্রত্যূষ

২৬ তারিখে খুব ভোর বেলা নাইট গার্ড আমাকে বললো চারিদিকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আমি যেন হঠাৎ করে নিচে না নামি। ২৫ তারিখ রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু জানতাম না। রাত্র এগারটার সময় যখন শুতে যাই তখনও রেডিওতে কিছু বলা হয়নি। নাইট গার্ডরাও কিছু টের পায়নি, প্রতিদিনের অভ্যাস মত সকাল বেলায় যখন গোসল করছি তখন আবার নাইট গার্ড খবর পাঠালো, "স্যার! আপনি নিচে আসুন মিলিটারী অফিসাররা আপনার সাথে কথা বলবেন।" আমি তাড়াতাড়ি করে গোসল সেরে নিচে নামলাম। গাড়ি বারান্দায় পা দিয়েই দেখলাম সামনে একজন ছোকরা অফিসার দাঁড়ানো। আমাকে দেখেই সে বললে, আপনি কারফিউ ভঙ্গ করছেন। আমি বললাম, কিসের কারফিউ? আর এটাতো আমার নিজের বাসা। সে বললো, দালানের বাইরে গেলেই কারফিউ ভঙ্গ করা হবে। সারাদেশে কারফিউ জারী করা হয়েছে এবং মিলিটারী দেশের শাসনভার দখল করেছে। আমি বললাম, আমি তাহলে ফিরে যাচ্ছি। জবাবে সে আমাকে বললো, না আপনি আসুন, আপনার সাথে কথা আছে। আমি লনে পা দিতেই সে বললো, আপনার বাসায় কালো ফ্ল্যাগ কেন? প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে ছাত্রদের চাপের মুখে আমরা কালো ফ্ল্যাগ উড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম। এবার সংকটে পড়লাম, ছোকরা অফিসারটি দাবী করলো যে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ ফ্ল্যাগ নামানো না হলে আমার চাপরাশিকে সে গুলি করবে। আমি মোখতারকে বললাম, তুই শিগগির ফ্ল্যাগটি নামিয়ে নিয়ে আয়।

ছোকরা অফিসার এরপর আমাকে বললো যে সারা ক্যাম্পাস মিলিটারির দখলে এবং কেউ কারফিউ ভঙ্গ করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হবে। আমি বললাম, আমি তাহলে ফোনে সবাইকে কারফিউয়ের কথা জানিয়ে দিচ্ছি। অফিসারটি হেসে বলল, কাল রাত ১২ টার পর থেকে আমরা সব ফোনের লাইন কেটে দিয়েছি, তারপর বলল আপনি আমার সঙ্গে গেইট পর্যন্ত হেটে আসুন। যদি কাউকে দেখা যায় তাকে কারফিউ সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেবেন। আমার সঙ্গে যেতে যেতে অফিসারটি প্রকাশ করলো যে গত রাতে তারা শহরে বহু লোককে গুলি করেছে। এর মধ্যে একজন ছিল ইউনিভার্সিটির নাইট গার্ড। আমি চমকিত হয়ে উঠলাম। শুনলাম, গভীর রাতে আর্মির লোকজন যখন এডমিনিষ্ট্রেশন বিল্ডিং - এ প্রবেশ করার চেষ্টা করে, নাইটগার্ড তাদের চ্যালেঞ্জ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর গুলি করা হয়। কয়েক ঘন্টা রক্তক্ষরণের পর শেষ রাত্রির দিকে তার

মৃত্যু ঘটে। আশেপাশে কেউ ছিলো না; তার চিৎকারও কেউ শোনেনি। সে দিন সন্ধ্যা বেলায় লাশ উদ্ধার করে লোকটির দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।

আমরা দু'জন যখন গেইটে পৌছালাম তখন দেখা গেলো দু'জন শিক্ষক প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। অফিসারটি বললো, এরা যদি এক্ষুণি বাসায় ফিরে না যায় তাহলে গুলি করা হবে। বললাম, একি কথা! এরা তো কেউ কারফিউয়ের কথাই জানে না। শিক্ষক দু'জন গেইটের কাছাকাছি এলে আমি তাদের সব কথা বুঝিয়ে বললাম। তারা ভয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন, একা ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছিলেন না। বললেন পথে আর কোন সৈন্য আমাদের দেখলে গুনি করে দেবে, তখন ওদের বাসায় পৌছে দেওয়ার জন্য এক জওয়ানকে সঙ্গে দেওয়া হলো। ঠিক তখনি রাস্তার অন্যদিক থেকে এক জওয়ান দু'জন তরুণ শিক্ষককে ধরে নিয়ে এল। এরাও নাকি কারফিউ ভঙ্গ করার অপরাধে দায়ী। কিন্তু শোনা গেল এদের জুবেরী হাউজের কামরা থেকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। তারপর আফিসার এদের নাম- পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো। এরা খুব অল্প বয়স্ক বলে তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে এরা শিক্ষক। দু'জনের মধ্যে একজন ছিল হিন্দু। আমি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ভাবলাম যে নাম উচ্চারণ করা মাত্র তাকে হয়তো আমার সামনেই গুলি করবে। কিন্তু প্রথমে মুসলমান তরুণটি নাম বলার পর এ নিয়ে ওরা আর পীড়াপীড়ি করলো না। আর এক জওয়ানের সঙ্গে ওদের জুবেরী হাউজে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম।

২৬শের পরবর্তী ঘটনা

দু'দিনের মধ্যে শহরের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। রাজশাহীতে ছোট্ট একটি গ্যারিসনে বিশেষ লোকজন ছিল না। ইপিআর- এর সদস্য যারা দল ত্যাগ করে আওয়ামী লীগ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো তাদের চাপের মুখে ক্যাম্পাস এবং অন্যান্য প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে গ্যারিসন রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হলো। আমরা পড়লাম মহাফ্যাসাদে। একদিকে আর্মির লোকজনেরা ক্যাম্পাসের পথে এসে টহল দিতো অন্য দিকে আওয়ামী লীগ বাহিনী এ অঞ্চলে অবাধে বিচরণ করে বেড়াতো। সারাদিন শহর থেকে গোলাগুলির শব্দ আসতো। ঢাকার সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। খবরের কাগজ আসা বন্ধ। রেডিওতে যে খবর শুনতাম স্থানীয় পরিস্থিতিতে তার সমর্থন পাওয়া যেতো না। মনে হচ্ছিল, রাজশাহী অঞ্চলটি পুরাপুরি আওয়ামী লীগ বাহিনীর দখলে চলে গেছে। একদিন ওরা এসে আমাদের ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের

তার কেটে দিলো। তখন শুধু যে অন্ধকারে থাকতে হয়েছে তাই নয়, খাবার পানির সংকটও দেখা দিলো। ক্যাম্পাস তখন প্রায় খালি। ৭ই মার্চের পর প্রায় সব ছাত্র আওয়ামী লীগের আহ্বানে হল ত্যাগ করে চলে যায়। শিক্ষকরাও গ্রামে চলে যেতে লাগলেন। তারা মনে করতেন যে যুদ্ধ- বিগ্রহ যদি কিছু হয় সেটা হবে শহরেই এবং ক্যাম্পাসে, গ্রামে থাকাই নিরাপদ। আরো শোনা গেলো যে বহু লোক পায়ে হেঁটে শুকনো পদ্মার উপর দিয়ে ওপারে (পশ্চিম বাংলা) চলে যাচ্ছে। সবার মনেই আতঙ্ক। শিক্ষকেরাও কেউ কেউ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। একজন যদ্দুর মনে পড়ে ম্যাথমেটিকস ডিপার্টমেণ্টের- তার গাড়িটা আমার কাছে আমানত রেখে চলে গেলেন। একদিন শুনলাম, ইউনিভার্সিটি ব্যাংক - অর্থাৎ হাবিব ব্যাঙ্কের একটি শাখা লুট হয়ে গেছে। মনে হলো ব্যাঙ্কের দু'-একজন কর্মচারীর সহযোগিতায় এই কর্ম সাধিত হয়। নগদ টাকা তো গেলই, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক যারা সোনার অলঙ্কার গচ্ছিত রেখেছিলেন তারাও সব হারালেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে কেমিস্ট্রি বিভাগের ডক্টর আঃ লতিফের নাম মনে পড়ছে।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল টিম

আরেক দিনের ঘটনা ক্যাম্পাসে তখনো যারা ছিলেন তাদের অবস্থা পরিদর্শন করতে বেরিয়েছি। দেখা হলো একদল ভারতীয় মেডিকেল টিমের সাথে। তারা এসেছেন ইউনিভার্সিটির ডাক্তারদের নিয়ে একটি ইমারজেন্সি টিম গঠন করার উদ্দেশ্যে। এই দলে এক মহিলাও ছিলেন। আরেক দিন কুষ্টিয়া থেকে সাইকেলে করে এক যুবক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। সে ছিলো রেজিষ্ট্রার জোয়ারদার সাহেবের দূরের আত্মীয়। বললো, যশোর এবং কুষ্টিয়া লিবারেটেড হয়ে গেছে। সেখানে অবাধে ইন্ডিয়ান বাহিনী আনাগোনা করছে এবং কোলকাতার জিনিসপত্র নাকি সুলভে পাওয়া যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ বাহিনী কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি আইডেনটিটি কার্ডও সে দেখাল।

আরেক দিন এক জিপে করে লম্বা- চওড়া এক মিলিটারী অফিসার আমার বাসায় এলেন। আমি ভাবলাম, তিনি পান্জাবী। বললাম, আইয়ে। কিন্তু পর মুহুর্তে বুঝলাম ভূল হয়েছে। তিনি বাংলায় বললেন, আপনার বাসায় 'জয় বাংলা পতাকা' নেই কেনো তাই খোঁজ করতে এসেছি। আপনি শিগগির জয়- বাংলা পতাকা ওড়ান নইলে অসুবিধে হবে। বললাম, জয় বাংলা পতাকা বাসায় নেই, এবং বর্তমান অবস্থায় সেটা তৈরী করাও সম্ভব নয়। আমরা শুধু কালো পতাকা ওড়াতে

পারি। এ নিয়ে তিনি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। আমাকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ বাহিনী এ অঞ্চল দখল করবে।

এরপর একদিন ইউনিভার্সিটির জিয়োগ্রাফি ডিপার্টমেণ্টের এক ছাত্র এসে হাজির। সে আওয়ামী লীগ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। বললো, খবর পেয়েছে যে পাকিস্তানী আর্মি রংপুরের শিক্ষক- উকিল- মোক্তার- ডাক্তার সবাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এবং করাচীতে বাঙালী যারা তারাও নাকি নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। সে আরো বললো যে বিদ্রোহী বাহিনী এর প্রতিশোধ নেবে বলে স্থির করেছে। এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে অবাঙ্গালী শিক্ষক এবং অফিসার যারা ছিলেন তাদের উপর দিয়ে প্রতিশোধ শুরু হবে। আমি যতই তাকে বুঝাবার চেষ্টা করি যে তার রিপোর্ট যদি সত্যিই হয়ে থাকে তবুও নিরপরাধ শিক্ষকদের উপর জুলুম করা কোন রূপেই সঙ্গত হতে পারে না, সে ততই কঠিনভাবে তার প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করতে লাগলো। যাক সেদিন কোন রূপে তাকে নিরস্ত করা গেল। কিন্তু তার দু'-একদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাংগালী অধ্যাপক আমাকে গোপনে এসে খবর দিলেন যে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন যে সাইকোলজি বিভাগের ডক্টর মতিয়ুর রহমান ওয়্যারলেসের সাহায্যে পাক বাহিনীকে নানা তথ্য সরবরাহ করছেন। এ কথা শুনে আমিতো স্তম্ভিত। জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি সত্যিই কি দেখেছেন? তিনি বললেন, তিনি ডক্টর মতিয়ুর রহমানকে সন্দেহজনকভাবে বাথরুমের জানালা দিয়ে উকিঁ মারতে দেখেছেন। বললাম এটা কোন প্রমাণ নয়। তিনি তো কোন ওয়্যারলেস যন্ত্র দেখেননি, আর যদি কেউ গোপনে ওয়্যারলেসে আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে চান সেটা বাথরুমের জানালা খুলে অমনভাবে করবেন কেন? তার কাছে এই যুক্তি খুব একটা মনোপুতঃ হলো না। আমি প্রমাদ গুনলাম। বললাম আপনি মেহেরবানী করে খবরটি প্রচার করবেন না। আমি অন্য অধ্যাপকের সাথে পরামর্শ করে স্থির করবো কি করা দরকার। তার উপস্থিতিতেই প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরীকে খবর দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তারা সঙ্গে সঙ্গে আমার বাসায় এলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তারাও বললেন, যে খবর শোনা গেলো সেটা সত্য হতে পারে না। এ যাত্রাও রক্ষা পাওয়া গেলো।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেল না। কয়েকদিন পরই আরো একটি বা দু'টি ছাত্র এসে ঐ খবরের পুনরাবৃত্তি করলো যোগদিল যে অবাংগালী অধ্যাপক অনেকেই গোয়েন্দাগিরি করছে। আমি তাদের বললাম তোমাদের মনে যদি এ রকম সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে থাকে তাহলে আমার বাসা থেকে শুরু করে

ক্যাম্পাসের প্রতিটি বাসা তল্লাশী করে দেখতে পারো। তারা বোধ হয় এরকম জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিলো না। পীড়াপীগি করলো না। শুধু বললো, অবাঙ্গালী কোন শিক্ষক যেন ক্যাম্পাস ছেড়ে না যায়। তাদের আশ্বাস দিলাম, ওরা কেউ কোথাও যাবে না। কিন্তু অবাংগালী শিক্ষক এবং বাংগালী অফিসারদের মধ্যে ডেপুটি রেজিষ্ট্রার সৈয়দ ইবনে আহমদের বিরুদ্ধে ক্রমেই একটা হিংসাত্মক ভাব দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। ইবনে আহমদের আদি বাড়ী ছিলো বিহারের পূর্ণিয়ায়। উর্দু বলতে পারতেন এটাই তার অপরাধ। একদিন হঠাৎ তিনি সপরিবারে আমার বাসায় এসে হাজির হলেন। বললেন, স্যার আমায় আশ্রয় দিন, বাসায় থাকলে নির্ঘাত আমাকে ওরা হত্যা করবে। তাকে উপরের গেস্টরুমে জায়গা দেওয়া হলো।

তারপরের ঘটনা আরো ভয়ঙ্কর। তারিখটা আমার মনে নেই। এপ্রিল মাসের তিন- চার তারিখের ব্যাপার। দুপুরবেলা রাইফেলধারী দু'জন লোক এসে বললো যে ডক্টর মতিয়ুর রহমানের বাড়ী ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। গোয়েন্দাগিরির অপরাধে তাকে এক্সিকিউট করা হবে। এর মধ্যে অর্থনীতি বিভাগের ডক্টর মোশাররফ হোসেন দৌড়ে এলেন। তাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন অবিলম্বে ডক্টর মতিয়ুর রহমানকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন; আপনি সেখানে চলুন। আমি রেজিষ্ট্রার জোয়ারদার সাহেবকে খবর দিয়ে তাকে সঙ্গে করে ডক্টর মতিয়ুর রহমানের বাসায় চললাম, আমার দু'পাশে বন্দুকধারী যুবক দু'টি আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চললো। বাসার সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আমি তাদের বারণ শুনলাম না। পেছনে পেছনে বাসার এক ছোকরা (মুক্তার)ও চললো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডক্টর মতিয়ুর রহমানের বাসায় এসে দেখি সত্যি সত্যি বন্দুকধারী বেশকজন লোক বাসা ঘিরে ফেলেছে। ভিতরে ড্রয়িংরুমে ঢুকেই দেখি মতিয়ুর রহমান বসা। সঙ্গে রয়েছেন আরবী বিভাগের ডক্টর আব্দুল বারী আর আওয়ামী বাহিনীর দু'জন লোক - একজনের হাতে বন্দুক। স্বভাবতই ভয়ে ডঃ মতিয়ুর রহমান বিবর্ণ হয়ে গেছেন। উপর তলা থেকে চাপা কান্নাকাটির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। অওয়ামী বাহিনীর লোক দু'টির মধ্যে একটি ছিলো জিয়োগ্রাফী ডিপার্টমেন্টের ছাত্র। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কেনো এসেছে। বললো তারা সুনিশ্চিত খবর পেয়েছে যে ডঃ মতিয়ুর রহমান আর্মির গোয়েন্দা অতএব তাকে তারা মাফ করবে না। এবং অন্য অবাংগালী যারা আছেন তাদের ধরে নিয়ে যাবে। অবশ্য একথা বললো না যে এদের তখনি এক্সিকিউট করবে। বললো এদের এক

ক্যাম্পে আটক করে রাখা হবে। এবং আরো সাক্ষ্য প্রমাণ পেলে এদের গুলি করা হবে। আমি বললাম, তারা কি ভাবতে পারে যে ভাইস চান্সেলর হিসেবে আমি আমার অধীনস্থ শিক্ষক বা অফিসারকে তাদের হাতে সজ্ঞানে তুলে দিতে পারি? তারা বললো, আমি না দিলে সমস্ত অঘটনের জন্য আমাকে ব্যাক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে। তারা শুধু এক শর্তে আপাততঃ এদের ক্যাম্পাসে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে। অবাংগালী শিক্ষক এবং অফিসার সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে হবে এবং লিখিতভাবে মুচলিকা দিতে হবে যে এদের কাউকে ক্যাম্পাস থেকে আমি পালিয়ে যেতে দেবোনা। বললাম, তোমরা চুক্তিপত্র তৈরি করো আমি সই করে দেবো। তখন একটা দলিল তৈরী করা হলো তাতে লেখা হলো যে অবাংগালী সবাই আমার জিম্মায় থাকবে এবং এদের মধ্যে একজনও যদি বেড়িয়ে যান, শাস্তি হবে আমার। আমি সই করলাম। সাক্ষী হিসেবে ডক্টর বারী সই করলেন। জোয়ারদার সাহেবকে বলাতে তিনি মাফ চাইলেন। আওয়ামী বাহিনীর দু'সদস্য দলিলে দস্তখত করলো। ভাবলাম, বিপদ কেটে গেলো। বলা আবশ্যক যে দলিলটিতে অবাংগালী শিক্ষক ও অফিসার সবার নাম লিখতে হয়েছিল। হঠাৎ জিয়োগ্রাফী ডিপার্টমেন্টের ছাত্রটি দাবী করে বসলো যে এদের সবাইকে আনিয়ে ওদের দেখাতে হবে যাতে পরে চিন্তে অসুবিধা না হয়। সবাইকে খবর দিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জিয়োগ্রাফী বিভাগের ডক্টর প্যাটেল ও ডক্টর শামসী এসে উপস্থিত হলেন। আমি তাদের বললাম যে এ ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না। আপনারা ভুল বুঝবেন না। তারা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। সৌভাগ্যক্রমে আর কেউ আসবার আগেই ঐ ছেলে বললো, আর দরকার নেই, আমরা যাচ্ছি। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। এরপর সবাইকে অনুরোধ করলাম যে আমাদের তথাকথিত চুক্তি মোতাবেক তারা যেনো ইউনিভারসিটির বহুতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক বিল্ডিং- এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে রাত্রের মধ্যেই সবাই এ ক্যাম্পে এসে হাজির হলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে বাংগালী শিক্ষক অনেকে ক্যাম্পাস ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন বলে তখন বহু বিল্ডিং খালি পড়েছিলো। এদিক দিয়ে কোনো অসুবিধে হলো না। কিন্তু ব্যাপারটার একটা অমানবিক দিক ছিলো যা বিবেকবান প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পীড়িত করেছে। বিল্ডিং এ আশ্রিত মানুষগুলো যেনো কোরবানীর জানোয়ার, কোনদিন জবেহ হবেন তার অপেক্ষায় রইলেন। আমি নিশ্চিত জানতাম যে এদল থেকে একটি লোকও ক্যাম্পাস থেকে সরে গেলে বাকী সকলে তো নিহত হবেন আমাকেও চরম অসুবিধায় পড়তে হবে, হয়তো আমাকে গুলি করবে।

বিমান বাহিনীর হানা

ডক্টর মতিয়ুর রহমান সম্পর্কে যে গুজব রটেছিলো তা যে কতো ভিত্তিহীন তার একটা প্রমাণ এই যে এ সময়, অর্থাৎ আমি এপ্রিল মাসের প্রথম ১২ দিনের কথা বলছি, পাকিস্তানী বিমান বাহিনী প্রায় দৈনিক একবার ক্যাম্পাসের উপর হানা দিত। মনে হয় তাদের ধারণা হয়েছিল যে ক্যাম্পাস বিদ্রোহী বাহিনীর বড় আড্ডা। ভাইস চান্সেলরের বাড়ীর উপরও হামলা হয়। শেষ পর্যন্ত ডক্টর মোশাররফ হোসেনের পরামর্শে আমি দিনের বেলায় তার বিল্ডিং - এর পাশের একটি বিল্ডিং এ আশ্রয় নিয়েছিলাম। ওটা ছিলো ক্যাম্পাসের এক প্রান্তে, কিন্তু পরদিন দেখা গেলো ঐ অঞ্চলেও বিমান হামলা হচ্ছে। এরপর স্থির করলাম আর নড়াচড়া করবো না।

ক্যাম্পাস প্রায় শূণ্য হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষক এবং অফিসার যাদের গাড়ী ছিল তারা গাড়ীতে করে গ্রামে চলে গেলেন। যাদের গাড়ী ছিল না তারা গরু মোহিষের গাড়ী ভাড়া করে ক্যাম্পাস ত্যাগ করলেন, যে ক'জন অবশিষ্ট রয়ে গেলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ আব্দুল বারী, ডঃ আব্দুর রকিব এবং আমার পারসনাল সেক্রেটারী আইনুল হুদা। একদিন যখন আমি অবাংগালী শিক্ষকদের দেখতে গিয়েছি ডক্টর বারী কাঁদো কাঁদো অবস্থায় বললেন যে তাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে তার নাম আওয়ামী বাহিনীর লিস্টে আছে। ক্যাম্পাসে থাকা নিরাপদ মনে করেন না। আমি তাকে অবিলম্বে গ্রামে চলে যেতে পরামর্শ দিলাম। তার একদিন বা দু'দিন পর আইনুল হুদা এসে বললো যে পরিবারের চাপে সেও ক্যাম্পাসে থাকতে পারছে না। কেঁদে কেঁদে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলো। আমার বাসার একদিকে শুধু রইলেন ফিজিক্স এর প্রফেসর ডঃ আহমদ হোসাইন, রেজিষ্ট্রার জনাব জোয়ারদার। একটু দূরে কেমিস্ট্রির প্রফেসর আবদুল লতিফ। ইসলামিক হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপিকা মিসেস লুৎফর রহমান। আরো ছিলেন কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন মোঃ ফারুক। আহমদ হোসাইন সাহেব ফ্যামিলী বাসায় রেখে ক্যাম্পাসের অদূরবর্তী এক গ্রামে যেয়ে রাত কাটাতেন। দু'একদিন পর পর এসে ফ্যামিলির খোঁজ খবর নিতেন। তখন চারদিকের হাট বাজার বন্ধ। মাছ, মুরগী, তরকারী পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো। তবে সেবার আমার বাসায় পুকুরের চারদিকে অসংখ্য টমেটো হয়েছিলে। রোজ প্রায় বিশ- তিরিশ সের টমেটো ছোকরারা কুড়িয়ে আনতো। যথাসম্ভব নিকটবর্তী অন্য সব ফ্যমিলিকেও সেগুলি বিতরণ করতাম।

চাপরাশি মজিদ

নয় বা দশ তারিখে ভাইস চান্সেলরের ব্যক্তিগত চাপরাশি মজিদকে কাজলায় এক গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করা হয়। লোকটি ছিল বিহারী। ছোটকালে কলকাতা থেকে পূর্ব পাবিস্তানে চলে আসে এবং রাজশাহীতে বিয়ে শাদী করে বসবাস করছিলো। গন্ডগোলের সময় একদিন এসে সে তার রেডিওটি আমার বাসায় জমা দিয়ে যায়। আমি তাকে সপরিবারে আসতে বলেছিলাম। সে বললো, প্রাণের ভয় নেই তবে বাসা লুট হয়ে যেতে পারে সে জন্য আমার একমাত্র সম্পত্তি রেডিওটি গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি। তারপর পেলাম তার মৃত্যূ সংবাদ। অনুসন্ধান করে জানা গেলো যে দু'দিন আগে সে প্রাণভয়ে তার এক বাংগালী বন্ধুর বাসায় ক্যাম্পাসে আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু দুঃখ্যের বিষয়, এই লোকটি বিশ্বাসঘাতকতা করে ওকে আওয়ামী বাহিনীর কাছে ধরিয়ে দেয়। তারা কালবিলম্ব না করে তাকে ক্যাম্পাসের প্রান্তেই গুলি করে। খূব মর্মাহত হয়েছিলাম। কারণ লোকটি যেমন ছিল সৎ। তেমনি সুদক্ষ। কোন কাজ- কর্মের ভার দিয়ে বেশী কিছু বলতে হতো না। ডিনার দেবার প্রয়োজন হলে গেস্ট ক'জন থাকবে এবং মেনু কি হবে তার একটা আইডিয়া দিলে সে সুষ্ঠভাবে সবকিছুর আঞ্জাম করতে পারতো।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আরো কয়েকজন অবাংগালী ছিল। ভাইস চান্সেলরের প্রধান ড্রাইভারও ছিল বিহারী। লোকটি এককালে আর্মিতে কাজ করেছে। ইংরেজী বলতে পারতো এবং পবিত্র কোরানও হেফজ করেছিল। গন্ডগোলের সময় তাকে নিয়ে খুব - একটা অসুবিধে হয়নি। সে নিরাপদ কোন জায়গায় আশ্রয় নেয়। যতো অসুবিধা বাধেঁ আর এক ড্রাইভারকে নিয়ে; তার নাম জয়নুল আবেদীন। তার মাথার চুল ছিলো সোনালী সুতরাং চিনতে কোনো অসুবিধে হতো না। একদিন সে এসে আবেদন করলো যে সপরিবারে তাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমার বাসায় জায়গা না দিলে রক্ষা নেই। চাপরাশি কোয়ার্টারে এক কামরায় তাকে জায়গা দেওয়া হলো। বললাম যে দিনের বেলায় সে যেন দরজা- জানালা বন্ধ করে একেবারে চুপ করে থাকে। আর ঐ কোয়ার্টারে অন্য যারা ছিল তাদেরও বললাম তারা যেন জয়নাল আবেদীনের সন্ধান কাইকে না দেয়। ওরা কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কিন্তু একদিন এক বাংগালী গার্ড এসে খবর দিলো যে কোয়ার্টারের চারদিকে জয়নাল আবেদীনের খোজ হচ্ছে এবং তারা তার জীবন রক্ষা করতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। আমি পরামর্শ দিলাম যে জয়নাল আবেদীন যেনো মাথার চুল

কামিয়ে ফেলে এবং আরো বললাম যে দরকার হলে হাজার হাজার লোক যারা পদ্মা পার হয়ে ইন্ডিয়া যাচ্ছিলো তাদের সঙ্গে ওকে পার করে দেওয়া হবে। মাথা সে কামিয়েছিলো তবে অন্য কোথায়ও যেতে রাজী হয়নি। বলেছিলো নসিবে যা আছে তাই হবে, আমি এখানেই থাকব। সুখের বিযয় অন্যান্য গার্ড এবং চাপরাশির সহযোগিতায় তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

ক্যাম্পাস ত্যাগের প্রস্তাব

১০- ১১ এপ্রিলের দিকে পরিস্থিতির যখন আরো অবনতি ঘটলো তখন একদিন ডঃ লুৎফর রহমান, যিনি রাজশাহী গভঃ কলেজের ফিজিক্স এর অধ্যাপক ছিলেন- এসে বললেন, আমরা ঢাকায় চলে যাবার কথা ভাববো কিনা? কারণ এখানে আহার্যেরও অভাব ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে। আমি বললাম যে, আমি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত সেইকথা বিবেচনা করলে কোন কারণেই- আমার পক্ষে স্থান ত্যাগ করা উচিৎ হবে বলে মনে করি না। তবু একবার বললাম যে বর্তমানে যখন রেল- বাস সবই বন্ধ তখন নৌকা যোগে ঢাকায় যেতে হলে খরচ- পত্র কেমন লাগবে তার খোজ তিনি করতে পারেন। তার দু'দিন পর তিনি এসে খবর দিলেন যে আমাদের দুই পরিবারের সব লোকজন সহ ঢাকায় যেতে দু'টো বড় নৌকার দরকার হবে এবং এরা প্রত্যেকটা নৌকার জন্য ছয়শ' টাকা করে ভাড়া দাবী করছে। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে এই অবস্থায় আমাদের কারো পক্ষেই নৌকাযাত্রা শুভ হবে না। একেতো আমার নিজের দায়িত্বের কথা আছে তার উপর মাঝ পথে সুযোগ পেয়ে মাঝিরাই যে আমাদের মেরে কেটে টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দেবে না তার নিশ্চয়তা কি? ডঃ লুৎফর রহমান আমার এ যুক্তি মেনে নিলেন এবং নিজেও শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাসে রয়ে গেলেন। এ সময় আমরা প্রায়ই শুনতাম যে ঢাকা থেকে আর্মির একদল রাজশাহীর দিকে আসছে। নানা গুজবে ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে উঠেছিলো। প্রতিদিনই বিভিন্নক্ষণে বিভিন্ন রকমের গুজব কানে আসতো।

গাড়ী হাইজ্যাক

একদিন সন্ধ্যার পর সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টের এক তরুণ শিক্ষক যিনি আওয়ামী লীগ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, এসে হাজির। হাতে তার রাইফেল। দাবী করলেন আমার সরকারী গাড়ীটি ছেড়ে দিতে হবে। ভাইস চান্সেলরের দুইটি গাড়ী

ছিলো। ছোট গাড়ীটা কয়েক দিন আগেই এই বাহিনীর হাতে হারিয়ে ছিলাম। তারা রাস্তা থেকে ওটা পাকড়াও করে ওটা নিয়ে যায়। এরপর একটি গাড়ীর উপর নির্ভর করেই চলাফেরা করতাম। আমি আপত্তি করা মাত্র যুবকটি বললো যে যদি আমরা হেরে যাই এবং পাকিস্তান আর্মি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনি তাদের বলতে পারেন বন্দুকের মুখে গাড়ী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সে আর অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে গাড়ীটি চালিয়ে নিয়ে গেলো। শুনেছি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই শিক্ষক কানাডায় চলে যানএবং সেখানেই নাকি বসবাস করছেন।

আমার নিজের পরিবারের সবাই আমার সঙ্গে রাজশাহীতে ছিলো। শুধু সদ্য বিবাহিত মোহসেনা, আমার বড় মেয়ে- ছিল ঢাকায়, পঁচিশ মার্চের পর ঢাকার সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। প্রতিদিন অনেক আজগুবি খবর শুনে চমকে উঠতাম। কারণ আমার আত্মীয়- স্বজন সবাই ছিলেন ঢাকায়। একদিন এক চাপরাশি এসে বললো যে ঢাকা থেকে আগত এক ব্যক্তি খবর দিয়েছে যে পুরনো ঢাকায় বাড়ী- ঘর আস্ত আর নেই। আমাদের নাজিমুদ্দিন রোডের বাসা থেকে নাকি সদর ঘাট পরিস্কার দেখা যায়। যদি এখবর সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমার বাসা 'জোহরা মঞ্জিল' ও রাস্তার অপর পাশের 'হাসিনা মঞ্জিল'- যেখামে আমার আত্মীয়- স্বজন অনেকে ছিলেন, দু'টো বাসাই নিশ্চয় ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। বাসায় যারা ছিলেন তারা বেঁচে আছেন কিনা তাও কেউ বলতে পারছিলোনা। রাজশাহী থেকে কাউকে যে পাঠাবো তারও উপায় ছিলোনা, কারণ পথঘাট সব ছিলো বন্ধ। দু'একজন যারা পায়ে হেঁটে রাজশাহীতে আসতো তারা কোনো ঘটনার সঠিক বিবরণ দিতে পারতো না।

একদিন আমার প্রাইভেট ড্রাইভার প্রস্তাব দিলো সে পায়ে হেটেঁ ঢাকায় যাবে। তার অবস্থাও আমার মত, আত্মীয়- স্বজন সব ঢাকার এলাকায়। সুতরাং বাধা দিলাম না। শুধু বললাম পথের বিপদের কথা। সে বললো কপালে যদি মরণই থাকে তবে তাই হবে। আমি ঢাকায় পৌছতে পারবো। আপনার মেয়ের ও অন্যান্য আত্মীয়- স্বজনের খবর নিতে চেষ্টা করব। তাকে কিছু টাকা- পয়সা দিয়ে এবং ছোট্ট একটি চিঠি দিয়ে বিদায় দিলাম। পরদিনই বোধ হয় আর এক চাপরাশি, তার নাম ছিলো আশরাফ, এসে বললো, সে আর থাকবে না। সে শুনেছে, পাক বাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে আসছে। ট্যাঙ্ক সে কখনো দেখেনি, কিন্তু তার ধারণা ওটা এমন এক যন্ত্র যার দ্বারা সামনের বাড়ী- ঘর সব উড়িয়ে দেওয়া যায়। ওকে বললাম, আমরা তো সবাই এখানে আছি তুই একা কোথায় পালাবি? সবাই জানে তুই ইউনিভার্সিটিতে চাকরী করিস। তোকে রাস্তায় পেলেই তো মেরে

ফেলবে। আর তোর বাড়ী বরিশাল। বতর্মান অবস্থায় সেখানে তোর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। এ সত্ত্বেও তুই যদি চাস আমি আপত্তি করবো না। লোকটা শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলো।

পাকিস্তানি সৈন্যের আগমন

১১- ১২ এপ্রিলের দিকে আমরা সঠিক খবর পেলাম যে অনেক পাকিস্তানী সৈন্য আরিচা হয়ে নগরবাড়ী এসে পৌছেছে। তারা মার্চ করে রাজশাহীর দিকে এগুচ্ছে। এ সংবাদে অনেকের মধ্যে ত্রাস বেড়ে গেলো। সারাদিন দেখতাম জিপ নিয়ে বিদ্রোহী ইপিআর ছুটাছুটি করছে। **১১** তারিখ- এ আরো খবর পেলাম যে একদল ইপিআর জিন্নাহ হল দখল করে তার সামনে কামান বসিয়ে রেখেছে। যদি পাকবাহিনী এ পর্যন্ত আসতে পারে, এখানে তাদের বাধা দেওয়া হবে। এ খবর ছিল গুরুতর উদ্বেগজনক। ক্যাম্পাসের কোনো অঞ্চল থেকে পাক বাহিনীর উপর গুলি ছুড়লে ক্যাম্পাস যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। পরিণতির কথা ভেবে আমরা যারা ক্যাম্পাসে ছিলাম আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। রেজিস্ট্রার জোয়ারদার সাহেবকে ডেকে অবস্থার কথা বললাম। তিনি বললেন, একমাত্র জেবের মিয়া এই বিপদ খেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারে। কারণ সে ইপিআর বাহিনীকে খাদ্য সরবরাহ করতো। জেবের মিয়া ছিলো ইউনিভার্সির্টির কন্ট্রাকটর। রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠার আগে জেবের মিয়া মোষের গাড়ী চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। ইউনিভার্সিটি নির্মাণের কাজ যখন শুরু হয় তখন সে ছোট খাট কন্ট্রাকটরী করতে আরম্ভ করে এবং ক্রমেই উন্নতি লাভ করে প্রথম শ্রেণীর কন্ট্রাকটর হিসেবে ইউনিভার্সিটির অনেক কাজ পেতো। জেবের মিয়াকে খবর দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তাকে পাওয়া গেলো। সে ১০ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলো। বাসার নীচের তলার অফিসরুমে তাকে নিয়ে আমি আর জোয়ারদার সাহেব বসলাম। অবস্থার বিবরণ দিয়ে বললাম যে ক্যাম্পাস যদি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। লোকজন তো হতাহত হবেই, বিল্ডিং একটাও টিকবে না। আপনি অবিলম্বে জিন্নাহ হল থেকে ইপিআর বাহিনীকে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করুন। জেবের মিয়া প্রথমে খুব উত্তেজিত স্বরে বললেন, এই স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। আমরা আশা করি এই সংগ্রামে আপনাদের মতো শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতা পাবো। আমি উত্তর দিলাম, আপনার সব কথাই মেনে নিচ্ছি। আপনারা হয়তো পাকিস্তান বাহিনীকে পরাস্ত করে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র কায়েম করতে সমর্থ হবেন কিন্তু একটা কথা একটু ভেবে-

দেখুন, আপনার সাংসারিক উন্নতি যা ঘটেছে সব ইউনিভার্সিটির জন্য। ইউনিভার্সিটি যদি ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে অবিলম্বে হয়তো নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হবে না। তখন আপনাদের অবস্থা কি হবে? জেবের মিয়া চুপ রইলেন। মনে হলো আমার এ যুক্তি তার মনে দাগ কেটেছে। একটুভেবে বললেন, আচ্ছা আমি ইপিআর বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু আমাকে দু'দিনের সময় দিতে হবে। আমি বললাম, সে সময় তো আমাদের হাতে নেই। আমরা যা শুনছি তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে যাই হোক আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাক বাহিনী রাজশাহীতে পৌছে যাবে। জেবের মিয়া বললেন, আচ্ছা আমি চেষ্টা করছি। ১২ তারিখের রাত্রের মধ্যে ইপিআর বাহিনী ক্যাম্পাস ত্যাগ করে অস্ত্র- শস্ত্র নিয়ে দূরে সরে যায়। ১২ই এপ্রিল অবশিষ্ট যে সমস্ত শিক্ষক এবং অফিসার ক্যাম্পাসে ছিলেন তারা ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর আবদুর রকিব। তিনি - আমাকে আগে অনেকবার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আর সবাই ক্যাম্পাস ছেড়ে গেলেও তিনি নড়বেন না। কয়েক মাস আগেই তাকে শামসুজ্জোহা হলের প্রভোস্ট নিযুক্ত করেছিলাম।

সোলায়মানের প্রস্তাব

বেলা এগারটার দিকে হঠাৎ আমাদের দর্শন বিভাগের তরুণ লেকচারার সোলায়মান মন্ডল এসে হাজির হলেন। উনিও ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ছিলেন সতেরো মাইল দূরের গ্রামে শ্বশুর বাড়ীতে। সাইকেল চালিয়ে এই সতের মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছিলেন। তাকে দেখে একটু অবাক হলাম এবং কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম। মন্ডল বললেন, স্যার, আমি আপনাকে নিতে এসেছি। ক্যাম্পাসে এ অবস্থায় থাকলে আপনি নিরাপদ হতে পারবেন না। আমি গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করছি। আপনি সপরিবারে চলুন, আমার শ্বশুর অবস্থাপন্ন লোক। আপনার কোন অসুবিধা হবে না। তার সহৃদতায় আমার চোখ প্রায় আর্দ্র হয়ে উঠলো। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, এই সংকটে আমার পক্ষে কোন মতেই ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না। যারা এখনও রয়েছেন তাদের রেখে আমি পালাতে গেলে চিরদিনের জন্য কাপুরুষ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকব। তাছাড়া এই গোলমালের মধ্যে গরুর গাড়ীতে করে বের হলে যে ভোগান্তি হবে তার চেয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান করে বিপদের মোকাবেলা করাই ভাল। জন্ম মৃত্যু তকদিরের উপর নির্ভর করে। যদি আমার মৃত্যু অবধারিত হয়ে থাকে, ভাইস চান্সেলরের

বাড়ীর কার্পেটের উপর গুলি খেয়ে মরাই আমি পছন্দ করব। সোলায়মান কিছুতেই আমার কথা শুনছিলেন না, অনেক বুঝিয়ে তাকে বিদায় করেছিলাম। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই তরুণটি সেদিন যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেকথাও ভুলব না।

১৩ই এপ্রিল

১৩ তারিখের সকাল বেলা থেকে উত্তেজনা চরমে উঠল। একদিকে শুনছিলাম প্রচন্ড গোলাগুলির আওয়াজ অন্যদিকে লোকজন অনবরত নাটোর রোড দিয়ে রাজশাহী শহরের দিকে ছুটে পালাচ্ছিলো। বুঝলাম যে শিগগিরই একটা কিছু হতে চলেছে। বিকেলের দিকে গোলাগুলির শব্দ এমন প্রচন্ড হয়ে উঠলো যে মনে হচ্ছিল যে কোনো মূহুর্তে ভাইস চান্সেলরের বাসায় কামান বা মেশিন গানের গুলি এসে লাগবে। আমাদের আশ্রয় নেবার জায়গা ছিল না। কিছুদিন আগে যখন পাকিস্তান এয়ারফোর্সের বম্বিং শুরু হয় তখন বাসার পিছন দিকে ট্রেঞ্চ বা পরিখা খনন করা হয়েছিল। তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েও কোনো ফায়দা হবে না। সন্ধ্যার দিকে আমি এবং ইবনে আহমদ আমাদের পরিবারবর্গকে বললাম, তোমরা এখনই কিছু খেয়ে নাও, সন্ধ্যার পর কি হয় - বোঝা যাচ্ছে না সন্ধ্যা হতেই নীচের তলায় মুখোমুখি দু'টো বাথরুমে দুই ফ্যামিলি আশ্রয় নিলো। এগুলির দেয়াল ছিলো অপেক্ষাকৃত মজবুত, মেশিনগানের গুলিতে ভেঙ্গে পড়ার ভয় ছিলো না। মেয়েদের বাথরুমে চুপ করে বসে থাকবার পরামর্শ দিয়ে আমি এবং ইবনে আহমদ দু'সিঁড়ির সামনে খোলা জায়গাটায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। শব্দ শুনে আঁচ করছিলাম দুই পক্ষের মধ্যে সামনের রাস্তায়ই সংগ্রাম চলছে। সেকি প্রচণ্ড শব্দ, বাসার জানালার কাঁচ ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিলো। দু'একটা বোধ হয় ভেঙ্গেও যাচ্ছিলো শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেরাও মেয়েদের সঙ্গে বাথরুমের ভিতর এসে বসে পড়লাম।

এরকম প্রায় বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট চললো। তারপর হঠাৎ সব ঠাণ্ডা। মনে হলো একপক্ষ বিপর্যস্ত হয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু কারা জিতল বা হারলো কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম না। চারদিকে অন্ধকার। তার উপর মশার কামড়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। যখন মনে হলো যুদ্ধ সত্যিই থেমে গেছে তখন আস্তে আস্তে উপর তলায় উঠে ছেলে- মেয়েদের শুয়ে পড়তে উপদেশ দিলাম। আমরা বয়স্করা অর্থাৎ আমি, ইবনে আহমদ ও আমাদের দু'জনার স্ত্রীরা পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষায় অন্ধকারে বসে রইলাম। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম কাজলা ও বিনোদপুরের কয়েক জায়গায় আগুন জ্বলছে। আরো বিভ্রান্ত বোধ করলাম।

অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর মনে হলো বাড়ীর গেইট কে যেনো জোর করে খুলে দিয়ে একটা জিপ চালিয়ে ভিতরে ঢুকলো। আমি অত্যন্ত টেন্স হয়ে উঠলাম। নীচে থেকে আওয়াজ এলো, ভাইস চান্সেলর সাহেব বাসায় আছেন? বাংলা কথা, সুতরাং ধরে নিলাম এরা ইপিআর এর লোকই হবে। আমি একটা হারিকেন হাতে নিয়ে নীচে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেই মেয়েরা বাধা দিলো। বললো, দরজা খোলামাত্র ওরা হয়তো গুলি করবে। আমি বললাম, দরজা না খুললেও রেহাই পাওয়া যাবে না। ওরা হয়তো দরজা ভেঙ্গে ঢুকবে, তখন তোমাদের উপরও আক্রমণ চলবে। আমি নেমে গেলাম। পেছনে ইবনে আহমদ। দরজায় আমাদের কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন উমর ফারুক প্রকাণ্ড একটি জিপ থেকে নেমে বললেন, স্যার আমি এঁদের আপনার বাসায় নিয়ে এসেছি। জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? উমর ফারুক বললেন, জিপে বসা অফিসারটি পাক বাহিনীর কর্নেল তাজ। কর্ণেল তাজ গাড়ী থেকে না নেমেই আমার সাথে কথা বললেন। ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কোথায়? আমি বললাম, কাদের কথা বলছেন? বললেন, এই যারা পথে আমাকে বাধা দিয়েছিলো। আমি বললাম, ওরা ক্যাম্পাসের কেউ নয়। কর্ণেল তাজ বললেন, মিঃ ভাইস চান্সেলর, আপনি শুনে রাখুন, বিদ্রোহী বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে আমরা এসেছি। কিন্তু মনে রাখবেন যদি ক্যাম্পাসে কোনো বিল্ডিং থেকে আমাদের উপর গুলি ছোড়া হয়, আপনার ক্যাম্পাসকে আস্ত রাখা হবে না। আমি কাউকে ছাড়বো না। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, আপনি নিশ্চিত থাকুন ক্যাম্পাসে কোন কিছু হবে না। কর্ণেল তাজ বললেন দেখবো কি হয়! আপনি আমাকে আমার সৈন্যদের রাত কাটাবার জন্য কয়েকটা বিল্ডিং ছেড়ে দিন।

আমি বললাম, আমাদের প্রায় সব বিল্ডিং খালি পড়ে আছে, আপনি যে কোনো একটা বেছে নিতে পারেন। কর্ণেল তাজ দ্বিরুক্তি না করে উমর ফারুককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তার পেছনে আরো দু'টি বা একটি জিপ ছিলো। কথাবার্তায় মনে হলো তিনি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেননি। বোধ হয় এই কারণে আমার প্রতি কোন সৌজন্য প্রকাশ করারও প্রয়োজন বোধ করেননি। উমর ফাকক অবশ্য আমার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে, কোন কাজ হয়নি। কর্ণেল তাজ চলে গেলে আমরা উপরে এসে মেয়েদের বললাম যে আগামী কাল বা পরশু কি হবে জানি না তবে আজ রাতে আর কোন গোলাগুলি হবে না। তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারো।

অধ্যায় ৩

ষড়যন্ত্রের পটভূমি

পাকিস্তান ধ্বংস হতে চলেছে এটা যেনো চোখে দেখেও আমার বিশ্বাস হতে চাইতো না। ১৯৪৭ সালের কথা। আমার মনে আছে যে উৎসাহ ও আশা নিয়ে লাখ লাখ নর- নারী এই নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাবকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো সেটা আমার বয়সের লোকের ভুলবার নয়। ৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট আমি কোলকাতায় ছিলাম। এ কারণে ব্যক্তিগতভাবে ঢাকায় যে উন্মাদনাময় পরিবেশের মধ্যে পাকিস্তান জন্ম লাভ করে তাতে আমি অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু মিছিল, শোভাযাত্রা ইত্যাদির বিবরণ পড়ে কল্পনার নেত্রে সে দৃশ্য অবলোকন করতে অসুবিধা হয়নি। তার একটা বড় কারণ, আমি নিজেও এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমরা বিশ্বাস করতাম যে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সমাধান এই উপমহাদেশকে বিভক্ত করে হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। ভাষা বা ভৌগলিক বৈচিত্রের কোন গুরুত্ব নেই, এ কথা কখনো আমরা বলিনি। কিন্তু ভাষা এবং আঞ্চলিক কালচারের ভিত্তি মেনে নিলে ভারতবর্ষকে অন্ততঃ বিশটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রয়োজন হবে, কারণ 'ভারতীয়তা' বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল বলে আমরা বিশ্বাস করতাম না। যদি বলা হয় যে পাঞ্জাবী মুসলিম বা পাঠান মুসলিমের সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলিমের তফাত অনেক, এ কথা তো হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে আরো সত্য। মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচার পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের রূপ বিভিন্ন। যে সমস্ত দেবতা দক্ষিণ ভারতে বা পশ্চিম ভারতে অর্চিত হন, বাংলা বা আসামে তাদের কেউ পূজা করে না। রাম উত্তর ভারতে দেবতা বলে স্বীকৃত, বাংলায় তিনি রামায়ণের নায়ক মাত্র। এ রকমের আরো ভিন্নতার কথা উল্লেখ করা যায়। সে জন্য জওহরলাল নেহেরুর মতো যাঁরা সেকুলার ভারতীয়তার কথা বলতেন তাঁরা প্রকারান্তরে বুঝাতে চাইতেন যে ভারতীয় কালচারের অর্থ হিন্দু ধর্মভিত্তিক কালচার। ১৯৬২ সালে - '৪৭ সালের ১৫ বছর পর নেহেরুরর এক বক্তৃতায় যে কথা স্বকর্ণে শুনেছিলাম তাতে আমার ঐ উক্তির সমর্থনই ছিল। দিল্লীর এক সভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সৌধ সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এ কথাই ৪০- এর দশকে প্রকাশিত তাঁর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' বইটিতে তিনি আরো সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। ভারতবর্ষের যে রূপ তিনি

আবিষ্কার করেছিলেন বলে দাবী করেন তার মধ্যে সাতশ' বছর ধরে ভারতের বুকেই মুসলমানেরা যে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলো তার কোন সন্ধান ছিলো না। এই সত্যের উপরই পাকিস্তান আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। তাই তখন যে যাই বলুক ধর্ম বিশ্বাসকে আমরা এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান পরিচয় রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলাম এবং এই কারণেই উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক মুসলমান যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলো তেমনি বিহার- উড়িষ্যা এবং আসাম থেকে বহু মুসলমান বিতাড়িত হয়ে পাকিস্তানে নীড় বাঁধবার চেষ্টা করে। ৭০- ৭১ সালে আমরা শুনলাম যে এই নবাগতরা সবই বিদেশী, তাদের না তাড়ালে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের পরিত্রাণ নেই।

আরো দুঃখ্য পেলাম এই ভেবে যে ১৯৪৭ সালে যারা এক রকম জোর করে আমাদের বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করতে বাধ্য করে এবং যারা তাদের রাষ্ট্রের ঐক্য এবং সংহতির খাতিরে নির্দ্বিধায় হিন্দীকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে তারাই সেদিন আমাদের শিখিয়েছিলো যে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেললেই আমরা সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে রক্ষা পাবো। অথচ দিল্লীর শাসন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগ দেয়ার কথা কেউ বলেননি।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা ছিলো না তা নয়। দুই অঞ্চলের মধ্যে বৃটিশ যুগের দুঃশাসনের কারণে একটা অর্থনৈতিক বৈষম্যেরও সৃষ্টি হয় যার জের পাকিস্তানকে টানতে হয়েছে। ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে এ অঞ্চলেই প্রথম বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। তারপরের দেড়শ' বছরের কাহিনী শুধু বঞ্চনা, লুণ্ঠন এবং প্রতারণার কাহিনী - যে কাহিনীর সত্যতা কোনো বৃটিশ বা হিন্দু ঐতিহাসিকও অস্বীকার করেননি। পূর্ব বঙ্গের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কোলকাতা। সারা পূর্ব বঙ্গে শহর বলে কোন কিছু ছিলো না। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি শহরকে আধুনিক অর্থে কেউ শহর বলতো না। আমার বেশ পরিস্কার মনে আছে, পঞ্চাশের দশকে যখন গুলিস্তানের রাস্তা নির্মিত হয়েছে এবং দু' একটা বড় দালান- কোঠা আজিমপুর এবং মতিঝিলে গড়ে উঠেছে তখন আমার এক আমেরিকান বন্ধুকে নারিন্দা অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, আজ রুরাল বেঙ্গল সম্পর্কে একটা আইডিয়া করতে পারলাম। আমি চমকে উঠেছিলাম সত্য কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছিলো যে ইউরোপ বা আমেরিকাবাসীর কাছে নারিন্দা অঞ্চলের সঙ্গে তাদের পল্লীর তফাৎ থাকতে পারে না। বরঞ্চ অনেক ইউরোপীয় বা আমেরিকান গ্রাম আরো সুন্দর ও সুঠাম। এই

ঢাকাই হলো আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা লাহোর এবং করাচীর মতো দু'টো বড় শহর পেলো। করাচী অপেক্ষাকৃতভাবে নতুন নগর কিন্তু লাহোরের বয়স পাঁচ ছ'শ বছরের। এ দু'টি শহরই ছিলো দু'টি প্রদেশের রাজধানী। কিন্তু হঠাৎ করে লাহোর এবং করাচীর সঙ্গে ঢাকার বৈষম্যের জন্য দায়ী করা হলো পাকিস্তানকে। আরো বলা হলো যে পাটের টাকা দিয়ে করাচী এবং লাহোর স্ফীত হয়ে উঠেছে। ঢাকার ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। ১৯৫৬ সালে করাচীতে একদগন হঠাৎ করে একজন বিখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে ৪৪ সাল থেকেই চিনতাম। আমি যখন ইসলামিয়া কলেজের লেকচারার শেখ মুজিবুর রহমান তখন সেখানে ছাত্র এবং আমাদের মতো তিনিও এককালে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনিই বললেন, স্যার দেখেছেন, এলফিন্টস্টোন রোডের সমস্ত চাকচিক্যের মূলে রয়েছে পূর্ব বঙ্গের পাট, আমি বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম এ নতুন তথ্য তিনি আবিষ্কার করলেন কোথায়? এ রাস্তাটির বয়সও যেমন কমপক্ষে পঞ্চাশ- ষাট বছর তেমনি দোকানগুলিও প্রাক- পাকিস্তান যুগের। কিন্তু তিনি তখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের সবকিছুর মূলে রয়েছে বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত পূর্ববঙ্গের দান। কিন্তু এই যুক্তি আমরা কিভাবে স্বীকার করি? অথচ '৭১ সালে যে বিস্ফোরণ ঘটে তখন লাখ লাখ বাংগালী তরুণ এই বিশ্বাস নিয়েই সংগ্রামে নেমে ছিলো যে পাকিস্তানে থেকে তারা শোষণ ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করতে পারে না।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি আইয়ুব খানের আমলে এক সেমিনারে আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা আমি নিজেও তুলেছিলাম। বলেছিলাম যে এ বৈষম্যের ঐতিহাসিক কারণ যাই হোক, বৈষম্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে; জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা এই বৈষম্যের হেতু। আমি আরো বলেছিলাম যে বাস্তব রাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে সত্যের চাইতে অনুভূতি প্রধান হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ যেখানে সত্য সত্যই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে বৈষম্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী, সেখানে অবিলম্বে জাতীয় সংহতির খাতিরে কতকগুলি পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক। সিনিয়রিটির দোহাই দিয়ে যদি প্রশাসনে এবং মিলিটারিতে কোনো পূর্ব পাকিস্তানীকে স্থান দেয়া না হয় তবে তার পেছনে যত যুক্তিই দেখানো হোক তার ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে, পাকিস্তানের ভিত্তিমূল দূর্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু বৈষম্যের কারণে পাকিস্তানকে

টুকরো করে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে হবে এই ধারণা বা অশঙ্কা আমার মাথায় কখনো আসেনি। আমার সে বক্তৃতা পরদিন বড় হরফে ইত্তেফাকে বেরিয়েছিল।

বিহারী ও হিউগেনো

উর্দু ভাষী বিহারী যারা পূর্ব পাকিস্তানে ইন্ডিয়া থেকে হিজরত করে এসেছিলো তাদের আদর্শবাদিতা এবং কর্ম উদ্যমের সদ্ব্যবহারও করতে আমরা অক্ষম হয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে, ফ্রান্সে ধর্ম বিরোধের কারণে যখন শত শত প্রটেস্টান্ট হিউগেনো ইংল্যান্ডে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে, ইংল্যান্ড নানাভাবে উপকৃত হয়। এদের মধ্যে ছিলো অনেক দক্ষ কারিগর, অনেক দক্ষ শিল্পী। ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে শিল্প বিপ্লব ঘটে তার পেছনে হিউগেনোদের অবদান অপরিসীম। প্রথমে যারা এসেছিলো তারা ইংরেজী বলতে পারতো না। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যে তারা ইংরেজী ভাষী সমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এখনো বহু শিল্পের ইতিহাস উদঘাটন করলে দেখা যায় যে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে নির্বাসিত কোন হিউগেনো পরিবারের প্রয়াসে। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ এর অব্যবহিত পর যারা বিহার বা উত্তর প্রদেশ থেকে আসে তারা যেমন দূরদৃষ্টির অভাবে উর্দুর কৌলীন্যের কথা প্রচার করে আনন্দ পেতো তেমনি আমাদের অনেকে আশা করতে শুরু করেন যে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে পা দিয়েই এরা উর্দুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে। অথচ স্প্যানিশভাষী যারা আমেরিকার নিউ ম্যাক্সিকো অথবা ফ্লোরিডা অঞ্চলে বসবাস করে তারা আমেরিকার রাষ্ট্র ভাষা ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্প্যানিশ ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে চলেছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা এদের সন্তানেরা লাভ করে স্প্যানিশ ভাষায়। আমেরিকা রাষ্ট্রের একটি অংশ পুয়ের্টো রিকোর (Puerto Rico) রাষ্ট্র ভাষা স্প্যানিশ। অথচ আমার মনে পড়ে একদল লোক ১৯৪৯-৫০ সালেই নবাগত বিহারীদের শোষক বলে চিহ্নিত করছিলো। অনেক তরুণ বোধ হয় জানেই না যে রেলের এবং টেলিফোন টেলিগ্রাফ বিভাগের উর্দুভাষী কর্মচারী যদি অপশন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে না আসতো এ অঞ্চলে প্রশাসন দাঁড় করবার কাজ বিঘ্নিত হতো। বাংলাভাষী সিনিয়র কোনো আইসিএস অফিসার ছিলেন না। কারণ বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে কোনো বাঙ্গালী মুসলমান আই সি এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেনি। মুষ্টিমেয় দু-তিন জন বাঙ্গালী যারা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ঢুকেছিলেন তারা চাকরি পেয়েছিলেন নমিনেশনের

জোরে। শুধু এদের উপর নির্ভর করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ করা যেতো না।

কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ মুসলমান কর্মচারী-এরা সবাই ছিলো নিম্নস্তরের পদে-ঢাকায় অপশন দিয়ে আসবার পর রাতারাতি পদোন্নতি লাভ করে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হন। কেরানী কেউ সেকশন অফিসার হয়েছে, সেকশন অফিসার হয়তোবা এসিসট্যান্ট সেক্রেটারীর পদ পেয়েছে। স্বভাবতই আই সি এস অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চতম পদগুলো তারা পায়নি । এগুলি পূরণ করা হয় ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের আই সি এস অফিসার দিয়ে। বাঙ্গালী কর্মচারীরা মনে করতে শুরু করে যে এরা না এলে সমস্ত পদই তাদের দখলে আসতে পারতো। তাই দেখা গেলো আজিজ-আহমদ, এন এম খান, মদনী প্রমুখ উর্দুভাষী আই সি এস কর্মচারী যাঁরা কর্মজীবন শুরু করেছিলেন পূর্ববঙ্গে এবং যারা এ অঞ্চলের নাড়ি নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাদের কেন্দ্রীয় সরকারী এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একদল লোক বলতে শুরু করে যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কোন আনুগত্য তাঁদের নেই। প্রদেশটিকে শোষণ করার কাজে তাঁরা নিয়োজিত। এঁরা কোন ভুল-ভ্রান্তি করেননি তা হয়তো নয়, কিন্তু সামান্য কোনো ত্রুটি ধরা পড়লেই বলা হতো যে এঁরা অবাঙ্গালীর এজেন্ট হিসেবে দেশের রক্ত শুষে নিচ্ছেন। এই প্রচারণা ক্রমে ক্রমে বহু লোকের মধ্যে একটা বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত খুব সম্ভব গভর্ণর মোনেম খানের আমলে এক সর্বনাশকর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থির হয়, পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনে অবাঙ্গালী অফিসার আর থাকবেন না। তেমনি যে সমস্ত বাঙ্গালী সি এস পি অফিসার পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদেরও এ প্রদেশে ফিরিয়ে আনা হবে, এর ফলে পাকিস্তানের দু' অংশের মধ্যে ব্যবধান আরো বেড়ে গেলো।

ঠিক তেমনি ষাটের দশকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একদল অধ্যাপক 'টু ইকনোমিজ' বা পাকিস্তানের দু'টি আলাদা অর্থনীতি ব্যবস্থার কথা বলতে শুরু করেন। রাষ্ট্র একটি, তার কেন্দ্রীয় সরকার একটি অথচ ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে অর্থনৈতিক কাঠামোকে দ্বিধা বিভক্ত করার এই দাবী সুদূর প্রসারী প্রভাবের সৃষ্টি করে। ছাত্র সমাজের মধ্যে ধারণার সৃষ্টি হয় যে পুর্ব পাকিস্তানের টাকা বা পুঁজি এ অঞ্চল থেকে পাচার হতে না দিলে দেশের অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তন সূচিত হবে। অথচ বৃটিশ ভারতে পুঁজি যাদের হাতে ছিলো তারা সবাই ছিলেন অবাংগালী। আগাখানী সম্প্রদায়কে আগাখান নিজে এ অঞ্চলে টাকা খাটাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু এঁরা অনেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিকূল আবহাওয়ায়

হতাশ হয়ে ব্যবসা- বাণিজ্য শুরু করেন করাচীতে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম প্রথম যে ক'টি জুটমিল স্থাপিত হয় তার মধ্যে আদমজী মিল এবং ইস্পাহানী মিল প্রধান। এঁরা কোলকাতা অঞ্চল থেকে পুঁজি এবং তাঁদের শ্রমিক সঙ্গে নিয়ে ঢাকা আসেন। এ সমস্ত দক্ষ শ্রমিক- যারা ছিল অধিকাংশই বিহারী- না হলে কলকারখানা স্থাপন করা যেতো না। কারণ বলাবাহুল্য হঠাৎ করে একদল শ্রমিককে বসিয়ে দিলেই কারখানা চালু করা যায় না। তবে এক্ষেত্রেও কয়েক বছরের মধ্যে শুনতে পেলাম আদমজী, ইস্পাহানী, বাওয়ানী এঁরা বিশেষ কিছু পুঁজি আনেননি। পুর্ব পাকিস্তান সরকারের অবাংগালী কর্মচারীদের সহযোগিতায় পাটের ব্যবসা কুক্ষিগত করেছেন। ৫৪ সালের পর আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে বাংগালী বিহারী দাঙ্গায় কয়েকশ' লোক নিহত হয়। এর পেছনে ছিলো রাজনৈতিক উস্কানী। দেশ শিল্পায়িত হোক বা না হোক সেটা যেনো একেবারেই গৌণ হয়ে গেলো। শুধু শোনা গেলো অবাংগালী শ্রমিক এবং তাদের অবাংগালী মালিকেরা পূর্ব বঙ্গের রক্ত শুষে খাচ্ছে। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে যে- ক'টি পাটের কল অবিভক্ত বাংলায় ছিলো সেগুলো সব ছিলো কোলকাতায় এবং তাদের মালিক ছিলো সব মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। আদমজী- ইস্পাহানী এঁরা কয়েকজন ছিলেন এর ব্যতিক্রম। কলকাতায় মোট জুট মিলের সংখ্যা ছিল ৪০ বা ৪১। এসব মিলে পাট সরবরাহ হতো পূর্ব বঙ্গ থেকে। পাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিলো নারায়ণগঞ্জ। এখানে ফঁড়িয়াদের কাছ খেকে পাট ক্রয় করে নিতো মাড়োয়ারী। কিন্তু আশ্চর্য মাড়োয়ারী শোষণের কথা আমরা কখনো শুনিনি। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের দিকে জুট মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ বা ৭১- এ দাঁড়ায়। এর অধিকাংশের মালিক ছিলো বাংগালী মুসলমান। কিন্তু যেহেতু আকার আয়তনে আদমজী ইস্পাহানী বাওয়ানী মিল ছিলো বড় সেহেতু বাংগালী মালিকেরা মুনাফা কি করছে সে প্রশ্ন কেউ তোলেনি। মুনাফার টাকা তারা পূর্ব পাকিস্তানেই রাখছে না সুইস ব্যাংকে জমা দিচ্ছে সে প্রশ্নও কেউ তোলেনি।

কাগজের কলের ব্যাপারেও একই কথা শুনেছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক পর্যায়ে নুরুল আমিন সাহেবের আমলে যে কয়েকটি শিল্প স্থাপন করা হয় তার মধ্যে একটি ছিলো চন্দ্রঘোনা পেপার মিল। কাগজ তৈরির কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের ছিলো না। সরকার অনেক খোঁজ খবর করে দক্ষিণ ভারতের হায়দারাবাদ থেকে মিঃ আলী বলে একজন কাগজ বিশেষজ্ঞকে মিল স্থাপনের কাজে নিয়োগ করেন। তিনি মহাউদ্যমে কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই শোনা গেলো বাংগালী অফিসার এবং শ্রমিক বিদ্রোহ করে তাঁকে

মেরে টুকরো করে কর্ণফুলী নদীতে ভাসিয়ে দেয়। তাঁর লাশের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। বলাবাহুল্য এর ফলে মিলটি চালু হতে অনেক বিলম্ব ঘটে। মিঃ আলীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত যাদের ফাঁসির হুকুম হয়েছিলো তাদের মধ্যে ডিপুটেশনে ছিলেন সিলেট সরকারী কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক এখলাস উদ্দিন আহমদ। তিনি হাইকোর্টে আপিল করে দন্ডমুক্ত হয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল হোন। তিনি ছিলেন রাজশাহীতে আমাদের ডেভলপমেন্ট অফিসার।

বাংগালী- অবাংগালীর মধ্যে এই বিরোধ রাজনৈতিক উস্কানীর ফলে দানা বেঁধে উঠতে থাকে, তার ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এই উস্কানী যে উদ্দেশ্যমূলক ছিলো এবং যারা এতে ইন্ধন যোগাতো তারা যে সুদূর প্রসারী একটা চক্রান্তের খপ্পরে পড়েছিলো অথবা ইচ্ছা করেই সে চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলো এ সম্বন্ধে '৭১ সালে আমার মনে আর সন্দেহ রইলো না। আমি মাড়োয়ারীদের কথা বলেছি। মুসলমান প্রজারা অমুসলমান জমিদারদের হাতে কিরুপে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়েছে '৪৭ সালের পর সে তথ্যটি যেনো কোথায় মিলিয়ে গেলো। যেনো সব শোষণের সূত্রপাত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। জনসাধারণের স্মৃতি শক্তি কোন কালেই প্রখর হয় না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আপাতঃ দৃষ্টিতে উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং মাড়োয়ারীদের শোষণ ও শাসনের অবসান ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ইতিহাসও সবাই যেনো বিস্মৃত হলো। অথচ আমার মনে আছে ১৯৩৫ সালে যখন ঋণ সালিশী বোর্ড আইন পাশ হয় তার আগে অসংখ্য মুসলমান কৃষক অমুসলমান মহাজনের ঋণে জর্জরিত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে মূল ঋণের বহুগুণ টাকা শোধ করেও কৃষক ঋণ থেকে রেহাই পেতো না। সুদ বৃদ্ধি পেতো চক্রবৃদ্ধি হারে। এবং ঐ আইন প্রবর্তিত না হলে পূর্ব বঙ্গের অবস্থা কি হতো তা কল্পনা করাও কঠিন। জমিদারের শোষণ ও অত্যাচার এবং মাড়োয়ারী শোষণের কাহিনী চাপা পড়ে যায় উর্দু ভাষীদের প্রতি উদ্রিক্ত বিদ্বেষে।

ব্যক্তিগতভাবে কোনো হিন্দুর বিরুদ্ধে আমার কোনো কালেই কোনো আক্রোশ ছিলো না। আমার দেশের বাড়িতে আমাদের কর্মচারী সবাই ছিলো হিন্দু। আমাদের গ্রামের ডাক্তার যাদের চিকিৎসায় আমরা লালিত বর্ধিত হয়েছি তাঁরাও সব ছিলেন হিন্দু। চাকরি জীবনে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ব্রাহ্মণ মিঃ বি সি রয়ের সঙ্গে যে হৃদ্যতা ছিলো তা কোনো মুসলমান সহযোগীর সঙ্গেও নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক সমস্যা দু'টো আলাদা জিনিস। পাকিস্তান আন্দোলন যখন আমরা করি, আমরা চেয়েছিলাম হিন্দু মুসলিম সমস্যার একটি

সমাধান। ব্যক্তিগতভাবে কোনো হিন্দুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ নিয়ে আমি বা আমার বন্ধু-বান্ধব এ আন্দোলনে যোগ দিইনি।

'৭১- এর বিস্ফোরণ যদি পশ্চিম পাকিস্তানীদের অত্যাচার অবিচার এবং শোষণের কারণেই ঘটে থাকে তবে আমার নিজের প্রত্যক্ষ করা কতগুলি ঘটনার যুক্তিযুক্ত অর্থ বের করতে পারছিলাম না। '৪৭- এর ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পনেরো দিন পর যাঁরা তমুদ্দুন মজলিস গঠন করেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো কি? তখন তো রাষ্ট্র ভাষার কথা কেউ তোলেনি এবং সেটা তুলবার সময়ও নয়। পাকিস্তানের কাঠামো তখন নড়বড়ে কিন্তু তমুদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতারা ঘোষণা করলেন যে বাংলা ভাষাকে সংরক্ষণ করাই তাঁদের লক্ষ্য। অবিভক্ত ভারতে বা অবিভক্ত বাংলার বাংলাভাষা বিপন্ন হয়েছে বলে আমরা কখনো শুনিনি। যদি ভাষার বিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতা রক্ষাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণ হয়ে থাকে তা হলে তো পাকিস্তানই হয়েছিলো একটা মস্ত ভূল, অথচ বাংলা সম্পর্কে কোনো কথা কেউ বলবার আগেই তারা এমন একটি পদক্ষেপ নিলেন যার ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপে ভাষা সমস্যার সৃষ্টি হলো। এই বিরোধিতা করার একটি উপায় হিসেবে তমুদ্দূন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তার জবাব কি?

আমার আরো মনে হয়েছিলো ১৯৫৪ বা ৫৫ সালের একটি কথা। তখন এ প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা ছিলো। আতাউর রহমান খান চিফ মিনিস্টার। ঐ সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ঢাকায় আসেন। তাঁর সম্মানার্থে রাস্তায় রাস্তায় অনেক তোরণ নির্মাণ করা হয়। কার্জন হলের রাস্তায় একটি তোরণের কথা আমার বিশেষভাবে মনে ছিলো। সেটি হলো নালন্দার বৌদ্ধ মন্দিরের তোরণের অনুকরণ। আমি চমকে উঠেছিলাম। সঙ্গে ছিলেন পলিটিকাল সায়েন্সের একজন সিনিয়র শিক্ষক প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক। তাঁকে বললাম যেখানে স্থাপত্যে মুসলমানদের একটি বিখ্যাত ঐতিহ্য বিদ্যমান সেখানে নালন্দার অনুকরণ কেনো? পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত কোনো হিন্দু মন্দির বা বৌদ্ধ প্যাগোডার অনুকরণ হলেও এটার যুক্তিযুক্ততা একটা বের করা যেত, কিন্তু ভারতের নালন্দার প্রতি এই আনুগত্য বা প্রীতি প্রদর্শনের মধ্যে পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের কি কোনো ইঙ্গিত ছিলো না? আমার সঙ্গী অবশ্য হেসে ওটাকে হালকাভাবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ৭১- এর ঘটনার সঙ্গে ১৯৫৪- ৫৫ সালের ঐ ঘটনার কি কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই? তখনতো পাকিস্তানের বয়স হয়েছিলো সাত বছর মাত্র, ৫৬ সালে করাচী এয়ারপোর্টের যে ঘটনা আগে উল্লেখ করেছি ৫৪- ৫৫ সালের এ ঘটনাও তেমন ইঙ্গিতবহ।

'৭১ সালের আরো একটি ঘটনার কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ে। এটা ১৯৬৫ সালের পাক- ভারত যুদ্ধের সময়ের কথা। ভারত হঠাৎ করে লাহোর ফ্রন্টে আক্রমণ করে যখন এই যুদ্ধ শুরু করে তখন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমার অফিসে আব্দুর রাজ্জাক সাহেব প্রবেশ করে প্রস্তাব করেন যে আমি যেনো বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস একটি লিখি। আমি তাঁকে বলেছিলাম আমরাতো দু'টি বাংগালী জাতির কথা জানি। হিন্দু বাংগালী জাতি এবং মুসলিম বাংগালী জাতি। এদের মধ্যে ভাষাগত এবং কিছুটা নৃতাত্ত্বিক মিল ছাড়া আর তো কোনো ঐক্য নেই, এবং বহুকাল ধরে রাজনীতির ক্ষেত্রে এদের বিরোধ বাংলার ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং ঐক্যবদ্ধ একটি বাংগালী জাতির পরিচয় কোথায়? এ প্রশ্নের সোজাসুজি কোনো জবাব না দিয়ে অধ্যাপক বললেন যে পাকিস্তানের আদর্শ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে সুতরাং নতুন করে একটি সমাধান খুঁজতে হচ্ছে। তিনি মনে করেন, বাংলা আসামকে নিয়ে একটি বাঙ্গালী রাষ্ট্র কায়েম করেই এ সমস্যার সমাধান করা যাবে। কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে উঠলাম। যে জবাব দিয়েছিলাম তাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি তাকে বলি, পাকিস্তান আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন আমরা ছাত্র, আপনাদের মতো শিক্ষকেরাই এ আন্দোলনে আমাদের টেনে এনেছিলেন। সুতরাং কেনো পাকিস্তানের প্রয়োজন হয়েছিলো তা আপনার কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আমার নেই, আজ পাকিস্তানের বয়স মাত্র ১৭ বছর। আপনি কি বলবেন, যে আদর্শের অনুপ্রেরণায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, সতেরো বছরের মধ্যেই তার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে? আর যদি কোনো জাতি প্রতি ১৭ বছর তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে- চুরে নতুন করে গড়তে চায় তা হলে এর শেষ কোথায়? পরবর্তী ১৭ বছরের পর আর এক জেনারেশনের তরুণেরাও তো প্রশ্ন করতে পারে, যে বাংগালী রাষ্ট্রের কথা আপনি বলছেন তাও আমাদের রাজনৈতিক উপযুক্ত সমাধান নয়। এই ভাঙ্গা- চোরার প্রক্রিয়া কি নিরন্তরই চলতে থাকবে? পাকিস্তানের বয়স যদি অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর হতো এবং পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি ঘোষণা করতেন যে ঐ আদর্শ নিষ্ফল বা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, আপনার কথার কিছুটা গুরুত্ব দিতাম, কিন্তু ১৭ বছরের মধ্যেই আপনি মত পাল্টালেন কেনো?

আমার যুক্তির কোনো উত্তর তিনি সেদিন দেননি। তবে এর পর থেকে তিনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করে ফেলেন এবং এর কিছুদিন পর আমাকে দেখলে রীতিমতো মুখ ঘুরিয়ে ফেলতেন। এই ঘটনা '৭১ সালে যেমন

বারংবার আমার মনে হয়েছিলো তেমনি এখনো হয়। আমার বিশ্বাস যে, এক দল লোক ইচ্ছা করেই একটার পর একটা সমস্যা সৃষ্টি করে গেছে। নানা বিভ্রান্তিকর যুক্তি উত্থাপন করে পাকিস্তানের অসারতা প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছে; বাংগালী-অবাংগালীর মধ্যে হিংসার উদ্রেক করেছে। তবে এ কথাও স্বীকার করবো যে, কেন্দ্রে যে সরকার কায়েম ছিলো তারা হয় এ সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলো না অথবা কি সূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগে পাকিস্তানের ভিত্তিমূলকে দূর্বল করে ফেলা হচ্ছিল তা বুঝবার মতো বুদ্ধি তাদের ছিলো না। আমার আরো দু'টি ঘটনার কথা '৭১ সালে বেশ স্পষ্টভাবে মনে পড়ছিলো।

প্রথমটি পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা। সন-তারিখ এখন আমার ঠিক মনে নেই। তখন জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের উজিরে আজম বা প্রধানমন্ত্রী। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা করতে আসেন। আমি উপস্থিত ছিলাম এবং আরো বেশ কিছু সংখ্যক ইউনির্ভাসিটি টিচারও ছিলেন। মিটিং শুরু হওয়ার তখন মাত্র দু'তিন মিনিট বাকী। শহীদ সাহেবের দেখা নেই। হঠাৎ শোনা গেলো হেলিকপ্টারের শব্দ। হলের প্রাঙ্গণের এক কোণায় হেলিকপ্টার থেকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব অবতরণ করে সোজা মঞ্চের উপর উঠে এলেন। বক্তৃতায় এই আওয়ামী লীগ নেতাই সুস্পষ্ট ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর তীব্র নিন্দা করলেন। বললেন, পূর্ব পাকিস্তান বতর্মানে যতটুকু স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে তার অধিক কিছু নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপারে শতকরা ৯৮ ভাগ ক্ষমতারই অধিকারী, অথচ আশ্চর্যের কথা, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পূর্বে আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে তিনি অনেক বার কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা বলেছেন। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে সত্যিকার অর্থে দু'একজন ছাড়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মানে কি তা তারা উপলব্ধি করতেন না, নিজেরা কেন্দ্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে শহীদ সাহেরের মতো প্রশ্নটাকে অবান্তর বলে উড়িয়ে দিতেন আবার ক্ষমতাচ্যূত হলে প্রদেশের অধিকারের জন্য অশ্রুপাত করভে দ্বিধা করতেন না।

আইয়ুব শাহীর আমলে যখন আওয়ামী লীগের কেউ কেন্দ্রে কোনো গদিতে আসীন ছিলেন না তখন আনুষ্ঠানিকভাবে শুধু টু ইকনমিজ বা দু' অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছিলো দু' মুদ্রানীতির কথাও। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দু'রকমের কারেন্সি প্রচলিত থাকবে, এ দাবীও উঠেছিলো। আর এ দাবীও উঠেছিলো যে তাদের পররাষ্ট্রনীতিও হবে ভিন্ন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ কথাও বলতেন যে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করার

দুরভিসন্ধি তাদের নেই। কিন্তু দুই কারেন্সি এবং ভিন্ন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কোনো রাষ্ট্র কিরূপে তার সংহতি রক্ষা করতে পারে তা আমার বুদ্ধির অগম্য ছিলো। '৭১ সালে অবশ্য উপলব্ধি করি যে, বিচ্ছিন্নতার জন্য জনমতকে প্রস্তুত করা ছিলো এ সমস্ত দাবীর মূল উদ্দেশ্য। তরুণ সমাজ ক্রমান্বয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ভৌগোলিক দূরত্ব হেতু পাকিস্তানের দু'অংশের দুই রকমের মুদ্রানীতি ও বৈদেশিক নীতি থাকা অস্বাভাবিক নয়।

যারা ভৌগোলিক দূরত্বের উপর জোর দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে পাকিস্তান একটি অস্বাভাবিক রাষ্ট্র, তারা অতি কৌশলে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের উদাহরণের কথা এড়িয়ে যেতেন। গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস অনেকগুলি দ্বীপের সমষ্টি। এদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের দূরত্ব হাজার মাইলের মতো। ইন্দোনেশিয়ার কথা বিশেষভাবে মনে পড়তো আমার। জাভা এবং সুমাত্রার মধ্যে যে সামুদ্রিক ব্যবধান সে পথ দিয়ে বিদেশী জাহাজও অনবরত চলাচল করে। কারণ এই সমুদ্রের প্রশস্ততা এতো অধিক যে এর উপর আন্তর্জাতিক আইনে ইন্দোনেশিয়ার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্বীকৃত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই স্টেটের সঙ্গে মূল ভূখন্ডের দূরত্ব কয়েক হাজার মাইল। অবশ্য মাঝামাঝি এলাকায় আর কোনো রাষ্ট্র নেই। তবে মনে রাখা দরকার মূল আমেরিকান ভূখণ্ডের সঙ্গে হাওয়াই এর নৃতত্ত্বগত কোনো মিল নেই। এককালে হাওয়াই স্বাধীন ছিলো। কিন্তু রাজনৈতিক বিবর্তনের পর হাওয়াই এর অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। আলাস্কাও যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। মাঝখানে কানাডা। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাগত এবং নৃতত্ত্বগত তফাৎ নেই সে কথা আমরা কখনো বলিনি, কিন্তু ৪৭ সালে এক পাকিস্তান কায়েম করার যে সিদ্ধান্ত তা কেউ আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়নি। বেংগল এসেমব্লির মুসলিম সদস্যরা স্বেচ্ছায় ভোট দিয়ে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন। অথচ ষাটের দশকের শেষদিকে বহুবার শুনেছি যে জিন্নাহ সাহেব নাকি জোর করে আমাদের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করেন। যেনো জিন্নাহ সাহেবের আজ্ঞাবহ কয়েক লক্ষ সৈন্যের হুমকিতে ভীত হয়ে বাংগালী মুসলমানেরা পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলো, এ যুক্তি যেমনি অসার তেমনি উদ্ভট।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যে দূরত্বের কথা বলা হতো আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে সেটা ছিলো মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। ঢাকা থেকে রাজশাহী ট্রেনে যেতে লাগে ১২/১৩ ঘন্টা কিন্তু জেট প্লেনে করাচী থেকে ঢাকা আসা যেতো মাত্র দু'ঘন্টায়। হ্যাঁ, ভারতের উপর দিয়ে উড়ে আসতে হতো। কিন্তু এটা তো সবাই

জানে যে আধুনিক বিমানের যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আকাশ সীমা পরিক্রমণের একটি অধিকার সর্বত্রই স্বীকৃত। এ অধিকার আছে বলেই লন্ডন থেকে অন্তত এক ডজন রাষ্ট্রের উপর দিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঢাকায় আসা যায়। তা ছাড়া সমুদ্র পথে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যাতায়াত করতে কোনো অসুবিধা ছিলো না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জিন্নাহ সাহেব যখন প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে আসেন, তিনি ভারতীয় এলাকার উপর দিয়ে না এসে এসেছিলেন শ্রীলংকা ঘুরে। কয়েক ঘন্টা সময় বেশী লেগেছিল এই মাত্র। আসল কথা, পাকিস্তানকে সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ রাখার সদিচ্ছা থাকলে ভৌগোলিক দূরত্বের প্রশ্ন আধুনিককালে একেবারেই অর্থহীন।

আর একটি কথা '৭১ সালে আমার বারংবার মনে হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে যেমন এক শ্রেণীর লোক সুকৌশলে নানা মিথ্যা যুক্তির সাহায্যে পাকিস্তানের ভিত্তি মূলে আঘাত হানতে দ্বিধা করেনি, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানেও একদল লোক ছিলো যারা দূরদৃষ্টির অভাবে নানা অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করেছিলো। একটা সেমিনারের কথা মনে আছে। এটা অনুষ্ঠিত হয় ডক্টর মাহমুদ হোসেনের মালিরস্থ জামেয়া মিল্লিয়ায়। ডক্টর মাহমুদ হোসেন যতো দিন ঢাকায় ভাইস চান্সেলর ছিলেন তিনি আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে যেতেন এই বার্ষিক সেমিনারে। আমার বেশ মনে আছে সেবারকার আলোচ্য বিষয় ছিলো Education and National Integration অর্থাৎ শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি। আমি একটি প্রবন্ধ পড়ি। সে বছর ডেলিগেশনে আলী আহসানও ছিলো বলে আমার মনে আছে। সেমিনারের শেষ দিনে প্রধান বক্তা ছিলেন ডক্টর ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী। তিনি তখন করাচী ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর। এক কালে পাকিস্তান ক্যাবিনেটের সদস্য ছিলেন। তা ছাড়া ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাত। উর্দূ এবং ইংরেজীভে চমৎকার বক্তৃতা করতেন। কিন্তু সেদিনের বক্তৃতা আমাকে বিস্মিত করে। ডক্টর কোরেশী প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বক্তৃতায় পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সংহতির কথা বললেন না। অথচ পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংহতির অর্থ ছিলো দেশের দুই অংশের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করা। কোরেশী সাহেব বললেন বিভিন্ন শ্রেণীর সংহতির কথা। পাকিস্তানের গরীব এবং ধনীর প্রভেদ বেড়ে গেছে বলে তিনি আক্ষেপ করে বললেন এই পাকিস্তানের কোনো সার্থকতা নেই। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর হঠাৎ ডক্টর মাহমুদ হোসেন সাহেব বলে উঠলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের ডেলিগেশনের পক্ষ থেকে এবার ডক্টর মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসায়েন কিছু বলবেন।

আমাকে পূর্বাহ্নে ঘুনাক্ষরেও বলা হয়নি যে শেষ অধিবেশনে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে।

আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললাম যে ডক্টর কোরেশীর মতো অভিজ্ঞ সুবক্তার ভাষণের পর আমি যা বলবো তা হবে একটা অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স। বললাম যে ডক্টর কোরেশীর বক্তৃতা শুনে আমার মনে হয়েছে যে ষাটের দশকে এসে পাকিস্তান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। ডক্টর কোরেশীর মতো বয়স্ক ব্যক্তি যারা পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন, তাঁরা মনে হয় তাঁদের বিশেষ একটি ইচ্ছা পূরণ হবে বলে এ আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। কেউ ভেবেছেন উর্দুর কথা, কেউ ভেবেছেন অর্থের সমবন্টনের কথা। এ রকম কোনো ইচ্ছা বা স্বপ্ন এখনো বাস্তবায়িত হয়নি বলে ডক্টর কোরেশীর মতো তাঁরা বলছেন যে পাকিস্তানের কোন সার্থকতা নেই। তাঁরা সহজেই হতাশ হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে এক শ্রেণীর তরুণ যারা পাকিস্তানের জন্ম লগ্নে ছিলো একেবারেই শিশু তারা বলতে শুরু করেছে যে, যে হিন্দু- মুসলিম বা শিখ- মুসলিম বিরোধের কথা তারা ইতিহাসের বইতে পড়ছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাস্তব জীবনে দেখেনি। সুতরাং তারা বলত যে পাকিস্তান আন্দোলন করে দেশে যে রক্তপাত এবং সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিলো তার কোন কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এসব না হলেই তো ভালো হতো, শান্তি বিঘ্নিত হতো না। মাঝখানে রইলাম আমরা যারা মধ্যবয়সী এবং যারা কখনো ভুলিনি যে পাকিস্তানের আদত লক্ষ্য ছিলো মুসলমান জাতির জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করা, যে রাষ্ট্রে তারা নিজেরা নিজেদের ঐতিহ্য এবং আদর্শের আলোকে জাতীয় জীবন ব্যবস্থাকে পূনর্গঠিত করতে পারবে; যে রাষ্ট্রে হরহামেশা সাংস্কৃতিক নিষ্পেষণ বা অনৈসলামিক ধর্মীয় অনুশাসনের ভয়ে শঙ্কিত হতে হবে না। এ রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা সংস্কৃতি কিরূপ পরিগ্রহ করবে সেটা নির্ভর করবে মুসলিম জাতির মৌলিক আদর্শগুলোকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো তার উপর। আমাদের আবাসভূমির উপর আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষিত হলে রাষ্ট্র পরিচালনার স্বাধীনতা আমাদের থাকবে। আমরা কখনো মনে করি না যে দশ- পনেরো বছরে আমাদের মৌলিক লক্ষ্যগুলো অর্জিত হবে। কিন্তু তাই বলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা বা নৈরাশ্য প্রকাশ করার প্রবণতা আমদের মধ্যে নেই, কেননা আমরা মনে করি পৃথিবীর অন্যত্র যা হঠাৎ করে সম্ভব হয়নি তা পাকিস্তানেও অনতিকালবিলম্বে দেড় দশকের মধ্যে বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব। Trial and error অর্থাৎ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ভুল- ভ্রান্তির মধ্যদিয়েই মানুষকে অগ্রসর হতে হয়। তাই আমি ডক্টর কোরেশীর মতো সিনিক হতে রাজী নই।

বক্তৃতা মঞ্চ থেকে আমি যখন নেমে এলাম। লক্ষ্য করলাম শ্রোতারা অধিকাংশই খুশী হয়েছেন। কেউ কেউ বললেন আমার আরো কিছু বলা উচিৎ ছিলো। কিন্তু করাচী শহরে প্রকাশ্য সভায় ডক্টর কোরেশীকে সিনিক বা নৈরাশ্যবাদী বলায় মনে হলো তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। ডক্টর মাহমুদ হোসেনও ক্ষুণ্ন হলেন বলে মনে হলো। দু'জনের একজনও আমার সাথে কথা বললেন না। আমার এই বক্তৃতা পরদিন ডন পত্রিকায় বেশ বিস্তারিত ভাবে বেরিয়েছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানে যেমন একদল নানা কারণে পাকিস্তানের আদর্শ বর্জন করতে বসেছিলেন তেমনি ডক্টর কোরেশীর মতো অনেক ব্যক্তি পশ্চিম পাকিস্তানেও পাকিস্তানের একটি সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন। কায়েদে আজম জিন্নাহ যখন গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানে মুসলমান হিন্দু শিখ খৃষ্টান সবার সমান নাগরিক অধিকার থাকবে, তখনও একদল সংকীর্ণমনা ব্যক্তি এই বলে আপত্তি তুলেছিলেন যে এই ঘোষণার দ্বারা নাকি দ্বিজাতি তত্তের উপর আঘাত করা হয়। আমার কখনো তা মনে হয় না। কারণ আমরা কখনো ভাবিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির-গীর্জা বা গুরুদ্বার সব ভেঙ্গে নস্যাৎ করে দিতে হবে। সংখ্যালঘুদের কোন স্বাধীনতা থাকবে না এ রকম কোনো নীতির উপর কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, কিন্তু ভারতবর্ষে ১০ কোটি মুসলমানকে কৃত্রিমভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পদে নামিয়ে আনবার যে ষড়যন্ত্র ছিলো পাকিস্তান ছিলো তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ।

যারা বলতো যে পঁচিশে মার্চ আর্মি অতর্কিতভাবে আক্রমণ করার ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো, তার কোনো প্রমাণ এপ্রিল মাসে পাইনি। ২৬শে মার্চের আগের রাতে আওয়ামী লীগের লোকজনের কাছে শুনেছিলাম যে আর্মি কোনো একশন বা পদক্ষেপ নেবার আগেই যেনো রাস্তায় ব্যারিকেড করে রাখা হয় এবং গাছ কেটে ব্যারিকেড করার জন্য মার্চ মাসের গোড়াতেই কনট্রাক্ট দেওয়া হয়। তার মানে একদল লোক আর্মির সঙ্গে সংঘাতের জন্য আগে থেকেই তৈরি হয়েছিলো।

এ সমস্ত কথা ভেবে বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম, এই গৃহযুদ্ধ কি অনিবার্য ছিলো? আমরা কি কোনো রূপেই একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে পেতাম না? ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে বাংগালী বৈমানিকরা অসম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলো। যে পাকিস্তানের জন্য এই সৈনিকেরা এবং অন্যান্য বাংগালীও আত্মত্যাগ করেছে, সংগ্রাম করেছে, রক্ত দিয়েছে হঠাৎ করে সেটা হয়ে উঠলো

আমাদের শত্রু- এ কথা আমার মতো ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হবে কিভাবে? ৪০ থেকে ৪৭ সালে পাকিস্তান সংগ্রামে আমার মতো লক্ষ লক্ষ মুসলিম তরুণ ঝাপিয়ে পড়েছিলো হঠাৎ একটি রাজনৈতিক দলের ঘোষণার ফলে তারা হয়ে উঠলো জাতিদ্রোহী। একেই বলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস। এই পরিহাসের শিকার হয়ে যারা একাত্তর সালের ধ্বংস যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিলো তাদের মনোবৃত্তি বোঝা ছিলো আমার সাধ্যাতীত। পরিচিত অনেক বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে এই যে ব্যবধান তৈরি হয়ে গেলো, এটা অতিক্রম করে কখনো আমরা সুস্থ চিন্তায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবো কিনা এই দুশ্চিন্তা আমাকে অনবরত পীড়িত করেছে।

অধ্যায় ৪

আর্মির অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি

১৩ই এপ্রিলের পরের যে সমস্ত ঘটনার কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে তার মধ্যে একটি হলো ২১ শে এপ্রিল ইকবালের মৃত্যু দিবস পালন। হল বন্ধ। ক্যাম্পাসে ছাত্র ছিলো না। সুতরাং কয়েকজন শিক্ষককে অনুষ্ঠান করতে হলো। সভা বসলো ভাইস চান্সেলরের হল কামরায়। কয়েকজন মিলিটারী অফিসারও যোগ দিয়েছিলেন। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডঃ মতিয়ুর রহমান। আমাকেই সভাপতিত্ব করতে হলো। বক্তারা সবাই বললেন যে, বর্তমান অবস্থাতেও ইকবালের আদর্শ ম্লান হবার নয়। কারণ স্বাপ্নিক কবি এবং দার্শনিক হিসাবে তিনি যে বাণী রেখে গেছেন তার তাৎপর্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। আমরা জানতাম হয়তো ঢাকায় বা দেশের অন্যত্র ইকবাল দিবস পালন করা হবে না। কিছুদিন আগেই সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারীতে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে গোলযোগের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইকবাল হলের নাম বদলিয়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল করেছিল। এ কাজের সমর্থন আমি কখনই করতে পারিনি। এ রকম উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে যদি রাস্তাঘাট বা কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম বদলাবার পালা শুরু হয় তবে তো প্রতি তিন চার বছর পর সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব পাল্টিয়ে ফেলতে হবে। লন্ডনে- প্যারিসে বহু প্রাচীন নাম বহু শতাব্দী থেকে প্রচলিত রয়েছে। ফ্রান্সে যে রাজাদের বিরুদ্ধে ১৭৮৯ সালে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তাদের নামও বহু রাস্তাঘাট, প্রতিষ্ঠান বহন করছে। আমাদের দেশের নাম পরিবর্তনের মধ্যে ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করার যে প্রবণতা লক্ষিত হয় সেটা যেমন দুঃখজনক তেমনি হাস্যকর। একটা নাম বদলিয়ে ফেললেই ইতিহাস বদলে যায় না। করাচীতে গান্ধী গার্ডেনস- এর নাম বদলাবার কথা তো কেউ কখনো ভাবেনি। আমাদের মধ্যে সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে অতীতকে অস্বীকার করার এই যে দৃষ্টান্ত তার নজির অন্যত্র বিরল।

আর্মি ক্যাম্পাসে এসে অনেক শিক্ষক এবং অফিসারের ব্যাংক একাউন্ট ফ্রীজ করে দিয়েছিলো। এঁদের নিয়ে সমস্যায় পড়লাম। ইউনিভার্সিটি ব্যাংক চালু হওয়া সত্ত্বেও এঁরা কেউ টাকা তুলতে পারছিলেন না। ডক্টর মতিয়ুর রহমানের মারফত আর্মিকে জানানো হলো যে এ ব্যবস্থা চলতে পারে না। এঁরা টাকা- পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবেন তার কোনো সম্ভাবনা নেই। যারা ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ায় চলে গিয়েছিলেন তাদের কথা আলাদা কিন্তু য়ারা এই দুর্যোগের মধ্যেও দেশ ত্যাগ

করেননি, ক্যাম্পাস ছেড়ে যাননি, তাদের অসুবিধা সৃষ্টি করা হবে কেনো? আর্মি শেষ পর্যন্ত সব একাউন্টই রিলিজ করে দেয়।

শিক্ষক এবং অফিসার যাঁরা গ্রামে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা কেউ কেউ ফিরে আসতে শুরু করলেন। কিন্তু অনেকেই ফিরে আসতে ভয় পাচ্ছিলেন। আমি যখন মে মাসে ঢাকা যাই তখন কয়েকজন শিক্ষক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আর কোনো ভয় নেই এই আশ্বাস দিলে তারা প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করেন । কিন্তু সেটা পরের কথা।

এপ্রিলের শেষে ঢাকায় কিভাবে যাবো সে ব্যাপার নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। অথচ আগেই বলেছি যে, মিলিটারী কনভয়ের সঙ্গে ছাড়া যাতায়াতের উপায় ছিলো না। শেষ পর্যন্ত ১৭ই মে যে কনভয়টি ঢাকা যাচ্ছিল তারা আমাদের সঙ্গে নিতে রাজি হলো। সঙ্গে নেওয়ার অর্থ তাদের যানবাহনে নয়, আমরা নিজেদের গাড়ীতেই তাদের সঙ্গে শুধু থাকবো। আমার সঙ্গে ছিলো নিজের প্রাইভেট গাড়ীটি এবং ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টের এক শিক্ষক যে গাড়ীটি আমার জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন সেটা। লোক আমাদের অনেক। কারণ চাকরানীরা পর্যন্ত রাজশাহীর বাসায় আর থাকতে রাজী হলো না। ডঃ মতিয়ুর রহমান বললেন যে তার দুই আত্মীয়া আমাদের সঙ্গে যাবেন। তিনিই কনভয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন সুতরাং তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে হলো। কোন রকম ঠাসাঠাসি করে আমরা রওনা হলাম। আমার গাড়ীর সামনের সিটে আমার কোলে আমার দুই ছোট মেয়েকে নিতে হলো। পেছনের সিটে ছিলো বোধ হয় ছ'জন। অন্য গাড়ীটির অবস্থাও তাই। ডক্টর মতিয়ুর রহমান অবস্থা দৃষ্টে বললেন যে তা হলে তাঁর আত্মীয়াদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করবেন। আমি বললাম, ওরা যদি একটু কষ্ট করতে পারে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। সেভাবেই ১৭ই মে সকাল বেরা রাজশাহী থেকে যাত্রা করি। নাটোরে যুদ্ধ বিগ্রহের বিশেষ কোনো চিহ্ন চোখে পড়লো না। কিন্তু রাস্তায় মাঝে মাঝে ব্যারিকেড চোখে পড়লো। এগুলো সরিয়ে আর্মি ১২ই এপ্রিল রাজশাহী অভিমুখে এসেছিলো। দু'একটা কালভার্টও ভাঙ্গা ছিলো। সেগুলো সাময়িকভাবে মেরামত করে নেওয়া হয়েছিলো। পাবনা এসে টের পেলাম যে এখানে রীতিমতো সংঘর্ষ হয়েছে। পেট্রোল পাম্প বিধ্বস্ত ছিলো, ডিসির অফিস এবং ব্যাংকে গোলাগুলীর চিহ্ন ছিলো। ডিসি আগেই ইন্ডিয়া চলে যান। কিন্তু আর্মি নিষ্ফল আক্রোশে তাঁর অফিসে গোলা বর্ষণ করে।

আমরা রাজশাহীতে যে সামান্য পরিমাণ পেট্রোল সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম পাবনা পর্যন্ত এসে তা ফুরিয়ে যায়। আবার আর্মির শরণাপন্ন হতে

হলো। ওরা শেষ পর্যন্ত কিছু পেট্রোল দিয়ে ঢাকা পর্যন্ত পৌছার ব্যবস্থা করে দিলো। নগরবাড়ী ফেরিতে আর্মি অফিসার দুজন আমার সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস সেলুনে এসে বসলেন। ওরা দেশের অবস্থার কথা তুলরেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে আমি শুধু আশ্চর্য হলাম না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রীতিমতো শঙ্কিত বোধ করলাম। একজন অফিসার বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই প্রায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ পুনঃস্থাপিত হয়েছে। দেশে হিন্দু যারা রয়েছে তাদের তাড়িয়ে দিলেই ভবিষ্যতে আর কোনো গোলযোগের আশঙ্কা থাকবে না। সেই 'সাফাই'-এর কাজই আর্মি শুরু করেছে। তখনও কিন্তু কোলকাতায় শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। অল্প সংখ্যক লোক ইন্ডিয়া পালিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন আর্মি আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দু বিতাড়নের যে প্রক্রিয়া শুরু করলো তার পরিণতি মঙ্গলজনক হতে পারে না এ কথা তো শিক্ষিত সবারই বোঝা উচিত ছিলো। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা ছিলো প্রায় এক কোটি। এই এক কোটি লোককে দেশ থেকে তাড়িয়ে আর্মি শান্তি স্থাপন করার কথা ভাবছে এ কথা কানে শুনেও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। এই নীতির কারণেই অবশ্যম্ভাবীরূপে জুন মাসের মধ্যেই অসংখ্য শরণার্থী পশ্চিম বঙ্গ এবং ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে শুরু করে এবং ভারত দাবী করতে শুরু করে যে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছ। ইউরোপ- আমেরিকায় এ বিশ্বাস সঞ্চারিত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার এক নৈতিক অধিকার ভারতের জন্মেছে। এটা যে চরম অদূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গতঃ আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ২৫শে মার্চের পর শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য নিয়ে নানা জল্পনা- কল্পনার সৃষ্টি হয়। সমস্তই গুজব। আওয়ামী লীগের এক দল দাবী করে যে তিনি আর্মির বিরুদ্ধে গোপন আস্তানা থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। কেউ বলছিলো তিনি কলকাতা চলে গেছেন এবং সময় মতো আত্মপ্রকাশ করবেন। অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস ছিলো শেখ মুজিব ২৫ তারিখের রাতে আর্মির হাতে নিহত হয়েছেন। পাকিস্তান সরকার প্রথমে তাঁর সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেননি। পরে একদিন ঘোষণা করা হলো যে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে তাঁর বিচার হবে। অধিকাংশ লোকই মনে করতে শুরু করে যে ঘোষণাটি সর্বৈব মিথ্যা। একদিন এ সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর এক তরুণ আর্মি অফিসারের কাছ থেকে পেলাম। তিনি বললেন, যে সেনাদলকে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো তিনি সেই দলে ছিলেন। ডন পত্রিকায় প্রকাশিত করাচী এয়ারপোর্টের ভিআইপি রুমের একটি ছবি দেখালেন, সোফায় মুজিবুর রহমান

বসা, দুপাশে দুজন অফিসার তার মধ্যে একজন এই বক্তা যিনি আমাকে গল্পটি শোনাচ্ছিলেন। আমি বাংলাভাষী সে কারণে বিদ্রুপের সঙ্গে বললেন, সেদিন দেখেছি আপনাদের নেতা কেমন। আমাদের দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন এবং ভয়ে কাঁপছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন আমরা তাঁকে গুলি করতে এসেছি।

আবার আগের কথায় ফিরে যাচ্ছি। ঐ মিলিটারী অফিসার আমাকে জানালেন যে ঢাকার রমনা ময়দানে যে দু'টি হিন্দু মন্দির ছিলো সে দু'টোকে ওরা কামান দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। আবার আমার মনে হলো যে মন্দির ধ্বংস করে বীরত্ব প্রকাশ করার এই যে নমুনা এও তো দেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। ভারতের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে কথা এরা ভাবেনি। তা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে এবং বিভাগ পূর্ব বাংলায় কোনো দাঙ্গা- হাঙ্গামার সময়ও মন্দির ধ্বংস করার ইতিহাস নেই। এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি শহরে এবং কোনো কোনো গ্রামেও অগণিত মন্দির ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া আছে মঠ। আমরা চিরকালই গর্ব করতাম যে মুসলমান শাসনকর্তারা ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত সহিষ্ণু ছিলেন। যে কারণে মুসলিম শক্তির প্রাণ কেন্দ্র দিল্লীতেও হিন্দু প্রাধান্য। পাকিস্তান পূর্ব ঢাকাতেও হিন্দুদের সংখ্যা ছিলো বেশি। রমনা ময়দানের বড় মঠটির কাছাকাছি একটি মসজিদ অবস্থিত ছিলো। কিন্তু এ নিয়ে কোন বিরোধ হয়নি। ঢাকেশ্বরী মন্দির যে এলাকায় অবস্থিত তার চারদিকে মুসলিম বস্তি। এখানেও কোনো উপদ্রব ঘটেনি। আমার মনে আছে, আমি একবার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রবেশ করেছিলাম। এটা নাকি শিবের মন্দির। এক কক্ষে দেখলাম শিব পার্বতীর Phallic Symbols। সঙ্গে সঙ্গে আমি সরে আসি। আর কেউ কাছে থাকলে লজ্জা পেতাম। কয়েকশ' বছর ধরে ঢাকার মতোই মুসলিম প্রধান অঞ্চলে এ রকম একটা জিনিস বিদ্যমান ছিলো, কিন্তু কেউ সেটা ভাঙ্গতে যায়নি। সে জন্য পাকিস্তান আর্মি এবার যে কান্ড করে বসলো তার সুদূরপ্রসারী পরিণতির কথা ভেবে আমি শিউরে উঠেছিলাম। আমি যখন বললাম যে দু'টো- একটা মঠ বা মন্দির ভেঙ্গে আপনারা কোন সমস্যার সমাধান করবেন? তখন অফিসারটি বললেন যে, রমনা মঠে নাকি অস্ত্র- শস্ত্রের একটা আড্ডা ছিলো। বিদ্রোহীরা এখানে ট্রেনিং নিতো। এ অভিযোগ কতটা সত্য তা জানার আর উপায় ছিলো না।

ফেরী জাহাজের উপর থেকে যমুনা নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে আগের মতন স্বাভাবিকভাবে বহু নৌকা চলাচল করছে। আরিচাতে এসে আবার আমরা গাড়ীতে উঠলাম এবং তিন ঘন্টার মধ্যেই ঢাকা এসে পৌছানো গেলো। রাস্তার কোনো জায়গায়ই কোনো যুদ্ধ- বিগ্রহের চিহ্ন চোখে পড়েনি। শহরের কাছে

এসে আর্মির ট্রাকগুলো ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গেলো। আমার দু'টি গাড়ী মীরপুর রোড ধরে নিউ মার্কেটের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। আমি ড্রাইভারদের হুকুম দিলাম প্রথমে ইকবাল হলের কাছে যেতে। আর্মির লোকের মুখেই শুনেছিলাম যে, হলের কিছু নেই। তাই বাসায় যাবার আগেই অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখবার আগ্রহ জন্মেছিলো। ষাটের দশকে বছর দেড়েক আমি এই হলের প্রভোষ্টের কাজ করেছি। হলটির প্রতি স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশী মমতাও ছিলো। কাছে এসে গাড়ী থেকে দেখলাম হল যেমন ছিলো তেমনি আছে। প্রায় অক্ষত। তবে উপরতলার কিছু জানালার কাঁচ ভাঙ্গা। মনে হলো গোলাগুলী হয়েছিলো। আমি অবশ্য তখন ভিতরে যাইনি। কিন্তু যে গল্প আমি শুনেছিলাম তা যে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত তা বুঝতে পারলাম। অথচ এই অতি রঞ্জনের সূত্র আর্মি নিজেরাই। যে অফিসার আমাকে ইকবাল হল সম্পর্কে খবরটি দিয়েছিলেন তিনি যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা বলেছিলেন তা বোধ হয় নয়। সম্ভবতঃ তিনি কখনো ইকবাল হল এলাকায় যান নাই, গুজব শুনেই বিশ্বাস করেছিলেন যে, ইউনিভার্সিটির দালান- কোঠা আর অবশিষ্ট নেই।

ইকবাল হল থেকে সোজা বাসায় এলাম, ১০৯ নাম্বার নাজিমুদ্দিন রোডে। রাস্তায় বিশেষ অস্বাভাবিকতা চোখে পড়লো না। তবে গাড়ীর সংখ্যা কম ছিলো। কিন্তু প্রচুর লোক পায়ে হেঁটে ঘোরাফেরা করছিলো। ঢাকা এসে প্রথমেই ইউনিভার্সিটিতে কারা নিহত হয়েছেন তার খবর নিলাম। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, মুনির চৌধুরী, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের এম এ মুনিম এরা সবাই অক্ষত দেহে বেঁচে আছেন শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। নিশ্চিতভাবে খবর পেলাম যে, পঁচিশে মার্চের রাত্রে আর্মির গুলীতে যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ফিলসফির ডঃ জি সি দেব এবং স্ট্যাটিসটিকসের ডঃ মনিরুজ্জামান। আরো দু'জন ছিলেন। এঁদের প্রায় সবার সঙ্গেই আমার ভালো পরিচয় ছিলো এবং এঁরা রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এ কথা আমার কখনোই বিশ্বাস হবে না। আর্মি চেয়েছিলো বেপরোয়াভাবে কিছু লোককে হত্যা করে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে। সাময়িকভাবে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিলো সত্য কিন্তু এ হত্যাকান্ডের ফলে আর্মির যে ইমেজ হলো তার ফলে বহু লোকের মনে পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি একটা চরম ঘৃণা জন্মাল, যারা কখনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা ভাবেনি তারাও আর্মির নৃশংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কয়েক দিনের মধ্যেই টের পেলাম যে, আমার বন্ধু- বান্ধব যাঁরা গভীরভাবে পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের সে বিশ্বাসের ভিত নড়ে

গেছে। তাঁরা বলতে শুরু করেছেন যে, আর্মির এই শাসনই যদি পাকিস্তান রক্ষার একমাত্র উপায় হয় তবে সে পাকিস্তানের দরকার আমাদের নেই। এ সমস্ত ঘটনার মধ্যে পাকিস্তানের পটভূমি, ঐতিহাসিক প্রয়োজন, হিন্দু- মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস সবই তলিয়ে গেলো। স্বভাবতঃই ইন্ডিয়া থেকে বলা হলো যে, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী আর্মির বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে বাংগালী জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

বাস্তবিকপক্ষে ২৫ মার্চের পর দু'এক সপ্তাহ ভয়ে হোক আতঙ্কে হোক আর্মির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার কথা কেউ ভাবেনি। বা সে রকম কোনো কথা আমরা শুনিনি। কিন্তু যখন দেখা গেলো যে আর্মি তার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে তখন এই যুদ্ধ এক নতুন মোড় নিলো এবং এটা বোধ হয়, জুন মাস থেকে। গৃহযুদ্ধের পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই করা হয়েছিলে। সে কথা আগেই বলেছি। বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিলো। তাছাড়া মার্চ মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বিরুদ্ধে যে অবরোধ ঘোষণা করা হয় সেটাও ছিলো প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। আর্মি উত্তেজিত হয়ে একটা কিছু করে বসুক এর অপেক্ষাই যেনো একদল লোক করছিলো। আর্মি যদি ধৈর্য সহকারে এবং আরো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারতো তা হলে কি হত তা নিয়ে শুধু জল্পনা- কল্পনাই করা চলে, কিন্তু আর্মি কমান্ড আওয়ামীদের খপ্পরে পড়ে পঁচিশে মার্চে নাটকীয় হামলা শুরু করে। অথচ আশ্চর্যের কথা যারা গৃহযুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলো এবং আর্মির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের উস্কানী দিয়ে যাচ্ছিলো তাদের কাউকে গ্রেফতারও করা হয়নি। রহস্যের কথা ২৫শে মার্চের পর আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সকলে সীমান্ত অতিক্রম করে ইন্ডিয়া চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর্মি যে কোনো সুপরিকল্পিত প্ল্যান নিয়ে ২৫শে মার্চে হত্যাকান্ডে লিপ্ত হয়নি এটা তারই প্রমাণ। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও মূর্খ অফিসারদের কাছে কোনো তথ্য ছিলো না। তারা শুধু শুনেছিলো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা জয়বাংলা সংগ্রামে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলে। তাই সেই অতর্কিত আক্রমণ। তবে এটাও মনে হয়েছে যে, আক্রমণ এভাবে শুরু হবে আওয়ামী লীগ বোধ হয় সে জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলো না। এই কারণেই ২৫শে মার্চের অব্যবহিত পর আর্মির সঙ্গে গুরুতর কোন সংঘর্ষের খবর আমরা পাইনি। ৭১ সালের মে মাস পর্যন্ত আমার নিজের যে ধারণা ছিলো আমি সে কথাই বলছি। এখন শুনছি আওয়ামী লীগের প্রতিরোধ নাকি ২৬শে মার্চ থেকেই চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গের অনেক অঞ্চলে আরম্ভ হয়।

অতিরঞ্জিত

রাজশাহীতে ঢাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক আজগুবি কাহিনী শুনেছিলাম। তার অধিকাংশই মিথ্য। তার মধ্যে একদিকে ছিলো আর্মির নৃশংসতার কাহিনী অন্যদিকে ঢাকাবাসীর প্রতিরোধের কাহিনী। আমি শুনেছিলাম যে ইউনিভার্সিটির কয়েক হাজার ছাত্র-শিক্ষক নিহত হয়েছেন। নিহত শিক্ষকের সংখ্যা আগেই দিয়েছি। নিহত ছাত্রদের সংখ্যা যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তবে হাজার হাজার ছাত্র পঁচিশের রাত্রে মারা পড়ে, এ কাহিনী সত্য ভিত্তিক নয় এ কথা সবাই আমাকে বললেন। ছাত্ররা প্রায় সবাই ৭ই মার্চের পর হল ত্যাগ করে। সারা ক্যাম্পাসে একশ' ছাত্রও ২৫ তারিখের রাত্রে ছিলো না।

নিহত শিক্ষকদের মধ্যে স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টের ডঃ মনিরুজ্জামানের নাম শুনে অভিভূত হয়ে গেলাম। ডক্টর হাসান জামানের বড় ভাই। অত্যন্ত সৎ লোক। লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না। শুধু তিনিই নন, তাঁর বড় ছেলে এবং ভাগ্নে আর্মির গুলীতে মারা যায়। শুনেছি যে আর্মি এসে যখন তার নাম ধরে ডাকাডাকি করে তখন তিনি কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে আসতেই আর জিজ্ঞাসাবাদ না করে তাকে গুলী করা হয়। আর্মি যে কোন স্থির পরিকল্পনা নিয়ে পঁচিশের এ্যাকশনে লিপ্ত হয়নি ডক্টর মনিরুজ্জামানের মর্মান্তিক মৃত্যু তার অকাট্য প্রমাণ। পরে ভুল বুঝতে পেরে তাঁরা অনেক অনুশোচনা করেছে।

আরো শুনেছিলাম যে জগন্নাথ হলে আর্মির সঙ্গে রীতিমতো লড়াই হয়। ঢাকা এসে শুনলাম এটাও একটা অলীক কাহিনী। আর একটি লোমহর্ষক কাহিনী কানে এসেছিলো। শুনেছিলাম যে আর্মি যখন নাকি ট্যাঙ্ক নিয়ে রাস্তায় বের হয় তখন একটি মেয়ে জয় বাংলা বলতে বলতে একা ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়ায় এবং নিষ্পেষিত হয়ে মারা যায়। ঢাকার সবাই বললেন যে এমন কোনো ঘটনা ঢাকায় হয় নাই।

একদিন গেলাম নিউমার্কেটে। লক্ষ্য করলাম বেশ কিছু দোকান তখনও বন্ধ। পরিচিত একটি বইয়ের দোকানে এক ছোকরা বললো, কর্ণেল ওসমানীর নেতৃত্বে বাংগালীরা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসছে। এই প্রথম পঁচিশের রাত্রের ঘটনা প্রসঙ্গে কর্ণেল ওসমানীর নাম কানে এলো। ছেলেটি বিশেষ কিছু জানে না। যা শুনেছে সেই খবর দিলো। এই প্রতিরোধ পরে কি রূপ পরিগ্রহ করবে তখন তা ধারণা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সৈয়দ আলী আহসানের ফ্যামেলির কেউ কেউ আমার সঙ্গে দেখ করতে এসেছিলো। তারা তখনো সঠিকভাবে জানতো না যে আলী আহসান সীমান্ত অতিক্রম করে ইন্ডিয়া চলে গেছে। আলী আহসানের ছোট ভাই সৈয়দ আলী তকী ময়মনসিংহের এক কলেজে অধ্যাপনা করতো। ২৫শের পর এরা তার কোনো সন্ধান পাচ্ছিলো না।

আমাদের আত্মীয়-স্বজন আরো যাঁরা প্রদেশের অন্যত্র ছড়িয়ে ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধেও সঠিক খবর যোগাড় করা গেলো না। কারণ ডাক যোগাযোগ একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলো। উল্লেখযোগ্য যে, ডাক চলাচলে অনিয়ম শুরু হয় ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই। মার্চ মাসের গোড়ায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক বয়কট ঘোষণা করেছিলো। বলা হয়েছিল কেউ যেনো কোনো ট্যাক্স খাজনা সরকারী তহবিলে জমা না দেয়। ব্যাংকের উপর নির্দেশ জারী করা হলো যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য টাকা তারা যেনো একটি আলাদা একাউন্টে আটক করে রাখে। বস্তুতঃ ৭ই মার্চের পর থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দেশে একটি প্যারালাল সরকার কায়েম করেছিলো। এটা সম্ভব হয়, বিশেষ করে গভর্ণর আহসানের চরম অকর্মণ্যতার কারণে। সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটা সমঝোতা হওয়ার আগেই তিনি কার্যতঃ আওয়ামী লীগের উপর শাসনভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি নাকি প্রশাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। একাধিক বার শেখ মুজিবের বাসায় যেয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সব নিশ্চয়ই করা হয়েছিলো ইয়াহিয়া খানের অনুমতিক্রমেই। কিন্তু এর ফলে দেশের সর্ব সাধারণের মনে অবশ্যম্ভাবী রূপে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হয়েছিলো তা হলো এই যে, ইয়াহিয়া সরকার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্রস্তুত। এবং এই দলকে দেশের ভাবী শাসক হিসাবে মেনে নিয়েছে। আমি নিজে একবার এই নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ি। প্রাদেশিক গভর্ণর ছিলেন ইউনিভার্সিটির চান্সেলর এবং এ জন্য অনেক ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতে হতো। আমি প্রশাসনিক সমস্যা নিয়ে গভর্ণর আহসানের অভিমত জানতে চেয়ে চিঠি লিখি। তিনি তো কিছু করলেনই না, শুনেছি সে চিঠি তিনি আমাকে না জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে প্যারালাল সরকারকে ইয়াহিয়া এবং গভর্ণর আহসান যেভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তারপর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার যেমন যৌক্তিকতা ছিলো না তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোর সাহায্য

ব্যতিরেকে আর্মি পাকিস্তানকে আয়ত্তে আনতে পারবে এ বিশ্বাসও ছিলো ওদের চরম মূর্খতা ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

ডাক যোগাযোগ ভেঙ্গে পড়ায় অন্যান্য অসুবিধের মধ্যে একটা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত Encyclopaedia Britannica -র জন্য ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে ওদেরই অনুরোধে একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলাম। মার্চ মাসে গোলমালের মধ্যে সেটা পাঠানো সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৩ই এপ্রিলের পর আর্মির সাহায্যে ওটা পাঠাবার ব্যবস্থা করি। নিবন্ধটি যথাসময়ে ঐ বিশ্বকোষে প্রকাশিত হয়।

বিবৃতি

একদিন মাহে নও অফিস থেকে একজন পরিচিত ব্যক্তি হেমায়েত হোসেন আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে টাইপ করা ইংরেজী একটি বিবৃতি। আর একটি কাগজে অনেকগুলো দস্তখত। নাম প্রায় সবগুলিই আমার পরিচিত। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, নুরুল মোমেন, শাহেদ আলী, ফররুখ আহমদ, আসকার ইবনে শাইখ প্রমুখ। আমাকে বলা হলো ওটাতে সই দিতে। পড়ে দেখলাম ২৫ তারিখের রাত্রে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আর্মি যে এ্যাকশন এটা তারই একটা ব্যাখ্যা। বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকার শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো। শিক্ষক এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর হামরার নিন্দায় অনেক মার্কিন অধ্যাপক মুখর হয়ে ওঠেন। বিবৃতিটি তারই জবাব। বেশ সরস ইংরেজীতে লেখা। বলা হয়েছিলো আসল ঘটনা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত হয়ে বিদেশে প্রচার হয়েছে। ক্যাম্পাসে ব্যাপক হত্যাকান্ড কিছুই ঘটে নাই। দু'একজন শিক্ষক বা ছাত্র যাঁরা দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে আর্মির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন তাঁরাই শুধু মারা গেছেন। অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র ভয় ও আতঙ্কে গ্রামে পালিয়ে গেছেন- এই কারণে ইউনিভার্সিটি বন্ধ। আমি বললাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটি সংক্রান্ত বিবৃতিতে আমার সই কেন? আমি তো তখন রাজশাহীতে এবং এ সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুই জানি না। হেমায়েত সাহেব বললেন যে সরকার থেকে আমার দস্তখত সংগ্রহে আদেশ দেওয়া হয়েছে। অফিসারদের করণীয় কিছুই নেই। আমি আরো বললাম যে বিবৃতিতে এমন অনেকগুলো বাক্য সংযোজিত যাতে সই করলে যারা জানে যে আমি ঐ তারিখে ঢাকায় ছিলাম না তাদের কাছে আমি হাস্যাস্পদ হবো। ঐ বাক্যগুলি অবশ্যই

সংশোধিত করতে হবে। দেশের সংকট মুহূর্তে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু জেনে শুনে মিথ্যা কথার সমর্থন কিভাবে করবো? সেদিন আমি হেমায়েত সাহেবকে ফিরিয়ে দিই। পরদিন তিনি আবার এসে হাজির। কয়েকটি কথা দেখলাম বদলানো হয়েছে এবং ঐ ভদ্রলোক বললেন যে বর্তমান অবস্থায় আমি যদি দস্তখত দিতে অস্বীকার করি চরম ভুল বোঝাবুঝির আশংকা দেখা দেবে। বিশেষতঃ যেখানে সবাই জানতো, আমি পাকিস্তান আদর্শে বিশ্বাসী সে ক্ষেত্রে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর মতো সই না দিলে নানা প্রশ্ন উঠবে। শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে সই দিলাম। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে তেহাত্তর সালে যখন আমাকে স্ক্রিনিং কমিটির সামনে হাজির করা হয়, কমিটির চেয়ারম্যান বললেন যে, ৭১-সালের ঐ বিবৃতিটি আমি লিখেছি বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা। আমি জবাবে বলেছিরাম যে, অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যা। মুসাবিদাটি এসেছিলো ইসলামাবাদ থেকে। রচয়িতার পরিচয় আমরা জানতাম না।

২৫শে মার্চের আর্মি এ্যাকশনের আগে যদিও কোনো রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা ইয়াহিয়া সরকার ভাবেননি, তাঁরা অতি সত্ত্বরই টের পেয়েছিলেন যে জনসমর্থন পেতে হলে নেতৃবৃন্দের সহানুভূতির প্রয়োজন। তাই এই সময় নুরুল আমিন সাহেব এবং আরো অনেক নেতার স্বাক্ষরিত বিবৃতি প্রচার করা হয়। এগুলো যে তাঁরা আর্মির চাপের মুখে প্রচার করতে বাধ্য হন তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলো না। ফল হয় উল্টো। আর্মির ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের মনে আরো সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এই কারণে পিস কমিটিগুলোও দেশে শান্তি- শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়নি। আর্মিও তাদের বিশ্বাস করতো বলে মনে হয় না। প্রায়ই শোনা যেতো যে তাদের সুপারিশ উপেক্ষা করে অনেক কিছু করা হয়, অনেক লোককে গ্রেফতার করা হয়, যার ফলে পিস কমিটির প্রতি জনগণের মনে একটা করুণার ভাব সঞ্চারিত হয়। এরা আর্মির হাতের পুতুল, এই সন্দেহ বদ্ধমূল হতে থাকে। পিস কমিটিতে অনেক সৎলোক ছিলেন যাঁরা চেয়েছিলেন যে দেশে শান্তি ফিরে আসুক এবং এ দেশের অখন্ডতা যেন রক্ষা পায়। কিন্তু স্বাধীনভাবে তাঁদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছিলো না- এ অভিযোগ বহু অঞ্চল থেকে শুনতে পাই।

আর্মির অবিশ্বাসের হেতু যে একেবারে ছিলো না, তা নয়। শুনেছি যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন অনেক লোক ভালো মানুষ সেজে পিস কমিটিতে যোগ দিতো যারা আওয়ামীদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করতো, অনেক তথ্য ফাঁস করে দিতো। এসব নিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, চারিদিক অবিশ্বাস ও

সন্দেহে ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছিলো। আমি একথা শুনেছিলাম যে, আর্মি যে রাজাকার বাহিনী গঠন করে তাদেরও কেউ কেউ অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যেতো। আবার এ কথাও শুনেছি, রাজাকার হয়ে কেউ কেউ ব্যক্তিগত শত্রুতার শোধ নিতো। এ সব ঘটনা সম্পর্কে কোনো কোনো সময় তদন্ত হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তিও দেয়া হয়েছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়।

প্রবাসী সরকার

আমি ঢাকায় থাকতেই শুনলাম, কোলকাতায় বাংলাদেশ সরকার নামক একটি সরকার গঠিত হয়েছে এবং পাকিস্তান সরকারের বাংগালী কর্মচারী কেউ কেউ এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে শুরু করেছে। প্রথম যে ব্যাক্তির নাম শুনি সে হলো সৈয়দ আমজাদ হোসেন। আমার ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের পুরানো ছাত্র, আমি তাকে খুব স্নেহ করতাম। সে দিল্লীতে পাকিস্তান মিশনে কার্যরত ছিলো। যখন সে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো তাকে পাকিস্তান আদর্শে বিশ্বাসী বলে জানতাম। সে যখন প্রতিবাদ করে চাকরী ত্যাগ করে তখন ইসলামাবাদ থেকে একদল অফিসার দিল্লীতে এসেছিলেন আমজাদ হোসেনের মতো কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। দিল্লী সরকার কোনো বাংগালী অফিসারকে ওদের সঙ্গে মিলিত হতে দেয়নি। আমজাদ হোসেন তখন এমন একটি বিবৃতি দিয়েছিলো যা পড়ে আমি খুব ব্যথিত হয়েছিলাম।

এ রকম আর একজন পরিচিত লোক যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখনও খুব বিস্মিত হয়েছিলাম। তিনি হলেন হোসেনআলী। ফরেন সার্ভিসের অফিসার, কোলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন। তিনি নাটকীয়ভাবে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে কলকাতার পাকিস্তান মিশনটিকে কার্যত একটি ইন্ডিয়ান প্রচারণার কেন্দ্রে পরিণত করেন। হোসেন আলীকে চিনতাম ১৯৪৭ সাল থেকে। '৪৭ সালে আমরা যে ক'জন তরুণ শিক্ষক পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ অঞ্চল থেকে সিলেটের এম সি কলেজে যোগ দিয়েছিলাম হোসেন আলী তাদের অন্যতম। তার ডিগ্রী ছিলো কেমিস্ট্রিতে। সিলেটের আম্বরখানায় আমি যে বাসা ভাড়া করেছিলাম প্রথম কয়েকদিনের জন্য তিনি সেখানে উঠেছিলেন। আমার সঙ্গে আরও ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক মঈদুল ইসলাম। তিনি বাসায় রয়ে গেলেন। হোসেন আলী এক রিক্সাওয়ালার সাথে মেস করেন। এ সময় অর্থাৎ '৪৭ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেন্ট্রাল সার্ভিসের জন্য অনেক অফিসার রিক্রুট করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় ছিল না। কারণ

তখনই কিছু লোক ট্রেনিং এর প্রয়োজন দেখা দিলো। এ প্রসঙ্গে বলা বোধ হয় প্রয়োজন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী আই সি এস অফিসার একজনও ছিলেন না। সুতরাং শুধু ইন্টারভিউ করে কাউকে ফরেন সার্ভিসে, কাউকে এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে, কাউকে অডিট সার্ভিসে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কলেজে কলেজে রিক্রুটমেন্ট টিম ঘুরে বেড়িয়ে লোক সংগ্রহ করেন। এইভাবে হোসেন আলী পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। আমি আগে থেকেই স্থির করেছিলাম যে, আমি শিক্ষকতা করবো। সে জন্য কোনো ইন্টারভিউ দিতে রাজী হইনি। সেই হোসেন আলী নাটকীয়ভাবে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করলেন, এ আমি কখনো ভাবতে পারিনি।

আর এক পরিচিত ব্যক্তি যার ডিফেকশনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হই তিনি ছিলেন আবু সাঈদ চৌধুরী। তাঁকে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভাইস চান্সেলর নিযুক্ত করা হয় তখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়। আগেও তাঁকে চিনতাম। তিনি কোলকাতায় ছাত্র রাজনীতি করতেন। তাঁর বাবা ছিলেন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় একবার আমার প্রাক্তন ছাত্র নুরুল ইসলাম (যিনি পরে হাইকোর্টে জাস্টিস নিযুক্ত হন) তাঁর বাসায় নজরুল ইসলাম দিবস উপলক্ষে আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তৃতা শুনি। তিনি ভালো বাংলা বলতেন এবং লিখতেনও। পরবর্তীকালে তাঁকে কিছুকাল পেয়েছিলাম বেংগলী ডেভলাপমেন্ট বোর্ড- এর চেয়ারম্যান হিসাবে। আমি ঐ বোর্ডের সদস্য ছিলাম। আবু সাঈদ চৌধুরী ডক্টর ওসমান গনির পর ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর রূপে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আমি তার কিছুদিন আগেই ১৯৬৯ সালে রাজশাহীতে যাই। সেই সময় একবার ইংলিশের এক্সপার্ট হিসাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনুরোধে সিলেকশন কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করতে হয়। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে রিডার নিয়োগের পালা। সিলেকশন কমিটিতে স্বভাবতই আবু সাঈদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করছিলেন। আরো ছিলেন মরহুম আবু হেনা, আর্টস ফ্যাকাল্টির ডিন (তার নাম আমার মনে নেই) এবং আরো দু'একজন। ক্যানডিডেট ছিলেন দু'জন, ডক্টর সিরাজুলে ইসলাম চৌধুরী এবং মিসেস মোহাম্মদ হোসাইন, আমারই এক বন্ধুর স্ত্রী। তাঁরও পিএইচডি ডিগ্রী ছিলো। খুব স্মার্ট মহিলা। আমি মিটিং শুরু হবার দুই মিনিট পরে এসে যোগ দিই। তখনও ইন্টারভিউ শুরু হয়নি। শুনে অবাক হলাম যে সিলেকশন কমিটির সদস্যরা প্রায় স্থির করে বসেছেন যে পদটি মিসেস হোসাইনকে দেওয়া হবে। ইন্টারভিউটা হবে ফরমালিটি মাত্র। আমি বললাম, যেখানে ডিপার্টমেন্টে একজন ভালো ক্যানডিডেট রয়েছেন সেখানে

আপনারা আগে থেকেই এ রকম মনস্থির করে বসেছেন কেন? সিরাজুল ইসলাম আমাদেরই ছাত্র। আমিই তাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম। তাকে বাদ দিয়ে বাইরের কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা অত্যন্ত অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি। সে যদি ইন্টারভিউতে একেবারেই কোনো কৃতিত্বের পরিচয় না দিতে পারে, সে আলাদা কথা। ইন্টারভিউতে প্রশ্ন আমাকেই করতে হলো। একেতো আবু সাঈদ চৌধুরী ইংরেজী সাহিত্যের লোক নন, দ্বিতীয়তঃ ইউনিভার্সিটির কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর তখন অভিজ্ঞতা হয় নাই। মিসেস হোসাইন ভেবেছিলেন তিনি এমন করে ইংরেজী বলবেন যে কেউ তাঁকে বিশেষ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে সাহস পাবেন না। আমাকে তিনি অবশ্যই চিনতেন। হয় তো আশা করেননি যে আমি তাঁকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু প্রশ্ন করে দেখা গেলো যে তিনি পিএইচডি পেয়েছেন সত্য কিন্তু তার জ্ঞান গভীর নয়। তার তুলনায় সিরাজুল ইসলামের পারফরমেন্স অনেক ভালো হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও সিলেকশন কমিটি মিসেস হোসাইনকে নিয়োগ করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু আমি শক্তভাবে প্রতিবাদ করায় তাঁরা আর পীড়াপীড়ি করেননি এবং সিরাজুল ইসলামকেই রেকমেন্ড করা হয়।

আর একবার আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ঘটে। সেটা করাচীতে। আমরা ইন্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ডের এক মিটিং-এ গিয়েছিলাম। কোনো এক ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়। তাঁর কোনো এক যুক্তির জবাব দিতে গিয়ে মুশকিলে পড়া গেলো। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন যে তাঁর কথায় বাধা দিলে তিনি আর মুখ খুলবেন না। আমি বিশেষ লজ্জিত হয়েছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের সামনে ও রকম অসৌজন্যমূলক দৃশ্যের অবতারণা করবেন এ ছিলো আমার ধারণাতীত।

যাক সে কথা। আবু সাঈদ চৌধুরী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে ঢাকা ত্যাগ করেন সপরিবারে। তিনি তখন পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে জেনেভায় জুরিষ্টদের সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। পরিবারের সবাইকে কেনো নিয়ে গেলেন সেটা বুঝা গেলো যখন ২৫শে মার্চের অব্যবহিত পর তিনি বিবিসিতে এক ইন্টারভিউতে বলেন যে, পাকিস্তান আর্মি তাঁর ইউনিভার্সিটির হাজার হাজার শিক্ষক ও ছাত্রকে খুন করেছে। এরপর তিনি আর ঐ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করতে পারেন না তাঁর এই চাঞ্চল্যকর বিবৃতিভে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়। কারণ ভাইস চান্সেলর পদের মর্যাদা পাশ্চাত্য জগতে খুব বেশী। তাঁর মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অতিশয়োক্তি করতে পারেন এটা ওরা ভাবতে পারে না। আশ্চর্যের কথা ২৫শে মার্চের ঘটনার পর শুধু বিদেশী পাকিস্তান বিরোধী প্রপাগান্ডার উপর

নির্ভর করে আবু সাঈদ চৌধুরী যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাতে সন্দেহ হলো যে পূর্বাহ্নেই তিনি টের পেয়োছিলেন যে দেশে একটা গৃহযুদ্ধ বাঁধবে এবং তিনি কোন পক্ষ গ্রহণ করবেন তাও আগে থেকেই স্থির করা ছিলো। আরো বিস্ময়ের কথা ২৫ তারিখের আগেই তিনি তাঁর ইস্তেফাপত্র পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনায় আমার মনে এ সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা গৃহযুদ্ধ ঘটাবে বলে আগে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। শুধু আর্মির এ্যাকশনের আকস্মিকতায় তারা কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়ে।

এদিকে রাজশাহী থেকে তাগিদ আসতে লাগলো আমি যেনো শিগগির ফিরে যাই। আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে আবার রাজশাহী ফিরে যেতে দিতে বিশেষ রাজী ছিলেন না। তারা ভাবছিলেন আমি আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। কিন্তু আমি স্থির করি যে প্রত্যাবর্তন না করা চরম কর্তব্যবিমুখতা হবে। ক্যান্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো আর্মি কনভয়ের সঙ্গে যাবো বলে মনস্থির করলাম। কিন্তু তার আগে ইউনিভার্সিটি কখন খুলবে সে সম্বন্ধে সরকারী মতামত জেনে নেয়া ভালো। তখন এসব ব্যাপার পরিচালনা করছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। তিনি বসতেন গভর্মেন্ট হাউজে যেটাকে আজকাল বঙ্গভবন বলা হয়। ইন্টারভিউ-এর একটা টাইম পেলাম কিন্তু আমাকে ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। ওয়েটিং রুমে তাহা বিন হাবীব নামক এক ব্যক্তির সাথে দেখা। তার নাম শুনেছিলাম, চিনতাম না। শুনেছিলাম যে আর্মির সঙ্গে জনসাধারণের লিয়াজোঁ তিনি করছেন। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। এবং আমি যখন রাও ফরমান আলীর কামরায় ঢুকলাম তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন। রাও ফরমান আলীর সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা। বাইরে থেকে মনে হলো তিনি খুব শান্ত প্রকৃতির লোক। ইউনিভার্সিটি খোলার ব্যাপারে তিনি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। বললেন, এ সিদ্ধান্ত আপনাদের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। আমি বলেছিলাম যে আরো দু'এক মাসের মধ্যে ইউনিভার্সিটি খোলা সঙ্গত হবে না। মনে হলো তিনি আমার সে যুক্তি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য ঐ ইন্টারভিউ-এর মাত্র দু'দিন পর আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই নির্দেশ জারী করা হলো যে ইউনিভার্সিটি অবিলম্বে খুলতে হবে এবং স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাদান শুরু হবে। রাজশাহীতে এসে দেখলাম যে আরো শিক্ষক এবং অফিসার ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছেন। ঢাকায় যে সমস্ত শিক্ষক আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তারাও কেউ কেউ ফিরে এলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন, ফজলুল হালিম চৌধুরী,

সালাহউদ্দিন আহমদ এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। তবে এরা ঠিক কোন তারিখে ক্যাম্পাসে প্রত্যাবর্তন করেন সে কথা আমার স্মরণ নেই।

আর একটা কথা বোধ হয় বলা দরকার। আমি ঢাকা পৌঁছাবার দু'দিন পরই জামাতা ক্যাপটেন ওয়ালী আহমদকে তার সিগন্যালস ইউনিট সহ পশ্চিম পাকিস্তানে বদলী করা হয়। সঙ্গে আমার মেয়েকেও নিয়ে গেলো। আর দু'দিন দেরী হলেই ওদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতো না। করাচী হয়ে এদের মারী যাওয়ার কথা। করাচীতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য ডক্টর আলী আশরাফকে ফোন করি। তিনি তখন করাচী ইউনিভার্সিটির ইংলিশের হেড। কথা খুব স্পষ্ট শোনা গেলো না। তবে খবরটা দিতে পেরেছিলাম। আশরাফ এবং তার স্ত্রী এসে ওদের এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে একদিন বা দু'দিন তাঁদেরই বাসায় রেখেছিলেন। এটা একদিকে যেমন স্বস্তির কারণ হলো অন্যদিকে নতুন এক দুশ্চিন্তার আকর হয়ে উঠলো। কারণ তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়মিত চিঠিপত্র আসতো না। আমি যখন জুন মাসে মারী যাই তখনি ওদের ঢাকা ত্যাগের পর ওদের সঙ্গে প্রথম দেখা। সিগনালস ইউনিটকে হঠাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তানে ট্রান্সফার করার কারণ শুনলাম, ঐ ইউনিটে একদিন এক বিষ্ফোরণ ঘটে। কে এর জন্য দায়ী সেটা আবিষ্কার করা না গেলেও আর্মি সারা ইউনিটকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। ১৬ই ডিসেম্বরের পর অন্যান্য বাংগালী অফিসারদের মতো ওয়ালী আহমদকেও অন্তরীণ করে রাখা হয়। তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। মাঝে মাঝে পশ্চিম জার্মানী থেকে ওয়ালী আহমদের এক আত্মীয় খোঁজ- খবর পাঠাতেন।

রাজশাহীতে তখন পূর্ণ উদ্যমে হিন্দুরা পদ্মা পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ চলে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বহু মুসলমানও ছিলো। আর্মি গ্রামাঞ্চলে সারা সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিতো। এর ফলে সর্বত্রই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আমি আগেই বলেছি যে আর্মির বিশ্বাস ছিলো যে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিলেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে। এ রকম একটা ঘটনার বিবরণ ডক্টর বারী দিয়েছিলেন। তাঁরই জানাশোনা এক গ্রামে দুষ্কৃতিকারী বলে চিহ্নিত বহু লোককে আর্মি হত্যা করে। এদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলো বাবরী ও দাড়ীওয়ালা। আর্মি বলে বসলো 'ইয়ে শিখ হ্যায়।' ডঃ বারী নিজে বহু চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারেননি।

অধ্যায় ৫

শরণার্থী

মে মাসের শেষের দিকে ইন্ডিয়ায় শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য কয়েকদিনের মধ্যেই এই সংখ্যাকে স্ফীত করে হাজার থেকে লাখ, লাখ থেকে কোটিতে নিয়ে আসা হয়। একদিন বা দু'দিনের ব্যবধানে সংখ্যার এমন তারতম্য কিভাবে ঘটতে পারে তা আমাদের বোঝা সাধ্যাতীত ছিলো। এই প্রপাগান্ডায় বিশ্বাস করতে হলে বিশ্বাস করতে হতো যে পূর্ব পাকিস্তানের রাস্তাঘাটে নদীপথ সর্বত্র শরণার্থীর ভীড়ে একটা জমাট বেঁধে গিয়েছিলো। এমন কিছু অন্তত আমার চোখে পড়েনি। তবে কয়েক লক্ষ লোক যে আর্মির ভয়ে ইন্ডিয়ায় পালিয়ে যায় তা অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না।

বহু বিদেশী সাংবাদিক এই উদ্বাস্তুদের দেখতে ছুটে আসেন এবং এদের দুর্দশার কথা ফলাও করে প্রচার করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা যে পাকিস্তানের ঘরোয়া সমস্যা নয়, সে কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ইন্ডিয়াকে প্রচুর সাহায্য দেয়া হয়। সেই সাহায্য কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনতাম। তবে সেগুলি কতটা সত্য বা মিথ্যা সে কথা আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারবো না। তবে যে কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো যে, একবার ইন্ডিয়ায় পা দিলে সহজে কারো পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসা সম্ভব ছিলো না। ইন্ডিয়ানরা নাকি তাতে রীতিমতো বাধা দিতো। ইয়াহিয়া খান কয়েক বার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। তার আর একটা কারণ ছিলো এই যে ফেরৎ আসা শরণার্থীরা মাঝে মাঝে আর্মি এ্যাকশনের শিকার হতো। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় শরণার্থীদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। দু'একটি দুর্ঘটনার পর এ সমস্ত ক্যাম্পে সহজে কেউ আসতে সাহস পেতো না। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ ক্ষমার নীতি যুক্তিযুক্তভাবেই গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে স্থানীয় আর্মির চরম হঠকারিতার জন্য সে নীতি বানচাল হয়ে যায়।

সরকারী নির্দেশ মতো ইউনিভার্সিটি খোলা হলো। ছাত্র- ছাত্রী কেউ কেউ ফিরে এলো। ক্লাসও শুরু হলো। তবে এদের সংখ্যা ছিলো খুবই অল্প। অনেক ছাত্র- ছাত্রী আওয়ামী বাহিনীর ভয়েও ক্লাসে আসতে ভয় পেতো। যেমন অনেক সরকারী কর্মচারী কাজে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করতো। কোলকাতা থেকে ঘোষণা করা হয়েছিলো যে স্কুল- কলেজ- অফিস- আদালত সবকিছু বর্জন করে প্রশাসনকে

প্যারালাইজ করে ফেলতে হবে। তবে এটা মোটেই সম্ভব হয়নি। কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়েছে সত্য কিন্তু প্রশাসনের কাজ রীতিমভোভাবে চলতে থাকে। তার একটা বড় প্রমাণ এই যে, বিদ্রোহী বাহিনী বহু চেষ্টা করেও কোন অঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি ঘটাতে পারেনি। দেশের বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী যেমন চালু ছিলো তেমনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাল- ডাল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পাঠানো হতো। চরম দুর্যোগের মধ্যেও কোন এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। হাট বাজারে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী বাহিনীর লোকেরা এসে বোমা ফাটিয়ে অথবা গোলাগুলী করে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সেটা সাময়িকভাবে।

অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার প্রপাগান্ডার ফলে পাকিস্তান খুব কাবু হয়ে পড়ে। কমনওয়েলথের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও একদিকে লন্ডন হয়ে উঠে আওয়ামীদের আশ্রয়স্থল। অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার সামরিক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন সরকার পাকিস্তানের প্রতি সদয় ছিলো না। তখন বৃটেনের প্রাইম মিনিষ্টার এডওয়ার্ড হীথ। তাঁর ফরেন সেক্রেটারী ছিলেন স্যার এলেন ডগলাস হিউম। তিনি পার্লামেন্টে পাকিস্তানের ঘটনা সম্পর্কে এমন এক বিবৃতি দিলেন যাতে মনে হলো যে পাকিস্তানের প্রতি বৃটিশ সরকারের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। অথচ তখন পাকিস্তান কমনওয়েলথের সদস্য। তবে প্রথম পর্যায়ে বৃটেন পুরোপুরি ইন্ডিয়াকে বা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন করেনি। স্যার এলেন বলেছিলেন যে যুদ্ধ যখন বেঁধেছে এটার একটা ফয়সলা না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ সরকার কোনো স্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে পারছে না। লেবার পার্টির সদস্যরা অবশ্য চেয়েছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে পঁচিশ তারিখের ঘটনার জন্য পাকিস্তানের নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব পাশ করাতে। তবে লন্ডনে প্রবাসী বাংগালীদের মধ্যে একদল যেভাবে পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্রে তৎপর হয়ে উঠে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা বৃটেন করেনি - পাকিস্তানের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও। আসল কথা, বর্তমান যুগে পাবলিসিটি যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এ সম্বন্ধে ইয়াহিয়া সরকার ছিলেন একেবারে উদাসীন। বলা হয় তো নিষ্প্রয়োজন ২৫ তারিখের এ্যাকশনের আগে ঢাকা থেকে জোর করে সব বিদেশী সাংবাদিককে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এর ফল কি হতে পারে সেটা সরকার ভেবে দেখেনি। স্বভাবতঃই পূর্ব পাকিস্তানের খবর ভারতের মধ্যবর্তিতায় অতিরঞ্জিত হয়ে বিদেশে প্রচারিত হয়। কোলকাতা এবং দিল্লীতে বসে বাজারের গুজবের উপর নির্ভর করে বিদেশী সাংবাদিকেরা এমন চটকদার কাহিনি তৈরি করে যা পাঠ করে বিদেশী যে কোনো পাঠকের মনে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ভয়াবহ ছবি আঁকা হয়ে যাবে। আমি এ কথা

বলছি না যে পঁচিশ তারিখে এমনই কিছু ঘটেনি। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকারের চরম নির্বুদ্ধিতার কারণে সত্য ঘটনা হাজার গুণ অতিরঞ্জিত হয়ে প্রচারিত হয়। পাকিস্তান কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার কথা আলাদা, মুসলিম অধ্যূষিত মধ্যপ্রাচ্যেও পাকিস্তানের সমর্থন বিশেষ ছিলো না। শুধু সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সল পাকিস্তানের সমর্থনে জেহাদের আহ্বান দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও সাড়া পাওয়া যায়নি। মিসরও রীতিমতো পাকিস্তান বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৫৬ সালে যখন ইসরাইল, বৃটেন এবং ফ্রান্স সমবেতভাবে মিসরের উপর হামলা করে সেই সংকট মুহূর্তে তদানীন্তন পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী যে বিস্ময়কর উক্তি করেন মিসরীয় নেতারা সে জন্য কখনো পাকিস্তানকে ক্ষমা করতে পারেনি। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলেছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের সব মুসলিম রাষ্ট্র আদতে শক্তিহীন। সুতরাং শূন্যের সঙ্গে যতোই শূন্য যোগ দেয়া হোক তার যোগ ফল শূন্যই দাঁড়াবে। মৌখিক সহানুভূতি দেখাতে পর্যন্ত পাকিস্তানের এই কার্পণ্যের কুফল থেকে পাকিস্তান এখনো ভুগছে। অথচ সেই সময় ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু মিসরের প্রতি তাঁর সর্বাত্মক সহানুভূতির কথা ব্যক্ত করেন। কার্যতঃ তিনি কিছুই করেননি, কিন্তু সংকট মুহুর্তের এই সহানুভূতির প্রয়োজন ছিলো। আমি পরে শুনেছি যে মিসর হয়ে ইউরোপ আমেরিকা থেকে অনেক অস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামীদের কাছে পৌছায়। ইসরাইলও আওয়ামীদের নৈতিক সমর্থন দিয়েছে।

পাকিস্তানের কুটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার আর একটি প্রমাণ এ সময়েই আমাদের গোচরীভূত হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক আঁদ্রে মালরৌ ANDRE MALRAUX যিনি এককালে ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলেন, ঘোষণা করেন যে বৃদ্ধ বয়সেও পূর্ব পাকিস্তানে যেয়ে তিনি বাংগালীদের পক্ষে লড়াই করতে প্রস্তুত। মালরৌ জেনারেল দ্যগলের এককালের বন্ধু। সারা পশ্চিম জগতে তাঁর প্রতিপত্তি ছিলো। সবাই তাঁকে সম্মান করতো। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর ঐ ঘোষণার পরও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রকৃত অবস্থা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা পাকিস্তান করেছে বলে আমরা শুনিনি। ফ্রান্সে কর্মরত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মালরৌর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলে কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। বোধ হয় ইয়াহিয়া সরকারের ধারণা ছিলো যে আরো অনেক ব্যক্তি যেমন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিবৃতি জারী করতেন মালরৌর বিবৃতিটি তার আর বেশী কিছু নয়।

লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, যেখানে এ অঞ্চলের অধ্যাপক এবং ছাত্র কিছু কিছু ছিলো, সেটাও পাকিস্তানের বিরোধী

তৎপরতার একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। কর্মরত বৃটিশ অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকে ধরে নিয়েছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে নির্মমতা যা হচ্ছিলো তার জন্য একতরফাভাবে পাকিস্তানই দায়ী। শত শত বিহারী এবং পাকিস্তানপন্থী বাংগালী মুসলমান আওয়ামীদের হাতে নির্মমতার শিকার হয়েছে, মনে হচ্ছিলো, সে খবর তাঁদের কানে পৌছায়নি। জুন মাসে এদের দু'একজনের সঙ্গে লন্ডনে আমার সাক্ষাৎ হয়। দেখলাম তাঁরা অত্যন্ত উত্তেজিত। পাকিস্তানের কোনো কৈফিয়ত থাকতে পারে তা তাঁরা শুনতেই রাজী নন।

আমি এবার আমার কাহিনীর মূলধারায় ফিরে যাচ্ছি। রাজশাহীতে অবস্থা স্বাভাবিক করবার প্রয়াসে আমি ইউনিভার্সিটি প্রশাসন চালু করার চেষ্টা করি। সিন্ডিকেটের মিটিং- এর জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু মিটিং- এর তিন চারদিন আগে - সঠিক তারিখগুলো আমার মনে নেই - ঢাকা থেকে চীফ সেক্রেটারী আমাকে ফোন করলেন যে আমার অবিলম্বে ঢাকা আসা প্রয়োজন। আমি জবাব দিলাম যে, সিন্ডিকেট মিটিং না করে আমার পক্ষে রাজশাহী ত্যাগ করা সম্ভব নয়। আমাকে কেনো ঢাকা যেতে হবে এ প্রশ্নের জবাবে বলা হলো যে খুব জরুরী দরকার। আমি বলেছিলাম যে আট দশ দিন পর আমি ঢাকা আসবো। কিন্তু সিন্ডিকেট মিটিং- এর একদিন আগে আবার ফোন এলো যে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে তলব করেছেন। আমাকে ইসলামাবাদ যেতে হবে। কেনো কি উদ্দেশ্যে তা বলা হলো না। তখন বাধ্য হয়ে সিন্ডিকেট মিটিং বাতিল করে আবার ঢাকা চলে আসি।

লন্ডন সফর

ঢাকা এসে শুনলাম যে সরকার ইউনিভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষক, হাইকোর্টের একজন জাষ্টিস এবং কয়েকজন রাজনীতিবিদকে বিদেশ পাঠাবেন। পূর্ব পাকিস্তানে কি হয়েছে বা হয় নাই তার বিবরণ বাইরের দুনিয়ার কাছে তুলে ধরতে। রাজনীতিবিদ ছিলেন দু'জন। হামিদুল হক চৌধুরী ও মাহমুদ আলী। হাইকোর্ট থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন জাস্টিস নুরুল ইসলাম আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি খেকে মনোনীত হয়েছিলেন বাংলা ডিপার্টমেন্টের ডঃ দীন মোহাম্মদ এবং হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ডঃ মোহর আলী। আমি আপত্তি তুললাম এই বলে যে, যে কাজের জন্য সরকার আমাদের বিদেশে পাঠাতে চান সেটা বিশেষভাবে রাজনীতিবিদের কাজ, শিক্ষাবিদদের কাজ নয়। এবং আমাদের যদি বিদেশ যেতেও হয়, রাজনীতিবিদদের সঙ্গে একটু ডেলিগেশনে গেলে আমাদের বিশ্বস্ততা

সাংঘাতিকভাবে ক্ষুণ্ন হবে। সরকারী কর্মকর্তারা বললেন যে এসব কথা ইসলামাবাদে জানালে ভালো হবে। কিন্তু আমরা যদি একেবারেই যেতে অস্বীকার করি, চরম ভূল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। বিবৃতি সই করাতে যেমন চাপ দেয়া হয়েছিলো এবার তেমনি চাপের মুখে পড়লাম।

হামিদুল হক চৌধুরী এবং মাহমুদ আলী আমাদের আগেই ইসলামাবাদ গিয়েছিলেন। ডঃ দীন মোহাম্মদ এবং ডঃ মোহর আলী আমার সঙ্গে যাত্রা করলেন। আমার যদ্দুর মনে পড়ে জাস্টিস নুরুল ইসলামও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পিন্ডিতে আমাদের রাখা হলো ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। পিন্ডি সরকারের নিম্নপদস্থ এক অফিসার এসে খবর দিলেন যে ফরেন অফিসে যেয়ে ফরেন সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। আমি বললাম যে, আমি সরকারের আমন্ত্রণক্রমে পিন্ডি এসেছি। সুতরাং আমার পক্ষে অফিসে যেয়ে ফরেন সেক্রেটারীর সঙ্গে মোলাকাত করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি কোথাও যেতে রাজি নই। আমার এই অনমনীয় ভাব দেখে পরেরদিন এসিসট্যান্ট ফরেন সেক্রেটারী সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের জন্য হোটেলে এসেছিলেন। তিনি বললেন যে ফরেন সেক্রেটারীর অফিসে আরো অনেকে জমায়েত হবেন। তিনি সেই সভায় যেতে আমাকে অনুরোধ করতে এসেছেন। তখন যেতে রাজী হয়েছিলাম। হোটেলে আর যাঁদের সাথে দেখা হয়েছিলো তাঁদের মধ্যে ছিলেন বেগম আখতার সোলায়মান - জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র মেয়ে। উচ্চ শিক্ষিত এবং পরিশীলিত। বোধ হয় তাঁর কাছেই শুনলাম যে সরকার জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি পূর্ব পাকিস্তানী ডেলিগেশন পাঠাতে মনস্থির করেছেন। আমি আবার বললাম যে বিদেশে সরকারের পক্ষে প্রচার কার্য চালনা শিক্ষকের কাজ নয়। আমরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো কথা বললে তার গুরুত্ব থাকবে না, লোকেরা ভাববে আমরা সরকারের চর হয়ে এসেছি। একজন রাজনীতিবিদের নেতৃত্বে কোনো প্রতিনিধি দলে যোগ দিতে আমি রাজী নই। ব্যক্তিগতভাবে হামিদুল হক চৌধুরী এবং মাহমুদ আলী সাহেবকে আমি চিনি। তাঁদের অসম্মান করার কোনো হেতু আমার নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের সাহচর্যে বিদেশ সফরে গেলে মিশনের আসল উদ্দেশ্য পন্ড হবে। আমাদের যদি যেতেই হয় আমরা শিক্ষকরা আলাদাভাবে যাবো। তাছাড়া বিদেশে সভাসমিতি বা রেড়িওতে বক্তৃতাও আমরা করতে পারবো না। যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন আমরা আমাদের কথা বলবো।

ফরেন সেক্রেটারীর অফিসে ১৫-২০ জনের মতো লোক উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদও ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের তরফ থেকে কথা বললেন প্রধানতঃ হামিদুল হক চৌধুরী। সেক্রেটারী তাঁর ভাষণে বললেন যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা সম্পর্কে অনেক গুজব এবং মিথ্যা কাহিনী প্রচারিত হচ্ছে। পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে আমরা যদি সত্য ঘটনা তুলে ধরি দেশ উপকৃত হবে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম শুরু হয়েছে সেটা যে পরিচালিত হচ্ছে সীমান্তের ওপার থেকে এক শত্রু দেশের সাহায্যে সে সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ নেই।

এ সমস্ত কথা যখন আলোচিত হয় তখন আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পর্কে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে যে প্রচারপত্র ৭০ সালেই বিলি করা হচ্ছিলো, পাকিস্তান সরকার তার জবাব দেননি কেন? 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' এই শিরোনাম দিয়ে পাশাপাশি কতগুলো হিসাব বিন্যস্ত করে দেখানো হয়েছিলো যে পাকিস্তানে ব্যবহৃত সব জিনিসের জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের বেশী মুল্য দিতে হয়। কাগজ, সরিষার তেল ইত্যাদি যে সমস্ত বস্তু পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত হতো তার দামও নাকি পশ্চিমাঞ্চলে ছিলো অপেক্ষাকৃত সস্তা। অথচ আমরা জানতাম, অভিযোগ প্রায় সবটা মিথ্যা। যাক, আমার প্রশ্নের উত্তরে সরকারের সেক্রেটারী আজগুবী এক কৈফিয়ত দিলেন। তিনি বললেন জবাব একটা তৈরি করা হয় তাতে সরকারী কাগজপত্রে প্রকাশিত তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণ করা হয় যে, আওয়ামী লীগের অভিযোগ ভিত্তিহীন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উচ্চপদস্থ জনৈক বাঙালী অফিসারের পরামর্শে সেটা প্রকাশ করা হয় নাই। ঐ অফিসার নাকি বুঝিয়েছিলেন যে, এ রকম বিবৃতিতে এ সময়ে আরো ভূল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে।

শেষ পর্যন্ত সরকার আমাদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে বিদেশ পাঠাতে রাজী হলেন। হামিদুল হক চৌধুরী এবং মাহমুদ আলী সাহেব ছিলেন বোধ হয় এক গ্রুপে, দীন মোহাম্মদ এবং জাস্টিস ইসলামকে নিয়ে হলো আর এক গ্রুপ। আমার গ্রুপে রইলেন ডঃ মোহর আলী।

এরপর আমাদের আরো কয়েকদিন ইসলামাবাদে থাকতে হয়েছিলো। কারণ বৃটিশ সরকার আমাদের ভিসা দিতে টালবাহানা করছিলো। এই সময়ে একদিন আমি মারীতে যাই আমার মেয়েকে দেখতে। এর আগে কখনো মারী আসিনি। শুনলাম আমার জামাতা ওয়ালী আহমদ মেজর পদে উন্নীত হয়েছে। ওদের বাসা ছিলো এক ছোট পাহাড়ের উপর। জুন মাস হলেও আবহাওয়া ছিলো

বেশ ঠান্ডা। ঘরে বসার পর এক পর্যায়ে জানালা বন্ধ করে দিতে হলো। কারণ টুকরো মেঘ ভেসে আসছিলো। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। মারীর রাস্তাঘাট বেশ পরিচ্ছন্ন, অনেকটা সুইজারল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলের মতো। চারদিকে অসংখ্য পাইন গাছ। ইসলামাবাদ থেকে আসার পথে গভীর খাদের পাশে পাহাড় ঘেষা রাস্তা থেকে যে দৃশ্য চোখে পড়লো তার তুলনা হয় না। শুনলাম, মাঝে মাঝে এ সময়ে দু'দিক থেকে আসা গাড়িতে সংঘর্ষ হলে বাঁচবার আর কোন উপায় থাকে না। কয়েকশ, ফুট নীচে খাদের মধ্যে পড়তে হবে। মারীর আগে আরো কতগুলো ছোট জনবসতির নাম পেলাম। সবগুলোকেই বলা হয় গলি। এ গলিগুলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে নাথিয়াগলি। মাঝে মাঝে ফেরিওয়ালারা ফল বিক্রি করছে আপেল, এপ্রিকট, প্লাকস, আঙ্গুর ইত্যাদি।

আমার মেয়ে মোহসিনার কাছে মারী অঞ্চলের একটি মেয়ে কাজ করতো। দেখলাম মোহসিনা ওর সঙ্গে খুব ভাব জমিয়েছে। মেয়েটার পরিবার অসম্ভব রকম গরীব। নতুন কাপড়-চোপড় পেয়ে সে মহাখুশী। কিন্তু এক ব্যাপারে কৌতুহল হল। ১৪-১৫ বছরের এই মেয়েটি আমার সামনে আসছিলো না। মোহসিনা বললো মেয়েটা বেগানা লোকের সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। মেয়েটি বাবুর্চিখানায় বসে চা তৈরি করে দিলো। মোহসিনা ট্রেতে করে সেটা আমাদের সামনে আনলো। বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না। কারণ পিন্ডিতে অনেক কাজকর্ম বাকী। বিদায় নেয়ার সময় মোহসিনা কেঁদেই ফেললো। দেশের যা পরিস্থিতি তাতে আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হবে তার নিশ্চয়তা ছিলো কোথায়?

লন্ডনে আমাকে এবং মোহর আলীকে যে হোটেলে রাখা হয়, সেটা ছিলো কেনসিংটন অঞ্চলে। বাকিংহাম প্রাসাদের কাছেই। জানি না কিভাবে আমাদের লন্ডনে উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়েছিলো। কারণ পরদিন সকালে পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কিছু লোক এসে হাজির। এর মধ্যে ছিলো আমার প্রাক্তন ছাত্র মকসুদুর রহমান হিলালী, সে তখন পিএইচডি করছে। এরা সবাই জানতে চাইলো পূর্ব পাকিস্তানে কি হয়েছে? এদের নিয়ে লাউঞ্জে বসরাম। কথা বলা শুরু করতেই ম্যানেজমেন্ট থেকে আপত্তি উঠলো। ওরা বললেন আপনারা লাউঞ্জে রাজনৈতিক সভা করতে পারবেন না। আমরা বললাম আমরা মিটিং করছি না। দেশবাসী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। তাদের সঙ্গে আলাপ করার অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে। লোক জমায়েত হয়েছিলো প্রায় কুড়িজন। গত্যন্তর না দেখে মোহর আলী এবং আমি এদের দু'ভাগ করে লাউঞ্জের দু'এলাকায় বসালাম। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট আবারো আপত্তি করতে শুরু করলো।

শেষ পর্যন্ত আগন্তুকদের বিদায় দিতে আমরা বাধ্য হলাম। বিদায় নেবার আগে সিলেটের এক ভদ্রলোক তারস্বরে ম্যানেজমেন্টকে গালাগালি করলেন। বললেন তোমরা পাকিস্তান বিরোধী চক্রে শামিল হয়েছো।

ডঃ মোহর আলী এবং আমি এক সঙ্গে হাইকমিশনে গিয়েছিলাম। পাকিস্তান হাইকমিশন নাইটসব্রিজ এলাকায় অবস্থিত। সেখানে দেখলাম যে প্রচুর বাংগালী অফিসার রয়েছেন, প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। হাইকমিশনার ছিলেন সালমান আলী; উর্দূভাষী। কিন্তু ডেপুটি হাইকমিশনার বাংগালী, সলিমুজ্জামান। এডুকেশনাল আটাশে ছিলেন তানবির আহমদ (ইনি পরে বাংলাদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন)। তানবির আহমদকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। ইতিহাসের লোক- এক সময় শিক্ষকতা করতেন। সলিমুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেলো - যে পাকিস্তানের প্রতি তাঁর আনুগত্যে ফাটল ধরেনি, তার কোনো সম্ভাবনাও ছিলো না। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বললেন, পূর্ব পাকিস্তানবাসী যে আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে তার কুফল তারা অচিরেই টের পাবে। জুনিয়র বাংগালী অফিসার যাদের সঙ্গে কথা হলো তাদের আচরণে আমি সংশয়াপন্ন হয়ে পড়লাম। মনে হলো শুধু চাকরীর খাতিরে দূতাবাস ত্যাগ করেননি - সুযোগ পেলেই করবেন। আমাদের সঙ্গে তারা খোলা মন নিয়ে আলাপ করতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

সালমান আলী

সালমান আলীর সঙ্গে যখন পরিচয় হলো তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে ইসলামাবাদ সরকার তাঁকে বিশেষ কোন তথ্য সরবরাহ করছেনা। তাঁকেও নির্ভর করতে হয় শোনা কথা এবং গুজবের উপর। আমরা যখন বললাম যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ২৫শের রাতে ৯ জন শিক্ষক নিহত হয়েছেন এবং ছাত্র দু'একজন, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তিনি আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তৃতা শুনেছিলেন এবং তাঁর ধারণা ছিলো সত্যি বুঝি কয়েকশ' শিক্ষক এবং ছাত্র ২৫- শের রাত্রে নিহত হয়। সালমান আলী সানডে টাইমস পত্রিকার একটা সংখ্যা দেখালেন। পড়ে তো আমি অবাক। মৃতের তালিকার মধ্যে ছিলেন আমার বন্ধু- সহকর্মী কে এম মুনিম, মুনীর চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক- এ রকম আরো কয়েকজন। আমি যখন বললাম যে লন্ডন যাত্রার প্রাক্কালে আমি মুনিম সাহেবের সঙ্গে ফোনে আলাপ করে এসেছি, সালমান আলীর বিস্ময় আরো বৃদ্ধি পেল। তাঁকে আরো বললাম যে আমি বিশ্বস্ত সুত্রে খবর নিয়ে এসেছি যে মুনীর

চৌধুরী এবং আবদুর রাজ্জাক জীবিত। সালমান আলীকে আরো বলা হয়েছিলো যে ঢাকায় নাগরিক জীবন বলে কিছু নেই।

তানবির আহমদের রুমে যখন গেলাম, পুরানা পরিচয় সুত্রে অনেক আলাপ হলো। তিনি ড্রয়ার থেকে বড় হরফে ইংরেজীতে লেখা একটা লিফলেট বা প্রচারপত্র দেখালেন। বললেন তাঁর পরিচিত এক বাংগালী মহিলা ওটা লন্ডনের রাস্তায় বিলি করছিলেন। প্রচারপত্রে লেখা ছিলো, 'আপনাদের মধ্যে বিবেক বলে যদি কিছু থাকে তবে পাশবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন।' এরপর ছিলো কয়েকটি লোমহর্ষক কাহিনী এক পিতার বরাত দিয়ে বলা হয়েছিলো যে ২৫শের রাত্রে আর্মি ঢাকায় মেয়েদের হলে ঢুকে শুধু গুলী করে অনেক মেয়েকে হত্যা করেনি, তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। সমকামী পাঠান সৈন্যরা মেয়েদের ঐ জঘন্য প্রকারেও ধর্ষণ করেছে। বক্তা পিতা আরো আরো বলেছিলেন যে এ সমস্ত ঘটনা নীচের তলায় যখন হচ্ছিলো তখন জন পঞ্চাশেক মেয়ে উপর তলা থেকে এ সমস্ত কান্ড দেখছিলো। তারা যখন বুঝতে পারলো যে এর পরেই তাদের পালা তখন তারা উপর থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ওর মধ্যে বক্তার কন্যাও ছিলো। তানবির আহমদ যখন বর্ণনার বীভৎসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ঐ মহিলাকে বলেছিলেন যে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে এ ঘটনার মূলে কোন সত্যতা নেই। মহিলা জবাব দিয়েছিলেন Every thing is fair in love and war অর্থাৎ যুদ্ধ এবং প্রেমের ব্যপারে অন্যায় বলে কিছু নেই।

তানবির সাহেবকে আমি বললাম যে ঢাকায় আমি নিজে মেয়েদের হলের প্রভোস্ট মিসেস আলী ইমামের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এসেছি। তাঁর কাছে যা শুনেছি তা হলো এই ৭ই মার্চের পর অধিকাংশ মেয়ে হল ছেড়ে চলে যায়। ২৪ তারিখে ৫ জন মেয়ে মাত্র হলে ছিলো। ২৪ তারিখের দিকে যখন আর্মি এ্যাকশনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ঢাকায় গুজব ছড়াতে থাকে তখন মিসেস ইমামের নির্দেশে এই মেয়েগুলোও হল ছেড়ে জনৈকা হাউজ টিউটরের বাসায় আশ্রয় নেয়। সুতরাং হলের মেয়েদের উপর অত্যাচার বা ধর্ষণের কোনো কথাই উঠতে পারে না। হলের চারদিকে ছিলো চতুর্থ শ্রেণীর কোয়ার্টার্স। এদের কেউ কেউ আর্মির গুলী খেয়ে মারা পড়ে। আমার বর্ণনা শুনে তানবির তো অবাক।

তানবির আহমদের অফিসেই আমাদের লন্ডন থাকার খরচপত্রের প্রথম কিস্তি দেওয়া হয়। যে রশিদ আমরা সই করেছিলাম তার ফটোকপি বাংগালী অফিসাররা গোপনে আওয়ামী লীগ পন্থী লোকজনের হাতে পাচার করে। তবে এটা করা হয়েছিলো এতো কৌশলে যে রসিদে সই করার সময় যদিও কোন বাংগালী

অফিসার উপস্থিত ছিলেন না, তবু এর কপি তারা সংগ্রহ করে ফেলেন। তানবির আহমদ এবং তাঁর সহকর্মীদের অসতর্কতার জন্য কোনো কিছুই গোপন থাকতো না। তা ছাড়া আরো লক্ষ্য করেছি যে সালমান আলী বা সলিমুজ্জামান তখন পর্যন্ত বিশ্বাস করেননি যে বাংগালী অফিসাররা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। আমরাই পরে সালমান আলীকে জানিয়ে ছিলাম যে আমাদের সন্দেহ হয় জুনিয়ার বাংগালী অফিসার অনেকে আওয়ামী লীগের সমর্থক।

সালমান আলী বললেন যে পাবলিসিটির অভাবে পাকিস্তানের ইমেজ এমনভাবে নষ্ট হয়েছে, এমপিরা পর্যন্ত তাঁকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করে চিঠিপত্র লিখতে বা ফোন করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা সালমান আলীর কোন জবাবই শুনতে চাইতেন না। এই এমপির দলে ছিলেন লেবার পার্টির জনস্টোন হাউজ। সালমান আলী হাই কমিশনার হিসাবে খবরের কাগজে বিবৃতি পাঠিয়েছেন, কিন্তু সে বিবৃতি কোনো পত্রিকায়ই ছাপা হয়নি। এক পর্যায়ে সালমান আলী বললেন, আপনারা যে সমস্ত তথ্য আমাকে জানিয়েছেন তা লিখিতভাবে দিলে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হবো। বলতে পারবো যে এটা পূর্ব পাকিস্তানের দু'জন শিক্ষিত লোকের কথা। একটা ছোট বিবৃতি খাড়া করা হলো। এটায় আমার ও মোহর আলীর স্বাক্ষর ছিলো। আমরা লিখেছিলাম যে ২৫শের রাতে অনেক নির্মম এবং অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু লন্ডনের কাগজে যা প্রচারিত হচ্ছে তার শতাংশের একাংশও সত্য নয়। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে নিহত হয়েছিলেন ৯ জন শিক্ষক। এর মধ্যে আমরা জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ডঃ জিসি দেবের নাম উল্লেখ করে বলি যে, এই অপ্রীতির ঘটনার জন্য আমরা শুধু দুঃখিতই নই, এর নিন্দা করতেও আমাদের কুণ্ঠা নেই। মেয়েদের হলের ব্যাপার উল্লেখ করি এবং লন্ডনে বিলিকৃত লিফলেটের নিন্দা করে বলি যে এ রকম প্রচারণায় পূর্ব পাকিস্তানীদের দুঃখের লাঘব হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যারা এই প্রচারণা চালাচ্ছেন তারা চান না যে পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ফিরে আসুক।

বিবৃতিটি লেখা হয়েছিলো সালমান আলীর ব্যবহারের জন্যে। তিনি বললেন এটা তিনি খবরের কাগজে পাঠাতে চান। আমরা আপত্তি করিনি। কারণ এতে এমন কোনো কথা ছিলো না যা অসত্য। অথচ এই বিবৃতি বিকৃত হয়ে ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। এটা প্রথম বের হয়েছিলো লন্ডন টাইমস পত্রিকায়। আমি যখন জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে দেশে ফিরে আসি, আমার এক আত্মীয়, সৈয়দ আলী আহসানের ছোট ভাই সৈয়দ আলী রেজা এসে বললো যে, সে পূর্ব পাকিস্তানের কাগজে পড়েছে যে আমরা নাকি টাইমসকে জানিয়েছিলাম যে দেশে

২৫ তারিখের রাতে কেউ মারা পড়েনি। রেজা আমাকে বললো, সাজ্জাদ ভাই, আপনি এমন কথা বলতে পারলেন কিভাবে? আমি বললাম, তুমি কি আমার মূল চিঠি দেখেছো? সে বললো না। আমি বললাম, তা হলে তুমি কেমন করে বিশ্বাস করলে যে ঐ রকম জঘন্য একটা মিথ্যা আমি উচ্চারণ করতে পারি। ক্যাম্পাসে ২৫ তারিখে কি হয়েছিলো সে সম্বন্ধে কয়েকটি গুজবের জবাব দিয়েছি মাত্র। কোথায়ও কিছু হয়নি এমন কথা কস্মিনকালেও বলিনি।

লন্ডনে আমাদের একমাত্র পাবলিক অ্যাপয়েনমেন্ট ছিলো প্রফেসর যায়েদীর অনুরোধে লন্ডন স্কুল অব এশিয়ান এ্যান্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজ- এ লাঞ্চের নিমন্ত্রণ। যায়েদী সাহেবকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। ইতিহাসের লোক। উত্তর ভারত থেকে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যখন এসে উপস্থিত হই তখন করাচীর বাংলার অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা। করাচীতে তাঁকে চিনতাম। কিন্তু এখানে মনে হলো তিনি আমাকে এবং মোহর আলীকে দেখে বেশী সন্তুষ্ট হলেন না। যায়েদী সাহেব তাঁর সহকর্মী দু'জন বৃটিশ অধ্যাপককে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে ডেকেছিলেন। আমি আগেই উল্লেখ করেছি এঁদের মনে হলো খুব উত্তেজিত। আমাদের কথা শুনলেন কিন্তু প্রতিবাদ করে বলতে লাগলেন যে আর্মি অনেক নৃশংসতার জন্য দায়ী। আমরা বলেছিলাম যে নৃশংসতার নিন্দা আমরা অবশ্যই করি কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থন আমরা করতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না, তারা চায় স্বাধিকার।

লন্ডনে আমাদের আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। হাইকমিশনে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা ইউরোপের অন্যান্য দেশে সফর করতে রাজী কি- না। আমি এ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখান করি। সালমান আলীকে বলি যে বিদেশে আমরা পাকিস্তানের সমর্থনে যাই বলি না কেনো তা বিকৃত হয়ে দেশে প্রচারিত হবে। এর ফলে আমাদের পরিবারের লোকজন বিপন্ন হবে। কারণ সরকার যতোই বলুন কারো নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারছিলেন না। সালমান আলীর বিশেষ অনুরোধে আমরা শুধু আমেরিকা যেতে রাজী হলাম। মোহর আলী, জাস্টিস নুরুল ইসলাম, ডঃ কাজী দীন মোহামদ এবং আমি লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাত্রা করি।

প্লেন লন্ডন থেকে আয়ারল্যান্ডের শ্যানন এয়ার পোর্টে এসে প্রথম নামলো। সেখানে প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। লাউঞ্জে দেখলাম অনেক আইরিশ পরিবার। তারা ঐ প্লেনে আমেরিকা যাবে । প্রত্যেক দলেই

অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তখন মনে হলো আয়ারল্যান্ড ক্যাথলিক দেশ। এখানে কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করে না।

নিউইয়র্কের ঘটনা

চার ঘন্টায়, আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্কের আকাশে এসে পৌছলাম। কিন্তু নিউইয়র্কের বিখ্যাত আইডল ওয়াইল এয়ারপোর্টে প্লেন নামতে পারলো না (এই এয়ারপোর্ট বর্তমানে জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট নামে পরিচিত)। নিউইয়র্কে তখন ঝড় হচ্ছিলো। নিউইয়র্ক স্টেটের অন্য একটি এয়ারপোর্টে আমরা নামি এবং সেখানে কাস্টম চেকিং হয়ে যায়। কিছুকাল বাদে আবহাওয়া শান্ত হলে আমাদের নিউইয়র্কে নিয়ে আসা হয়। পাকিস্তানী এমব্যাসির লোকজন এয়ারপোর্ট থেকে এক হোটেলে নিয়ে গেলো। হোটেলের চেহারা দেখে আমরা সবাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম যে সরকারী অতিথি হিসাবে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর এ হোটেলে থাকতে রাজী নই। এমব্যাসির লোকজনেরা বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে অন্ততঃ পক্ষে প্রথম রাতটা এখানে যেনো কাটাই। আমরা চারজনই বললাম সে হতেই পারে না। শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের একটা ভালো হোটেলে নিয়ে গেলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ডিনার খেয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। আমার যদ্দুর মনে পড়ে আমি এবং মোহর আলী একই হোটেলে ছিলাম। জাস্টিস নুরুল ইসলাম এবং কাজী দীন মোহাম্মদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। পরদিন সকাল বেলা আমাদের এক আমেরিকান প্রফেসরের সঙ্গে আপয়েনমেন্ট ছিলো। গোসল করে কাপড়- চোপড় পরে ব্রেকফাস্ট খেতে নীচে নামবো এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। মোহর আলীর গলা। সে বললো কয়েকজন নিউইয়র্কবাসী বাংগালী ছেলে তাকে কামরায় আটক করে রেখেছে। তাকে বেরুতে দিচ্ছে না এবং বলছে তক্ষুণি তাদের দলে গিয়ে যোগ দিতে। আমি নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে মোহর আলীর কামরায় নক করলাম। দেখলাম, সত্যি তিন চারজন বাংগালী উপস্থিত। আমাকে দেখেও তারা বলে উঠলো আপনাদের আমরা কাজে বেরুতে দেবো না। আপনারা এখনই আমাদের সঙ্গে চলুন। এখানে আমরা বাংগালীরা দেশের মুক্তির জন্য যে আন্দোলন চালিয়েছি তাতে আপনাদের যোগ দিতে হবে। আমাদের কোনো কথাই তারা শুনবে না।

এই দলে একজন প্রবাসী ডাক্তারও ছিলো। এরা নাছোড়বান্দা, আমাদের একবারেই বেরুতে দেবে না। আমি বললাম, আমরা সকাল বেলা নাশতা পর্যন্ত

করিনি। এখন প্রায় ৮টা বাজে। আমাদের ব্রেকফাস্ট রুমে যেতে দিন। এ প্রস্তাবে ওরা রাজী হলো। কিন্তু আমাদের টেবিলেই দু'জন ব্রেকফাস্ট অর্ডার দিলো। আমাদেরকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেবে না। ব্রেকফাস্টের পর আবার সেই কথা, আপনারা বাংগালী হয়ে বাংগালীদের স্বার্থবিরোধী কাজ করছেন কেনো? আপনাদের ইয়াহিয়া খানের দালালী করতে দেয়া হবে না। আমরা বললাম, আমরা ঢাকা থেকে এসেছি। পূর্ব পাকিস্তানে কি হচ্ছে সেটা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব মতামত আছে। পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে বাংগালী পান্জাবী সবারই দুর্গতি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের কথা বলার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। ওরা এসব কিছুই শুনতে রাজী নয়।

বাইরের কাউকে আমাদের অবস্থার কথা জানাবো তার উপায় ছিলো না। আমি শেষ পর্যন্ত বললাম, আমাকে বিশেষ কারণে আমার কামরায় যেতে হবে। আমাকে ছেড়ে দিন। মোহর আলী অপনাদের কাছে জিম্মি হয়ে রইলো। আমি উপরে এসে পাকিস্তানের ইউএন এমব্যাসেডর আগা শাহীকে ফোন করে সব ঘটনা বলি। উনি বললেন, আমি লোক পাঠিয়ে আপনাদের উদ্ধার করার ব্যবস্থা করছি। তখন প্রায় ৯টা বাজে। পাকিস্তান এমব্যাসি থেকে আমাদের নেবার জন্য লোক এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের ওদের সঙ্গে বেরুবার উপায় ছিলো না। আমি কামরায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। ১৫/২০ মিঃ মধ্যেই নিউইয়র্কের পুলিশ এসে হাজির হলো। বিরাট লম্বা চওড়া জোয়ান। তারা অনায়াসেই বাংগালীদের সরিয়ে দিয়ে আমাদের উদ্ধার করলো। কাপড়- চোপড় যা ওয়ার্ডরোবে ছিলো তার কিছু কিছু ফেলে আসতে হলো। কারণ এখন এ সব প্যাক করার সময় নেই। এভাবে পুলিশ এসে পড়বে বাংগালী ছেলেরা তা ভাবতে পারেনি। তারা এজন্য প্রস্তুত ছিলো না। তা ছাড়া নিউইয়র্কের পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে আমাদের হাইজ্যাক করার ক্ষমতাও তাদের ছিলো না। লিফটে নামবার সময় আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে একজন বিড়বিড় করে বললো We will see you around অর্থাৎ দেখে নেবো। আরো বললো আমি গভর্ণর মুনেমের দালাল। রাজশাহীর ভাইস চান্সেলর হওয়ার কোনো যোগ্যতাই আমার ছিলো না। পাঞ্জাবীদের পদলেহন করে আমি এই পদ করায়ত্ত করেছি। এসব কথার জবাব দেওয়া মনে করলাম সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

ট্যাক্সি করে আমাদের নিউইয়র্কের অন্য প্রান্তের এক নিরালা এলাকায় নিয়ে আসা হলো। সেদিনের কোনো এপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করা সম্ভব হলো না। হোটেলের সামনে একটা ছোট্ট পার্ক ছিলো। এখানে হিপিদের আড্ডা। নর- নারী

মিলে সারাদিন মদ খেতো এবং নানা দুষ্কর্ম করতো। এমব্যাসির লোকেরা সাবধান করে দিলেন আমরা যেনো একা পার্কে না যাই। হিপিরা নাকি ছুরি দেখিয়ে দরকার হলে তা ব্যবহার করে মদ এবং গাঁজা খাওয়ার পয়সা জোগাড় করতো। এই হোটেলে বাংলাদেশ আন্দোলনের কেউ এসে আর উৎপাত করতে পারেনি। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম এ ভেবে যে, আমেরিকায় আমাদের প্রোগ্রামের খুঁটিনাটি লন্ডন থেকে বাংলাদেশ আন্দোলনের লোকজনের কাছে এসেছে।

আগা শাহীর সঙ্গে যখন দেখা হলো, তিনি দুঃখ করে বললেন যে তাঁর বাংগালী কর্মচারী সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তাদের কাউকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিছু গোপন থাকে না। সে জন্য বাধ্য হয়ে খুব জরুরী cipher তিনি নিজ হাতে টাইপ করেন। লন্ডনে যেমন দেখেছিলাম দূতাবাসের কর্মচারী প্রায় অর্ধেক বাংগালী, নিউইয়র্কেও তাই এবং সম্ভবতঃ বাংগালী কর্মচারীদের অনুপাত এখানে আরেকটু বেশী ছিলো। আগা শাহীর নীচের পদটিতে ছিলেন আতাউল করিম বলে এক বাংগালী ভদ্রলোক। তিনি আগা শাহীর উপস্থিতিতে পাকিস্তানের সংহতির কথা বলতেন কিন্তু আমার মনে হতো যে তাঁর বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরেছে। আরো কিছুকাল পর তিনি স্বপক্ষ ত্যাগ করে আওয়ামী দলে যোগদান করেন।

লন্ডনে ও নিউইয়র্কে এবং পরে ওয়াশিংটনেও বাংগালী কর্মচারীর যে অনুপাত লক্ষ্য করেছিলাম তাতে মনে হয়েছিলো যে বাংগালীরা ডিপলোমেটিক সার্ভিস-এ বিশেষ পাত্তা পাচ্ছে না বলে যে প্রচারণা চালানো হতো তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হয়তো এ কথা সত্য যে যোগ-বিয়োগের হিসাব করে দেখা যেতো ১৯৭০-৭১ সালে অবাংগালী কর্মচারীর সংখ্যাই বেশী ছিলো কিন্তু তার কারণ ঐতিহাসিক। '৪৭ সালের পর যে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানী যুবক সেন্ট্রাল সার্ভিস-এ যোগদান করে তাদের মধ্য থেকেই বাংগালী কূটনীতিক নির্বাচন করতে হতো। অপর পক্ষে ভারতীয় অবাংগালী মুসলমান যারা অপশন দিয়ে পাকিস্তানে যোগদান করেন তাঁরা ছিলেন বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় অনেক বেশী প্রবীণ। তাঁদের দাবী উপেক্ষা করে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অন্ধভাবে সমতা রক্ষা করা সম্ভব ছিলো না। এ রকম প্রস্তাব কোনো সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

অনেক বাংগালী শিক্ষকও এ্যাডহক অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে রাতারাতি ডিপলোমেট পদে উন্নীত হন। বর্মায় পাকিস্তানের প্রথম এ্যামবেসেডর ছিলেন বগুড়ার সৈয়দ মোহাম্মদ আলী। তিনি পরে ওয়াশিংটনে এ্যামবেসেডর নিযুক্ত হন। বার্মায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত যিনি হন তিনি ঢাকার আর্মানিটোলা হাই স্কুলের প্রাক্তন

শিক্ষক কমর উদ্দিন আহমেদ। পরে ইনি আওয়ামী লীগের পক্ষ গ্রহণ করে সোশাল হিস্ট্রি অব ইস্ট পাকিস্তান নামক ইংরেজীতে একটি বই লেখেন। ভাষা অত্যন্ত কাঁচা। তাঁর মতামতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ তিনি লিখেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের সামাজিক ইতিহাসে ইসলামের স্থান বিশেষ নেই। এর মধ্যে বাংগালী জাতীয়তাবাদের কথা প্রথম উচ্চারিত হতে দেখা যায়। তিনি আরো লিখেছিলেন যে মুসলিম লীগের আন্দোলনে বাংলার মুসলমানের সমর্থন বিশেষ ছিলো না। তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি এমন এক ঘটনা উল্লেখ করেন যার প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজে। ১৯৩৬ সালে জিন্নাহ সাহেবের প্রথম ঢাকা সফরের সময় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মিলনায়তনে যে সভা হয় তাতে নাকি বিশেষ কেউ যায়নি, হলের অনেকাংশ খালি পড়ে ছিলো। আমি তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র। এই সভায় উপস্থিত ছিলাম। মিলনায়তনে চেয়ার একটিও খালি ছিলো না। আমি এবং আমার সঙ্গে আর যে দু'জন ছিলেন- আমরা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনি। অথচ কমর উদ্দিন সাহেবের বিবরণ পাঠ করলে মনে হবে যে জিন্নাহ সাহেবের কথা শোনার আগ্রহ মুসলিম ছাত্র সমাজের মোটেই ছিলো না। আমার আরো মনে আছে যে, সলিমুল্লাহ হলের এই সভায় জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক এবং মৌলবী তমিজ উদ্দিন ছিলেন। তাঁরাও বক্তৃতা করেছিলেন।

বার্মায় পাকিস্তানের তৃতীয় এ্যামবেসেডর ছিলেন ঢাকার প্রখ্যাত উকিল সুলতান উদ্দিন আহমদ। তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন ছাত্র। আমি যখন ১৯৫৪ সালে চারজন ছাত্র সমভিব্যাহারে বার্মা যাই তখন সুলতান উদ্দিন সাহেব তার বাড়িতেই আমাদের রাখেন। তাঁর ব্যক্তিগত মেহমান হিসেবে।

১৯৭০-৭১ সালে চীনের মতো দেশে এ্যামবেসেডরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির আর এক প্রাক্তন ছাত্র খাজা কায়সার। ১৯৩৯ সালে ইতিহাসে ডিগ্রী নিয়ে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে যোগ দেন। ইউনিভার্সিটিতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিলো। আমার চেয়ে দু'বছরের সিনিয়র। ১৯৭০ সালে মাও সেতুং-এর কম্যুনিস্ট রেভ্যুলুশনের বিজয় দিবস উপলক্ষে পাকিস্তান থেকে যে ডেলিগেশন পিকিং- এ যায় আমি তার সদস্য ছিলাম। পাকিস্তানের লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতিকুর রহমান ছিলেন দলের নেতা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমার সঙ্গে ছিলেন ইত্তেফাকের মুঈনুল হোসেন। খাজা কায়সার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমাদের বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন। আমার মনে আছে যে ১লা অক্টোবর তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে যে প্যারেড হয় সে প্যারেড দেখার সময় খাজা কায়সার

আমাকে বিশেষভাবে বলেন যে, আপনাদের ভাগ্য ভালো হলে চেয়ারম্যান মাও অন্যান্য বছরের মতো গ্যালারির সামনে একবার ঘুরে যেতে পারেন। যদি তিনি আসেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সামনের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিবেন। তিনি করমর্দন করবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে বছর স্বাস্থ্যগত কারণে চেয়ারম্যান মাও গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সামরিক বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন, কোনো দিকে গেলেন না।

'৭০ সালের শেষ দিকে বা '৭১ সালে - আমার ঠিক তারিখ মনে নেই - কেনিয়াতে পাকিস্তানের হাইকমিশনার ছিলেন ডঃ ওসমান গনি। ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ভাইস চান্সেলর। এমন কি '৭১ সালেও যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরও আরো কয়েকজন বাংগালীকে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। একজনের নাম বিশেষ করে মনে পড়ছে। রেজাউল করিম। লন্ডনে তানবির আহমদের অফিসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন যে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রদূত হিসেবে পুর্ব ইউরোপের একটি দেশে যাচ্ছেন। যদ্দুর মনে পড়ে সে দেশটি হলো চেকোশ্লোভাকিয়া। আমি এ সব নাম উল্লেখ করলাম এ কথা বুঝাতেই যে ডিপলোমেটিক সার্ভিসে '৭০-'৭১ সালের দিকে উচ্চতম পদে বিশেষ কোনো বাংগালী ছিলেন না, এ কথা আদৌ সত্য নয়।

লন্ডন এবং নিউইয়র্কের ঘটনায় আমার মনে একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে উঠছিলো। এখন আর সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। রাজশাহীতে যেমন দেখেছিলাম যে রাস্তায় গাছের গুড়ি দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করার জন্য ২৫শে মার্চের অনেক আগে কনট্রাকটর নিযুক্ত করা হয়, তেমনি কূটনৈতিক সার্ভিসেও বাংগালী আফিসার সবাই গৃহ যুদ্ধ বাঁধলে কি করতে হবে সেজন্য তৈরি হয়েছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করাই সত্য যে, পঁচিশ তারিখ রাতের ঘটনার আকস্মিকতায় ক্ষুদ্ধ হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই এতবড় একটা আন্দোলন orchestrate করা সম্ভব হতে পারে না। সবাই যেনো জানতো কখন কি হবে এবং তার প্রতিরোধ কিভাবে করতে হবে। এইভাবেই আমাদের লন্ডন এবং নিউইয়র্কের প্রোগ্রাম ফাঁস করে দেয়া হয়। তার মানে লন্ডনে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের সঙ্গে নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে কর্মরত কর্মচারীদের রীতিমতো যোগাযোগ ছিলো। দিল্লীর আমজাদ হোসেন, কোলকাতার হোসেন আলী, আবু সাঈদ চৌধুরী, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের বাংগালী কর্মচারীরা মনে হচ্ছিলো একই মাষ্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করে চলেছেন। এই প্ল্যানের প্রয়োজনেই নানা প্রকারের উস্কানী দিয়ে আর্মিকে এ্যাকশনে নামতে প্ররোচিত করা হয়। ঢাকা

ক্যান্টনমেন্ট অবরোধের আর কি অর্থ হতে পারে? আর যে নির্বোধ আর্মি অফিসারদের উপর দেশ রক্ষার ভার ছিলো, তারা এই ফাঁদে পা দিয়ে পূর্বাপর কোনো ভাবনা না করে ২৫ তারিখের রাত্রে কতকগুলো নিরপরাধ এবং নিরীহ লোক হত্যা করে। এদের অধিকাংশের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সংশ্রব ছিলো না।

অধ্যায় ৬

আমেরিকার অভিজ্ঞতা

আমেরিকায় যে তিনটি এপয়েন্টমেন্টে যোগ দিতে পেরেছিলাম, তার একটি হচ্ছে কংগ্রেসের এক সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। দ্বিতীয়টি একজন প্রভাবশালী অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা এবং তৃতীয়টি পাকিস্তানের প্রেস কাউন্সিলার- এর দেয়া এক লাঞ্চ। এই লাঞ্চে বেশ কিছু মার্কিন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসম্যান (তাঁর নামটা এখন মনে পড়ছে না) পাকিস্তান সংকটে প্রচুর সহানুভূতি প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, তাঁর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে পাকিস্তানের শত্রুরা এর পেছনে সক্রিয়। তিনি আরো বললেন যে পাকিস্তানের বক্তব্য যাতে আমেরিকান জনসাধারণের কাছে পৌছে দেয়া যায় তার চেষ্টা তিনি করবেন। তবে একথা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি যে সোজাসুজি পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগ্রহ কোনো আমেরিকান রাজনীতিকের ছিলো না। তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সন। পরবর্তীকালে যে সমস্ত দলিল বিশেষ করে তাঁর সেক্রেটারী অব ষ্টেট হেনরি কিসিঞ্জারের বই - 'দি হোয়াইট হাউজ ইয়ারস'-এ যে সমস্ত কথা প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হয় যে যদিও প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজে অনেকটা পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁর অধিকাংশ উপদেষ্টা ছিলেন ভারত সমর্থক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করার আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথেও তিনি দেখা করেন। সেই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ বেরিয়েছে তাতেও প্রমাণিত হয় যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তার কারণ ছিলো এই যে তিনি বিশ্বাস করতেন যে অচিরেই পাকিস্তান ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন কি? নিক্সন যদি জোরালো ভাষায় মিসেস গান্ধীকে বাধা দিতেন, বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভারত পাকিস্তানের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করার সাহস পেত না এই ঘটনায় আরো প্রমাণিত হয় যে ভারতের প্রচারণার ফলে পাকিস্তান কতটা নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে পড়েছিলো। বড় শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র চীন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু চীনের পক্ষে সরাসরি সৈন্য পাঠিয়ে ভারতের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিলো না। এই খবর চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌএন লাই পাকিস্তানকে গোপনে জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের এক কূটনীতিক অতি কৌশলে সংবাদটি ভারতকেও জানিয়ে দেন।

এবার ভারতের পক্ষে আর বাধা রইলো না। যদিও নির্বোধ ইয়াহিয়া খান শেষতক এই বিশ্বাস নিয়ে বসেছিলেন যে ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তানের উপর হামলা করে আমেরিকা ও চীন পাকিস্তানের পক্ষ গ্রহণ করবে।

যাক, এসব অনেক পরের কথা। আমি জুলাই মাসে ফিরে যাচ্ছি। নিউইয়র্ক থেকে আমরা দু'দিনের জন্য ওয়াশিংটন চলে আসি। এখানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন আগা হেলালী, আগা শাহীর বড় ভাই। তিনি অনেক দিন পূর্ব পাকিস্তানে চাকূরী করেছেন। এ দেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ছিলেন। সংকটের কোন সমাধানের কথা তিনি বলতে পারলেন না। শুধু আশা প্রকাশ করলেন যে পূর্ব পাকিস্তানবাসী মুসলমান বুঝতে পারবে যে এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের দ্বারা তারা নিজেদের সর্বনাশ করবে।

বিদেশেও যে আমাদের মধ্যে কোনো সংযম বোধ ছিলো না তার একটি প্রমাণ নিউইয়র্কে পেয়েছিলাম। প্রেস কাউন্সিলারের যে লাঞ্চের কথা বলেছি সেখানে বিদেশীরা স্বভাবতই আমাদের নানা প্রশ্ন করছিলেন এবং আমরা যথাসম্ভব তার জবাব দেবার চেষ্টা করছিলাম। আমার ঠিক মনে নেই, একটি প্রশ্নের জবাব ডক্টর কাজী দীন মোহাম্মদ দিতে উদ্যত হলে জাস্টিস নূরুল ইসলাম অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাঁকে থামিয়ে দেন। বলেন যে কথা তিনিই বলবেন। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যথিত বোধ করি। বিদেশীদের সামনে এই অসৌজন্যমুলক আচরণের কোনো যৌক্তিকতা ছিলো না এবং থাকতে পারে না। হাইকোর্টের একজন জাস্টিস ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষকের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করবেন স্বচক্ষে এই ঘটনা না দেখলে আমার পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন হতো। নতুন করে অনুভব করলাম যে আমাদের মধ্যে সংযমবোধ এবং সহিষ্ণুতা কোনোটাই নেই। যে সমস্ত কারণে গৃহযুদ্ধের এ বিস্ফোরণ ঘটে, এটা তারই একটি। সামান্য ঘটনাকে বাঙালী মুসলমান ফুলিয়ে- ফাঁপিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগে পরিণত করতো। কোন কিছুই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারতো না। ভাবখানা এই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজন নয় দুনিয়াশুদ্ধ লোকজন বাঙালীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আওয়ামী লীগের লোকেরা আগাগোড়াই আমাদের বুঝিয়েছে যে ষড়যন্ত্রের কারণেই আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। সি এস এস পরীক্ষায় আমাদের ছেলেরা ভালো না করতে পারলেও বলা হতো এটা ষড়যন্ত্রের ফল। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চল কতটা অনগ্রসর ছিলো সেকথা কয়েক মাসের মধ্যে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। ঢাকার সঙ্গে লাহোর- করাচীর তুলনা করে আক্ষেপ করেছি যে ঢাকার অনুন্নত

অবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা এবং গাফলতি দায়ী। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই প্রতিবাদকারীকে করাচী বা ইসলামাবাদের দালাল বলা হতো।

আগা হেলালীর বাড়ীতে একদিন লাঞ্চে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেদিন বাইরের কোন লোক উপস্থিত ছিলো না। আমরা নিজেদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সংকট নিয়ে আলোচনা করি এবং যদ্দুর মনে পড়ে আমরা সবাই এই মত প্রকাশ করি যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে জোরালো প্রচারণা হচ্ছে তার মোকাবেলা করতে সমর্থ না হলে কুটনীতির ক্ষেত্রে পাকিস্তান আরো অসহায় হয়ে পড়বে। এখানেও শুনলাম অমেরিকার কাগজপত্রে পাকিস্তানের কোন বিবৃতি ছাপা হয় না। ছাপা হয় শুধু শত্রুপক্ষীয় প্রচারণা। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ২৫শে মার্চ যে হত্যাকান্ড ঘটে তাকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হয় যে পাকিস্তান আর্মি কয়েকশ' বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এর প্রতিবাদ পাকিস্তান অনেক বিলম্বে করে। কিন্তু ততদিনে আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, পাকিস্তান আর্মি এমন এক নির্মমতার অনুষ্ঠান করেছে যার তুলনা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে নেই। ফলে আমেরিকার জনমত শুধু পাকিস্তান বিরোধীই হয়ে ওঠে না নিক্সন সরকারকে পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ করতে বাধ্য করে। অর্থাৎ এটা পরিস্কার হয়ে উঠেছিলো যে রণক্ষেত্রের চেয়ে কূটনীতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের পরাজয় হচ্ছে বেশী।

বিবিসি

ওয়াশিংটনের পর আমরা আর কোথাও যাইনি। নিউইয়র্ক হয়ে সোজা লন্ডন চলে আসি। এখানে হাইকমিশনার সালমান আলীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমার এবং মোহর আলীর নামে টাইমস পত্রিকায় ৭ই জুলাই প্রকাশিত চিঠিটি দেখতে পেলাম। এ ঘটনার উল্লেখ আগেই করেছি। আমরা হাইকমিশনারকে জানিয়ে দিলাম যে আর কোনো এনগেজমেন্ট আমরা গ্রহণ করবো না। আমাদের অবিলম্বে ফেরা দরকার। এবার আমাদের রাখা হয়েছিলো অন্য এক হোটেলে। আমরা রিসেপশনকে বলে দিয়েছিলাম যে কোনো টেলিফোন কলেরও আমরা জবাব দেবো না। তবুও একদিন আমাদের দেশে রওনা হবার কয়েক ঘণ্টা আগে ফোন বেজে উঠলো। বিবিসির বাংলা সার্ভিসের এক হিন্দু কর্মকর্তা কথা বলছিলেন। আমাকে বললেন যে আমাদের বিবৃতি তিনি দেখেছেন এবং এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে কিছু প্রশ্ন করতে চান। আমি বললাম আমি কয়েক ঘন্টার মধ্যে দেশে রওয়ানা হচ্ছি, এখন ইন্টারভিউ দেয়ার সময় আমার হাতে নেই। কর্মকর্তাটি জিদ করে বললেন, আমার ফ্লাইট নম্বর জানিয়ে দিলে তিনি

হিথ্রো বিমান বন্দরে আমার সঙ্গে আলাপ করবেন। কারণ তিনি বললেন আমি বাঙালী হয়ে গৃহযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করছি কেনো সেটা তাঁর বুঝা দরকার। জবাবে আমি বলেছিলাম যে আমার বক্তব্য টাইমস-এ প্রকাশিত চিঠিটিতে তিনি পেতে পারেন। এর অধিক আমার বলার নেই। তাছাড়া ফ্লাইট নম্বর বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আমাদের টিকেটগুলো ছিলো পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসে।

খুব সম্ভব ১০ই জুলাই লন্ডন থেকে করাচী এসে পৌঁছুই। একবার মনে হয়েছিলো ইসলামাবাদে যেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু তাতে আরো তিন চার দিন সময় লাগতো। এদিকে ঢাকা থেকে যে সমস্ত উদ্বেগজনক খবর পাচ্ছিলাম তাতে মনে হলো আর কালক্ষেপণ না করে অবিলম্বে ঢাকায় ফেরত আসা উচিত।

ঢাকায় নিয়োগ

ঢাকায় এসে স্থির করেছিলাম যে কয়েকদিন বিশ্রামের পর রাজশাহীতে ফিরে যাবো। কিন্তু সে আর হলো না। কারণ এর মধ্যে সরকারের নির্দেশ পেলাম যে আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর নিযুক্ত করা হয়েছে। গভর্নরের আদেশ। তবুও আমি আপত্তি করে বললাম যে জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী যদি আনুষ্ঠানিকভাবে এ পদে ইস্তফা না দিয়ে থাকেন তবে আমার পক্ষে এ কার্যভার গ্রহণ করা অনুচিত হবে। সরকার আমাকে জানালেন যে ১৫ই মার্চ থেকে আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগ করেছেন। সুতরাং আইনত ভাইস চান্সেলরের পদটি শূণ্য। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে আমি কার্যভার গ্রহণ করতে রাজী হই। পরে মিঃ চৌধুরীর পদত্যাগ পত্রের কপিও আমাকে দেখানো হয়। মজার কথা এই যে পাকিস্তানের পতনের পর মিঃ চৌধুরী আবার এসে এই পদ দখল করেন এবং তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন।

ইউনিভার্সিটিতে সে সময় ছাত্র নেই বললেই চলে। শিক্ষকরাও ক্লাস নিতে ভয় পেতেন। আর্টস বিল্ডিং-এ দু'একবার বোমা ফাটিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সমাজকে আরো আতঙ্কিত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সরকারী নির্দেশ ছিলো যে ক্লাস খোলা রাখতে হবে।

আমার নিজের ডিপার্টমেন্ট-এ কোনো প্রধান ছিলো না। ডক্টর খান সারওয়ার মোর্শেদ ইন্ডিয়া চলে গিয়েছিলেন। রিডার সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে

ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ভার গ্রহণ করার অনুরোধ করলে সে অব্যাহতি চাইলো। তখন মিঃ আবদুল মোনেমকে সাময়িকভাবে ডিপার্টমেন্টের চার্জে বসানো হয়।

একদিন অধ্যাপকদের আমার অফিসে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, দেশে যে সংকট দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁদের করণীয় বা বক্তব্য কিছু আছে কিনা। কারণ যে আত্মঘাতী সংগ্রামে আমরা লিপ্ত হয়েছিলাম তার পরিণাম যে অশুভ হবে সেটা সবাই জানেন। কিন্তু কেউ মুখ খুলে স্পষ্টভাবে কোন কথা বললেন না। আমি জানতাম যে এঁদের মধ্যে অনেকের সহানুভূতি অন্য দিকে কিন্তু তবুও মনে করেছিলাম যে দেশকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলবেন। অবশ্য তাঁদের ভয়ের কারণও ছিলো। কারণ যাঁরাই পুরাপুরি বিরোধীদের সমর্থন করেননি তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন কোলকাতার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হতো। আমার বিরুদ্ধেও। একদিন এক চিঠি পেলাম। তাতে লেখা ছিলো যে মুক্তিযোদ্ধারা স্থির করেছে যে আমার অফিসেই আমাকে হত্যা করবে। এ পর্যন্ত আমি আমার নাজিমুদ্দিন রোডের বাসা থেকে অফিস করতাম। সরকার জানালেন আমাকে পাহারা দেয়ার জন্য তাঁরা এক দল সৈন্য পাঠাবেন। কিন্তু আমার ছোট বাসায় তাদের রাখবো কোথায়? বাধ্য হয়েই ভাইস চান্সেলরের সরকারী ভবনে যেতে হলো। আমার বেশ কিছু বইপত্র এবং তৈজসপত্র নিয়ে গেলাম।

টিক্কা খান

একদিন জেনারেল টিক্কা খান আমাকে ডেকে পাঠালেন, এই প্রথম জেনারেল টিক্কা খানের সাথে আমার পরিচয়। তাঁর সম্বন্ধে আগে অনেক আজগুবি কাহিনী শুনেছিলাম। এপ্রিল মাসেই আমার বড় মেয়ের শ্বশুর আমাকে বলেছিলেন যে টিক্কা খান খান নিজেকে সামরিক নির্মমতার জন্য প্রস্তুত রাখতে এতটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তিনি জেনারেল আইয়ুব খানের অনুরোধেও বিয়ে করতে রাজী হননি। কারণ তিনি নাকি মনে করতেন যে সন্তান- সন্ততি হলে মানুষের মন কোমল হয়ে পড়ে।

এই প্রচারণা ছিলো সর্বৈব মিথ্যা। গভর্নমেন্ট হাউজেই টিক্কা খানের ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। শুনলাম তার কয়েকজন ভাই বোন আছে। তখন অবাক হয়ে ভাবলাম আমার মেয়ের শ্বশুর মিঃ আনসারী একজন উঁচু পদের পুলিশ অফিসার হয়েও কিভাবে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যে টিক্কা খানের মধ্যে মানবতার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আমি টিক্কা খানের ২৫ শে মার্চ তারিখের সামরিক

অভিযানের সমর্থনের কথা বলছি না, তার নিন্দা বহুবার করেছি, কিন্তু টিক্কা খানকে দানব হিসাবে চিত্রিত করে যে ভয়াবহ আতংক সৃষ্টি করা হয়েছিলো সেটা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রচারণার ফল।

টিক্কা খান আমাকে বললেন যে তিনি স্থির করেছেন যে ইউনিভার্সিটির যে সমস্ত শিক্ষক ইন্ডিয়া পালিয়ে গেছেন অথবা দেশে বসে বিদ্রোহীদের সমর্থন করছেন তিনি তাদের বরখাস্ত করবেন। এদের নামের লিস্ট যেনো আমি তৈরী করে দিই। আমি বললাম যে, যে অভিযোগের কথা তিনি বলেছেন তার সত্যতা প্রমাণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ সমস্ত খবর তিনি গোয়েন্দা বিভাগ থেকে পেতে পারেন। তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় কোন শিক্ষককে বরখাস্ত করলে তার প্রতিক্রিয়া অশুভ হবে বলে আমার বিশ্বাস। চান্সেলর হিসেবে অনেক কিছু করার ক্ষমতা গভর্নরের আছে। এর মধ্যে ভাইস চান্সেলর হিসাবে আমি জড়িত হতে চাই না। মনে হলো আমার কথার মর্ম তিনি কিছুটা উপলব্ধি করলেন।

এর কিছুদিন পর চান্সেলরের এক হুকুমনামা আমাদের হাতে এসে পৌছালো। তার মধ্যে দু'রকম হুকুম ছিলো। কয়েকজন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয় এবং কয়েকজনকে তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়। চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন, ইসলামী হিস্ট্রি এ্যান্ড কালচার ডিপার্টমন্টের প্রফেসর এ বি এম হবিবুল্লাহ এবং যাঁদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছিলো তাদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী। সবগুলো নাম আমার মনে নেই বলে উল্লেখ করতে পারছি না। যদ্দুর মনে পড়ে মিসেস নীলিমা ইব্রাহিমকে হয় বরখাস্ত করা হয়েছিল কিংবা হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছিলো।

আমি মহা সমস্যায় পড়লাম। চান্সেলরের এই আদেশ আমার নামে উল্লিখিত শিক্ষকদের পৌঁছে দিতে গেলে তাঁরা অবশ্যই মনে করবেন যে এই অর্ডারটি জারী করা হয়েছে আমার পরামর্শে। আমি প্রফেসর নাজমুল করিমকে ডেকে তাঁর পরামর্শ চাইলাম। তিনি বললেন এর মধ্যে আপনার করার কিছুই নেই। আপনি চান্সেলরের আদেশ অমান্য করতে পারেন না। অর্ডারের কপি শিক্ষকদের কাছে পৌছে দিন। তাই করা হয়।

আমার মনে আছে সাক্ষাৎকারের সময় আমি টিক্কা খানকে বিশেষ অনুরোধ করি তিনি যেনো সৈয়দ আলী আহসানের ছোট ভাই সৈয়দ আলী তকীকে ঢাকা জেল থেকে ছেড়ে দেন। এই ছেলেটি বাংলায় এম এ পাস করে ময়মনসিংহের এক কলেজে চাকরী নিয়েছিলো। কিভাবে যে পঁচিশে মার্চের গন্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলো আমরা জানিনা। কিন্তু শুনেছিলাম যে আর্মি

তাকে এমনভাবে মারধর করে যে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ঐ অবস্থায় তাঁকে ঢাকা জেলে আটক রাখা হয়। ছেলেটিকে আশৈশব চিনতাম বলে আমি জোর করে বলতে পেরেছিলাম যে তার মতো নিরীহ নিরুপদ্রব ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্র বিরোধী কর্মে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব বলে আমার মনে হয়। গভর্নর তাঁর নোট বই- এ তার নাম টুকে রাখলেন এবং বললেন যে এ সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করে দেখবেন। শেষ পর্যন্ত ১৬ই ডিসেম্বরের আগে আলী তকী রেহাই পায়নি। ১৬ই ডিসেম্বরের পর যখন বাংলাদেশের সব জেলের দরোজা খুলে দেয়া হয় তখন সবার সাথে সেও বেরিয়ে পড়ে।

কারদার

একদিন খবর পেলাম পাকিস্তানের বিখ্যাত ক্রিকেটার আব্দুল হাফিজ কারদার ঢাকায় এসেছেন। তিনি তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। কারদারের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। তিনি এক সময় পূর্ব পাবিস্তানে পাটের ব্যবসা করতেন। তখন তাঁর বাসায় দাওয়াতও খেয়েছি। এর আগে বা পরে ১৯৬২ সালে নয়াদিল্লীতে পক্ষকাল ব্যাপী যে 'কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মেলন' হয়েছিলো সেখানেও কারদারকে দেখেছি। তিনি খবর পাঠালেন যে আমার সঙ্গে কোন এক জরুরী ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তাঁকে ইউনিভার্সিটি এলাকায় আসতে বলা বিপজ্জনক হতে পারে মনে করে আমি নিজেই ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে গেলাম। কারদার পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন এ সম্পর্কে আপনার পরামর্শ চাই। পড়ে দেখি এটি ডক্টর আহমদ শরীফের একটি আবেদনপত্র। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে আর্মি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এই ভয়ে তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন। আবেদনপত্রে জানিয়েছিলেন যে, তিনি তো দেশদ্রোহী নন বরঞ্চ ইসলাম সম্পর্কে সারা জীবন তিনি গবেষণা করেছেন এবং অনেকগুলো প্রকাশিত প্রবন্ধ বা রচনার নামও আবেদন পত্রে ছিলো। কারদার জানতে চাইলেন ডক্টর আহমদ শরীফ সত্যি সত্যি ইসলাম ভক্ত কিনা। এর জবাব দিতে যেয়ে মুশকিলে পড়লাম। আহমদ শরীফ পুঁথি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং তাঁর রচিত পুঁথি ক্যাটালগ- এর ইংরেজী তরজমা আমিই করেছিলাম। সেখানে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলাম যে পুঁথি সম্বন্ধে ডক্টর আহমদ শরীফের চাইতে বেশী জ্ঞান আর কেউ রাখেন না বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক কি? ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিলো বলে আমার জানা ছিলো না। অবশ্য বাংলাদেশ পরবর্তী কালে ইসলাম সম্পর্কে যে

সমস্ত উক্তি তিনি করেছেন বলে শুনেছি সে রকম কোনো কথা পাকিস্তান আমলে তিনি বলতেন না। কিন্তু দেশের এ সংকট মুহূর্তে তাঁর ধর্মীয় মতামত নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য সরকারী কর্মচারীকে জানাতে গেলে তাঁর সমুহ বিপদ ঘটবে এই মনে করে আমি কারদারকে বলেছিলাম যে ইসলাম সম্পর্কে কে কখন কি বলেছে তা যাচাই করে যদি সেটিকে দেশপ্রেমের মাপকাঠি করা হয় তা হলে বহু লোকই বিপদে পড়বে। এ রকমের বাড়াবাড়ি করা মোটেই উচিত হবে না। শুনেছি পরে তাঁকে আর খোজাখুজি করা হয়নি।

কারদার প্রস্তাব করেন যে তিনি শিক্ষকদের এক সভায় বক্তৃতা করবেন। আমি তাঁকে নিরস্ত করলাম এই বলে যে, প্রথমত অনেক শিক্ষক এ রকম সভায় হাজির হবেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী বলে তাঁর কথার কদর্থ করা হতে পারে। তাতে অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে। আর একটা কথা মনে আছে আমার। কারদার এক পর্যায়ে আমাকে বললেন যে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সংকটের মূল কারণ এই যে, স্কুল- কলেজে শিক্ষকদের আশি- নব্বই ভাগই হিন্দু। পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণা করে মুসলিম তরুণদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আমি জবাবে বলেছিলাম যে তার এই হিসাব মোটেই ঠিক নয়। '৪৭ সালের আগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকের প্রাধান্য ছিলে, এ কথা সত্য। কিন্তু এই শ্রেণীর হিন্দুরা অনেকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিম বাংলা বা আসামে চলে যায় এবং এ শূন্যতা পূরণ হয় মুসলমান শিক্ষক দিয়ে। ঠিক তেমনি ১৯৪৭- ৪৮ পর্যন্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন হিন্দু। আমি যখন ১৯৩৮ সালে ফার্স্ট ইয়ারে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হই তখন আর্টস বা কলা- ফ্যাকালটিতে আরবী এবং উর্দু- ফার্সি ডিপার্টমেন্টকে বাদ দিলে মুসলমান শিক্ষক ছিলেন মাত্র ৩ জন। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ডক্টর মাহমুদ হাসান, বাংলার ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ইতিহাসের ডক্টর মাহমুদ হোসেন। আমার যদ্দুর মনে পড়ে এই বছরই মাজহারুল হক জুনিয়র লেকচারার হিসাবে ইকনমিকস ডিপার্টমেন্টে যোগ দেন। এবং অনুরূপ পদ নিয়ে আব্দুর রাজ্জাক (বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক) পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে নিযুক্ত হন। সায়েন্স বিভাগগুলোতে একমাত্র মুসলমান শিক্ষক ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কিছু কিছু হিন্দু শিক্ষক ঢাকা ছেড়ে চলে যান। আর ১৯৫০ সালে যখন কোলকাতা এবং ঢাকায় নতুন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায় তখন রাতারাতি প্রায় সব হিন্দু শিক্ষক কোলকাতা চলে যান। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি যখন শিক্ষক হিসাবে ইংলিশ

ডিপার্টমেন্টে যোগ দিয়েছি তখনও আমার নিজের পুরোনো শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে মিস চারুপমা বোস ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। আরো দুই জন নতুন হিন্দু শিক্ষক আমি ছাত্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার পর এই ডিপার্টমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন। এরা হচ্ছেন ডক্টর এস এন রায় (আমার শিক্ষক পুরনো এস এন রায় নন) এবং অমিয় চক্রবর্তী। এরা সবাই '৫০সালের দাঙ্গার পর পদত্যাগ করে চলে যান। তখন ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন মিস এ জি স্টক। একদিন তার মুখে শুনলাম যে মিস চারুপমা বোস তার অসুস্থ পিতাকে দেখতে কোলকাতায় যাচ্ছেন। আমি বলেছিলাম তিনি হয়তো আর ফিরবেন না। মিস স্টক তো বিশ্বাসই করলেন না। কিন্তু সত্যই মিস বোস আর ফিরলেন না। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই। এ অবস্থায় ইউনিভার্সিটি চালু রাখা বেশ মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এই যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো এটা পূরণ করতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। ১৯৪৯ সাল থেকেই কিছু কিছু করে নতুন মুসলমান শিক্ষককে বিলাতে পাঠানো হয়। আবদুর রাজ্জাক সাহেব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সাথে সাথে ১৯৪৫ সালে কার্গো জাহাজে লন্ডন যান। ১৯৪৯ সালে আর্টস এবং 'ল' ফ্যাকালটি থেকে যে চারজন শিক্ষক বিলাত যাত্রা করেন তারা হচ্ছেন 'ল' ডিপাটর্মেন্টের শফিউল্লাহ এবং ইংরেজী ডিপার্টমেন্টের সৈয়দ আলী আশরাফ। আমি এবং বাংলার আবদুল হাই বিলাত যাই ১৯৫০ সালে। তখন বিভিন্ন বিভাগ থেকে আরো অনেক শিক্ষককে বিলাত পাঠানো হয়েছিলো। '৫১-৫২ সালে এসব শিক্ষক উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসতে শুরু করলে অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে।

মোদ্দা কথা, শিক্ষায়তনে হিন্দু প্রাধান্যের কারণে ১৯৭১ সালে বিস্ফোরণ ঘটেছিলো বলে কারদার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মনে যে ধারণা ছিল সেটা সত্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে এঁরা যে বিশেষ খবর রাখতেন না এই ধারণা তার অন্যতম প্রমাণ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারণা হয়েছিলো এবং হচ্ছিল সে কথা মোটেই অসত্য নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা এ জন্য অনেকখানি দায়ী। পাকিস্তানের ইতিহাস এবং পটভূমিকা আমরা তরুণদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারিনি এবং অনেকটা মনে করতাম এ রকম ব্যাখ্যার আর বিশেষ প্রয়োজন ছিলো না। এটা যে কত বড় ভুল সে কথা ৬৯- ৭০ সালে ভালো করে টের পাই। সে সময় বিলম্বে হলেও পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস সম্বলিত একটি পাঠ্য পুস্তক চালু করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তখন পাকিস্তান বিরোধীরা ছাত্র সমাজকে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলছে যে পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি

নামক এই বইটির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ ছিলো এক আশ্চর্য ঘটনা। দেশের ইতিহাস জানতে চাইবো না এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীর আর কোথাও এ ধরনের আন্দোলন হয়েছে বলে আমার জানা নেই। শেষ পর্যন্ত প্রবল চাপের মুখে ইয়াহিয়া সরকার বইটি প্রত্যাহার করে নেন। আমি কারদারকে বলি যে হিন্দু শিক্ষকদের প্রাধান্যের কারণে নয় আমাদের নিজেদের গাফলতির কারণে বর্তমান সংকটের উদ্ভব হয়েছে। যে তরুণেরা পাকিস্তান ধ্বংস করার উন্মত্তায় মেতে উঠেছিলো তাদের জানাই ছিলো না কেনো আমরা বর্ণ হিন্দু কবলিত ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছি।

জুলাই মাস থেকে পূর্ব বঙ্গে বর্ষাকাল শুরু হয় এবং প্রায় সারা অঞ্চলই বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায়। একাত্তর সালেও এ রকম ঘটেছিলো। তখন বিদেশী পত্র- পত্রিকায় প্রায়ই মন্তব্য করা হতো যে পাকিস্তান আর্মি জেনারেল রেইনের কাছে অথবা জেনারেল বর্ষার কাছে হার মানতে বাধ্য হবে। পাঞ্জাবী সৈন্যরা সাঁতার জানে না। তার উপর আর্মির হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নৌযান ছিলো না যা দিয়ে সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সৈন্য সরানো যায় কিন্তু কার্যতঃ এ আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণিত হয়। অবশ্য দু'একটি ঘটনায় গেরিলারা সৈন্যবাহী নৌযান ডুবিয়ে দিতে পারলেও সামরিকভারে যুদ্ধ পরিচালনায় তারা কোন সংকট সৃষ্টি করতে পারেনি। শুনতাম যে এর ফলে বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে হতাশার সঞ্চার হয়েছিলো।

গেরিলা আক্রমণে চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দরের কর্মকান্ড কিছুটা ব্যহত হয়েছিল। খাদ্যবাহী জাহাজ দু'একটি ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো এভাবে দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করা দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে অবশ্যম্ভাবী রূপে গণ অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু যুদ্ধের নয় মাস কোনো এলাকায়ই খাদ্যের ঘটতি হয়নি।

নয় মাস যুদ্ধের সময় কয়েকবার আমার পুরোনো ছাত্র যারা বিদেশী দূতাবাসে কাজ করতো তারা চিঠি লিখে জানতে চাইতো দেশের অবস্থার কথা। এ রকম দুটো চিঠির কথা আমার বেশ মনে আছে। একটা আসে কায়রো থেকে এবং অন্যটি বৈরুত থেকে। এ সব চিঠির জবাব খুব সতর্কতার সঙ্গে দিতে হয়েছে। কারণ বাঙালী কূটনীতিক প্রায় প্রতিমাসেই শেখ মুজিবের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে কে পাকিস্তানের সমর্থক এবং কে সমর্থক নয় তা ঠাহর করা দুষ্কর ছিল। খোলা মন নিয়ে এদের কিছু বললে সে চিঠির অপব্যবহারের আশংকা ছিলো। তাই এসব চিঠিতে খুব

সংযত ভাষা ব্যবহার করতে চেষ্টা করতাম। আমার আশংকা যে অমূলক ছিলো না তার প্রমাণ একাত্তরের শেষ দিকে পেয়েছিলাম। যে দু'জন কূটনীতিকের উল্লেখ করলাম তারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং এখনো সরকারী চাকুরীতে বহাল রয়েছে।

আর্মির বহু বাঙালী অফিসার এবং জওয়ান যারা পূর্ব পাকিস্তানে কার্যরত ছিলো তারাও বিদ্রোহ করে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেয়। এরা কিন্তু সবাই পবিত্র কোরআন শরীফের উপর হাত রেখে পাকিস্তানের প্রতি অনুগত থাকবে বলে হলফ নিয়েছিলো। যে সমস্ত বাঙালী অফিসার পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন তারা ক্রমান্বয়ে সরকারের আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং তাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিলো। এদের মধ্যে আমার বড় জামাতা মেজর ওয়ালী আহমদও ছিলো। এসব অফিসারের মধ্যে সবাই যে পাকিস্তানের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে তা নয় কিন্তু তাদের সহকর্মীদের আচরণের কারণে সবাইকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এই শ্রেণীর অফিসারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর এস আলম। ১৯৬৫ সালের পাকভারত যুদ্ধে তিনি বহু ইন্ডিয়ান বিমান ধ্বংস করে কৃতিত্ব লাভ করেন এবং একাত্তর সালে পাকিস্তানের প্রতি তাঁর আনুগত্যে কোনো ফাটল ধরা পড়েনি। শুনেছি যে একাত্তরের পর তিনি পাকিস্তানে থেকে যান।

আরেকজন এ রকম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কবির চৌধুরীর ভাই আর্মি অফিসার কাইয়ুম চৌধুরী পাকিস্তানের প্রতি তার আনুগত্যে পরিবর্তন করেননি। আমার যদ্দুর জানা আছে তিনি এখনো পাকিস্তানে বাস করছেন। বেসামরিক দপ্তরে যে সমস্ত বাঙালী কর্মচারী কর্মরত ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ আফগানিস্তান হয়ে পালিয়ে আসে, সে কথা আগে উল্লেখ করেছি। কিন্তু আবার বহু অফিসার শেষ পর্যন্ত আনুগত্যের সঙ্গে পাবিস্তানে কর্যরত ছিলেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমার শিক্ষা জীবনের বন্ধু মুহম্মদ হোসেন। আমরা একই বছর ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এম এ পাস করি। একাত্তর সালে মুহম্মদ হোসেন খুব সম্ভবত সরকারের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতো। জুলাই মাসে যখন সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একটি পদ খালি হয় সে আমাকে জানিয়ে ছিলো যে দরখাস্ত করলে অতি সহজেই আমি এই চাকুরীটি পেতে পারি; কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খোঁজে অন্য কোথায়ও যাওয়ার ইচ্ছা আমার ছিলো না। আমি বললাম যে এখানে থেকেই আমার কর্তব্য পালন করা প্রয়োজন। যদি অদৃষ্টে মৃত্যু থাকে সেটা যেনো মাটিতেই হয়।

আগস্ট মাসে নির্দেশ এলো আমরা যেনো স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি। পাকিস্তান আমলে প্রতিবছরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৪ই আগস্ট উদযাপিত হতো। তবে এবার এ উদযাপনের বিশেষ তাৎপর্য ছিলো। টিএসসি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রদের সভা হয়। দু'-এক জন শিক্ষক বক্তৃতা করলেন। সভাপতির অভিভাষণে আমি বললাম যে স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এবং আমি আশা করি দলমত নির্বিশেষে সকলেই দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে সচেষ্ট হবেন। আমি জানতাম আমার প্রতিটি বাক্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হতে পারে সে জন্যে ইচ্ছা করেই দেশের গৃহযুদ্ধের উল্লেখ করিনি। শুধু সাধারণভাবে স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলেছিলাম। আশ্চর্যের কথা ১৯৭২- ৭৩ সালে যখন আমরা কলাবরেটর আইনে আটকা পড়ি, আমার কার্যাবলী সম্পর্কে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের জনৈক শিক্ষক পুরিশের কাছে অভিযোগ করে যে, সে স্পষ্টভাবে শুনেছে যে আমি সবাইকে আর্মির সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলেছি। সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের এক হিন্দু শিক্ষক যিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তিনিও এই অভিযোগ সমর্থন করেন। ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই ছিলো না। তবুও মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলাম এই ভেবে যে ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা কিভাবে এ রকমের মিথ্যা কথা বলতে পারলেন। আমি পাকিস্তান আদর্শবাদে বিশ্বাস করতাম এটা কোনো গোপন কথা নয়। ছাত্র জীবন থেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম। '৪০ সাল থেকে ঢাকা এবং কোলকাতার বহু পত্রিকায় এই সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখেছি এবং এই সূত্রে যে তরুণ সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছিলো, আমি নিজেকে তাদেরই অন্যতম মনে করতাম। আমারই চোখের সামনে আমাদের সেই বাস্তবায়িত স্বপ্ন ধূলিস্যাত হয়ে যাবে এটা আমরা কামনা করতে পারি সে তো ছিলো অসম্ভব। কিন্তু '৭১ সালে ১৪ই আগস্টের অনুষ্ঠানে আমি পরিষ্কারভাবে আর্মির পক্ষে ওকালতি করেছিলাম এই অভিযোগ ছিলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ রকম আরো অভিযোগ আমাকে শুনতে হয়েছে যার মূলে লেশমাত্র সত্য নেই।

গভর্নর মালেক

সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে তাদের নীতি পরিবর্তন করেন। টিক্কাখান- এর বদলে নিয়াজী ইষ্ট পাকিস্তান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন। ডঃ মালেককে গভর্নর নিয়োগ করা হয়। টিক্কা খানের নিয়োগ নিয়ে

ইষ্ট পাকিস্তানের চিফ জাস্টিস বি, এ, সিদ্দিকী মার্চ মাসে যে সমস্যার সৃষ্টি করেন, ডক্টর মালেককে নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। অনেকেরই হয়তো মনে আছে যে জনাব সিদ্দিকী এই বলে আপত্তি করেন যে কসাই বলে পরিচিত এই ব্যক্তিটির শপথ তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না। দেশে নিয়ম- শৃংখলা কতটা ভেঙ্গে পড়েছিলো, এই ঘটনা ছিলো তারই একটি নমুনা। ডক্টর মালেককে আগে থেকে চিনতাম। তিনি একদিন ফোন করে বললেন যে, তিনি ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলতে চান। এ রকম একটি সভা আয়োজন করা সম্ভব হবে কি? আমি বললাম যে, আনুষ্ঠানিক সভায় তিনি মত বিনিময় করতে পারবেন না। কারণ পরিবেশ তার অনুকূলে নয়। বরঞ্চ তিনি রাজী হলে আমার বাসায় চা চক্রে কয়েকজন শিক্ষককে আমি আমন্ত্রণ করতে পারি। গভর্নর মালেক আমার এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন।

এই চা চক্রের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ এবং হলগুলির প্রভোস্টদের ডেকেছিলাম। কয়েকজন এডমিনিসট্রেটিভ অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর মালেক সবাইকে বললেন আপনারা মন খুলে আমার সাথে কথা বলতে পারেন। যদ্দুর মনে পড়ে প্রথম মুখ খুললেন মিসেস আখতার ইমাম। তিনি ছিলেন মেয়েদের হলের প্রভোস্ট এবং দর্শন বিভাগের শিক্ষয়িত্রী। তিনি নিরাপত্তার কথা তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আর্মি যেভাবে লোকজনকে গ্রেফতার করছে তাতে লোকের মনে এক আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। ডক্টর মালেক বললেন যে, তাঁকে নিয়োগ করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এ অঞ্চলের লোকজনকে এ আশ্বাস দেয়া যে, পূর্ব পাকিস্তানের শাসনের দায়িত্ব এ অঞ্চলের লোকের উপর ন্যস্ত। তারপর তিনি যে কথা বললেন সেটা ছিলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্রোহীরা যেভাবে ধ্বংসাত্মক কার্য চালিয়ে যাচ্ছিল তার উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তুললেন যে, এরা যদি সত্যিই দেশ প্রেমিক হয়ে থাকে তাহলে দেশকে এভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে কেনো? যদি বিদ্রোহী বাহিনী জয়লাভ করে, দেশের শাসনভার তাদেরই নিতে হবে। দেশটার সর্বনাশ করে তারা কোন ধরণের স্বাধীনতা অর্জন করবে? গত বিশ বাইশ বছরে এই অনুন্নত অঞ্চলে রাস্তাঘাট- পুল, মিল, ফ্যাক্টরী, ইলেকট্রিসিটি, পাওয়ার হাউজ যা নির্মিত হয়েছে সব কিছুর উপরই হামলা চলেছে, ব্যাংক লুট হচ্ছে। ভাবখানা এই যে এ সমস্ত কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে আর্মি পরাজিত হবে। কিন্তু আর্মি পরাজিত হলেও দেশ তো আমাদেরই থাকবে। এগুলো আবার নতুন করে গড়বো কিভাবে?

ডক্টর মালেকের উক্তির যথার্থতা কেউ অস্বীকার করতে পারলেন না, কিন্তু এর জবাবও কেউ দিভে পারলেন না। আগেও দেখেছি এবং ডক্টর মালেকের উক্তি শুনে এই বিশ্বাসই জন্মায় যে পূর্ব পাকিস্তানে যে সংকট পতিত হয়েছে সেটা কোন সাধারণ গৃহযুদ্ধ নয়, কোনো অদৃশ্য অশুভ শক্তি এর পেছনে সক্রিয়। যেনো তেনো প্রকারে এ অঞ্চলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় যাতে অদূর ভবিষ্যতে এরা মাথা তুলবার শক্তি না পায়।

একদিন ভোর রাত্রির দিকে মিসেস আখতার ইমাম ফোন করে জানালেন যে মেয়েদের হলে ডাকাতি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। ভোরের দিকে যখন পুলিশ অফিসাররা আসেন আমিও তাঁদের সাথে হলে গেলাম। মিসেস ইমামের বাসা থেকে রেডিও এবং অলংকারাদি খোয়া গিয়েছিলো। মেয়েদের টাকা- পয়সা ও জিনিসপত্র হারিয়েছিলো। তারাও তাদের অভিযোগের কথা বর্ণনা করলো। মিসেস ইমাম বললেন যে, যে দল ডাকাতি করতে এসেছিলো তারা নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তারা ছিলো আসলে অশিক্ষিত ও ঢাকাইয়া গুন্ডা। তারা নাকি ঢাকাইয়া বাংলায় মিসেস ইমামদের বলে, আমরা দেশের লাইগা লড়াই করতাছি। দ্যান, আপনাগো যা আছে আমাগো দ্যান। পুলিশ তদন্ত করে ডাকাতদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি এবং আমি যদ্দুর শুনেছি ডাকাতরা যে সমস্ত জিনিস লুট করে তার কোনো কিছুই উদ্ধার হয়নি।

তখন অনবরত এ রকম ঘটনা ঘটতো। দেশের চোর- ডাকাত, বদমাশ মুক্তিযুদ্ধের নাম করে শহরে গ্রামে গঞ্জে প্রায়ই ডাকাতি করতো এবং বলে বেড়াতো যে দেশ উদ্ধারের কাজে তারা নেমেছে। এ রকমের ঘটনা শুধু প্রাইভেট বাড়ীঘরে নয়, সরকারী অফিস আদালতে ব্যাংকে ট্রেজারীতে প্রায়ই হতো। একদিন দিনে দুপুরে টিএসসিতে অবস্থিত ব্যাংক থেকে কয়েক হাজার টাকা এভাবে লুট হয়ে যায়। দু'তিন জন ছোকরা নাকি মটর গাড়ী করে এসে পিস্তল দেখিয়ে এই ডাকাতি করে। টিএসসি'র ডিরেক্টর বেবি জামান আমাকে বললেন, স্যার এ ব্যাপারে আমরা কিছুই করতে পারবো না। পুলিশকে খবর দিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আমি আগেই বলেছি যে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র বিশেষ ছিলো না। তবে কিছু কিছু ছাত্র- ছাত্রী হলে ফিরে এসেছিলো এবং এরা ক্লাস করতে যেতো। যদিও প্রায় দিনই শুনতাম শিক্ষকের অনুপস্থিতি। কিন্তু কোনো কোনো শিক্ষক এর মধ্যে ক্লাস করেছেন। আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। জিন্নাহ বা মহসিন হল থেকে

একদল ছাত্র আমার সাথে দেখা করে। তাদের দাবী আমি যেন সরকার থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র আনিয়ে তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এ দিয়ে তারা বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করবে এবং যে সমস্ত ছাত্র আওয়ামী লীগ দলভুক্ত ছিলো তাদের শায়েস্তা করবে। আমি তাদের বলেছিলাম যে, ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে গুন্ডামীর অভিযোগ আমরা শুনেছি কিন্তু তার প্রত্যুত্তর গুন্ডামী দিয়ে করার ব্যবস্থা আমি করতে পারবো না। শিক্ষাঙ্গনে গুন্ডামী যদি অন্যায় হয়, তোমরা যদি সন্ত্রাসবাদের সমর্থন না করো তাহলে অন্য একটি দলকে মারপিট করে অন্য প্রকারে গুন্ডামীর কথা বলছো কিভাবে?

এতে ঐ ছাত্রদল আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়। পরের সপ্তাহে ঢাকা থেকে আজিজ আহমদ বিলিইয়ামিনী ইয়াং পাকিস্তান নামে যে ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করতেন তাতে বড় অক্ষরে এই অভিযোগ প্রকাশ করা হয় যে ভাইস চান্সেলর দেশ প্রেমিকদের সাহায্য করতে অস্বীকার করছেন। ঘটনাটি আমার কাছে তখনো খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে এবং এখনো হয়। আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতে অসমর্থ। যে কাজটি অপরে করলে চিৎকার করে প্রতিবাদ করি আমার দলের কোনো ব্যক্তি সেরকম ঘটনায় জড়িত হলে তার প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হই না। এদেশে বাক স্বাধীনতার অর্থ শুধু নিজের বা নিজের দলের স্বাধীনতা। বিপরীত কোনো মতবাদ কেউ প্রকাশ করলে তাকে কালপাত্র নির্বিশেষে দেশের শত্রু বলতে আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না।

১৯৭১ সালে অনেক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে যাকে কোলকাতা স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে দেশ প্রেমের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হতো। শুনেছি এক পরিবারের বাপ ছিলেন পাকিস্তান সমর্থক আর ছেলে যোগ দিয়েছিলো বিদ্রোহী বাহিনীতে। একরাত্রে এসে সে বর্শা দিয়ে বাপকে হত্যা করে। এবং পরদিন তারই প্রশংসা কোলকাতা থেকে প্রচারিত হয়। আর একটি ঘটনার কথা শুনেছি, সেটা ঐ রকমই লোমহর্ষক। ফরিদপুরের এক ব্যক্তি এক বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলো। তার শ্বশুর ছিলেন মুসলিম লীগের লোক। দেশে সে স্ত্রী এবং ছোট একটি মেয়েকে রেখে গিয়েছিলো। একদিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে চড়াও হয়। নিজ হাতে প্রথমে শ্বশুরকে হত্যা করে। পরে অনুরূপভাবে স্ত্রী ও কন্যাকেও খতম করে। এসব জঞ্জাল (?) থাকলে দেশ উদ্ধারের কাজে বাধার সৃষ্টি হবে এজন্য সে পথের কন্টক দূর করে দিয়েছিলো। তার বাবা-মা বেঁচেছিলেন কিনা জানি না, তবে আরো শুনেছি ঘরে এক বোন ছিলো তাকে টেনে নিয়ে তার সহকর্মী একহিন্দুর হাতে স্ত্রী হিসেবে সঁপে দেয়। সে

যে সত্যিকার অর্থে বাঙালী এবং কোনো রকমের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ মানে না দুনিয়ার সামনে সে কথা প্রমাণ করার প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে এই পন্থা অবলম্বন করে। এই হত্যাকারীকে পরে রাষ্ট্রীয় উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এই রকম ঘটনা আরো বহু হয়েছে। তার আর একটি উল্লেখ করছি। একরাত্রে একব্যক্তি এসে তার ভাইকে খুন করে। কারণ ভাই ছিল পাকিস্তানের সমর্থক। কিন্তু হত্যাকান্ড ঘটিয়ে পর মুহুর্তে সে এর লোমহর্ষকতা উপলব্ধি করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

এই যে শাশ্বত মুল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা, পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রী-পুত্র এদের কারো প্রতি কোন রকম মমতা বা আনুগত্য রাখা চলবে না- এ শিক্ষাই আওয়ামী লীঁগ থেকে প্রচার করা হচ্ছিলো। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিজ-এর এক নাটকের কথা মনে পড়ে। থীবস নগরে রাজা ক্লেয়ন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ছিলেন এটিওক্লিস নামে এক ব্যক্তি। তিনি দাবী করছিলেন যে থীবস-এর সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু তার ভাই পলিনাইসিস এ দাবী সমর্থন করেননি। তিনি ছিলেন ক্লেয়ন-এর পক্ষে। দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং দুই জনই মারা পড়েন। ক্লেয়ন ঘোষণা করেন যে পলিনাইসিসকে সসম্মানে সমাহিত করা হবে এবং এটিওক্লিস-এর শব কাক-শকুনকে বিলিয়ে দেওয়া হবে। রাজার এ ঘোষণার পর কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পেলো না। বিরুদ্ধাচরণ করলো ক্লেয়নের পুত্রের বাগদত্তা এন্টিগনি। সে ছিলো এটিওক্লিসের বোন। সে স্থির করলো যে রাজার আদেশ অমান্য করলে মৃত্যুদন্ড হবে সত্য কিন্তু ভাইয়ের প্রতি তার এমন একটি কর্তব্য রয়েছে যেখানে সে কোনো রাষ্ট্রের আদেশ মানতে বাধ্য নয়। মৃত ভ্রাতাকে সমাহিত করা তার কর্তব্য। কারণ এটা একটা চিরন্তন নীতি, যার বিরুদ্ধাচারণ করার ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রের থাকা উচিত নয়। মৃত্যু ভয় না করে এন্টিগনি এটিওক্লিসকে সমাহিত করে এবং পরে তার নিজের মৃত্যুদন্ড হয়।

সফোক্লিজ যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো যে সভ্যতার মূলে এমন কতগুলি চিরন্তন মূল্যবোধ থাকে যা লংঘন করতে গেলে মানুষ পশুরও অধম হয়ে যায়। অথচ '৭১ সালে বহুবার শুনেছি যে স্বাধীনতার স্বার্থে নাকি খুন ডাকাতি ব্যভিচার সবকিছুই বৈধ। পিতামাতা শিক্ষক কেউ বিপরীত মত অবলম্বন করলে তাকে খতম করে দেশ উদ্ধারের যে চেষ্টা এ সময় শুরু হয়েছিলো তার জের আমরা কখনো কাটাতে পারবো কিনা সন্দেহ।

অধ্যায় ৮

ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ

অক্টোবরের শেষে আমি আরেকবার পশ্চিম পাকিস্তানে যাই। এবার ইসলামাবাদে। ইসলামাবাদে কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ছিলাম রাওয়ালপিন্ডিতে ই পাকিস্তান হাউজে। সেখানে একদিন প্রফেসর গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরীর সাথে দেখা। তিনি এককালে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন এবং কিছুকাল ইয়াহিয়া খানের এডভাইজারও ছিলেন। তিনিও ই পাকিস্তান হাউজে থাকতেন। প্রফেসর চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার সাথে প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ হয়েছে কি? তিনি হয়তো আপনার মতো ব্যক্তির মুখে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা শুনতে পেলে উপকৃত হবেন। আমি বললাম আপনি যদি ব্যবস্থা করতে পারেন আমি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করতে পারি। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। পরদিন সরকারী গাড়ী এসে আমাকে প্রেসিডেন্টের বাসভবনে নিয়ে যায়। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আর কেউ ছিলেন না। মনে হলো তিনি আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে চান। আমি তাঁকে প্রথমেই বললাম, আমি একজন সাধারণ নাগরিক। আপনি অভয় দিলেই আমি খোলাখুলি কথা বলতে পারি। প্রেসিডেন্ট বললেন, আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনি মন খুলে কথা বলুন। আমি তাঁকে বলি যে আপনারা পাকিস্তান রক্ষার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আর্মি পূর্ব পাকিস্তানে কাউকে বিশ্বাস করে না। সেজন্য এখনো যারা পাকিস্তান আদর্শে বিশ্বাসী তারা ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়ছে। ২৫ শে মার্চ আর্মি যে ক্র্যাকডাউন করে তার মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির উপর হামলা করে কয়েকজন শিক্ষক হত্যার ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেটা কি আপনি জানেন? যাঁরা নিহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া আপনি নিজে দু'বার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। একবার ২৬শে মার্চ এবং দ্বিতীয়বার জুন মাসে। আমি অতি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে দু'বারের বক্তৃতায়ই পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত অধিবাসীর দেশ প্রেমের উপর কটাক্ষ করা হয়েছিলো। পূর্ব পাকিস্তানে এখনো যে লক্ষ লক্ষ লোক পাকিস্তানে বিশ্বাস করে সে কথা আপনার বক্তৃতায় উল্লেখ ছিলো না। তাদের সহযোগিতা আপনি কামনা করেননি; ঢালাওভাবে আওয়ামী লীগের নিন্দা করেছেন এমন ভাষায় যাতে অনেকের ধারণা হতে পারে যে পূর্ব পাকিস্তানবাসী সবাই আওয়ামী লীগের সমর্থক।

ইয়াহিয়া খান স্বীকার করলেন যে তাঁর ভুল হয়েছে। তাঁর অফিসাররা তাঁকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারেননি। তিনি বললেন পরবর্তী সময়ে আমি যখন বক্তৃতা করবো, আশা করি, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

বলাবাহুল্য যে এই সাহায্যের প্রয়োজন আর হয়নি। কারণ তার আগে ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটে। তবে আমি আমার কথাগুলি প্রেসিডেন্টকে বলতে পারায় স্বস্তি অনুভব করেছিলাম। কারণ আমি আগাগোড়া লক্ষ্য করছিলাম যে ২৫শে মার্চ যেমন তেমনি পরেও নির্বুদ্ধিতার কারণে আর্মি সাধারণ লোকজনকে পাকিস্তান বিরোধী করে তুলছিলো।

অক্টোবর থেকে নানা গুজব ছড়াতে থাকে। কলকাতাস্থিত স্বাধীন বাঙলা সরকারের প্রচারণাও আরো তী হয়ে উঠে। ঐ প্রচারণা যারা পরিচালনা করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আখতার মুকুল ও সৈয়দ আলী আহসান। আখতার মুকুল 'চরমপত্র' বলে একটা প্রোগ্রাম করতেন যাতে অন্যান্য কথার মধ্যে যারা তখনো বিদ্রোহে যোগদান করেনি তাদের বিরুদ্ধে হুমকি দেয়া হতো। আলী আহসান যেহেতু দাবী করতো সে পীর বংশের সন্তান, সে নেমেছিলো ধর্মীয় প্রচারণায়। কোরানের আয়াত পড়ে ব্যাখ্যা করে বলতো যে ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা জেহাদের শামিল এবং পূর্ব পাকিস্তানবাসী প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। আখতার মুকুলের চরমপত্রে যে সমস্ত ব্যক্তির প্রাণদন্ডের হুমকি থাকতো তাদেঁর মধ্যে থাকতেন গভর্নর আব্দুল মালেক, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, ডক্টর হাসান জামান এবং আরো অনেকে। শুনেছি দু'একবার আমার নামও বলা হয়েছে। তবে এটা আমার নিজের কানে শোনা কথা নয় ।

একদিন রাত্রে নয়টা বা সাড়ে নয়টায় ফোন এলো। আমিই ধরেছিলাম। আমার গলা শুনে অপর প্রান্ত থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন 'আপনি তা হলে বেঁচে আছেন? আমি ময়মনিসংহ থেকে বলছি। আমরা এইমাত্র কলকাতার স্বাধীন বাংলা বেতারে শুনলাম আপনার প্রাণনাশ করা হয়েছে'। এই ভদ্রলোক কোন দলের ছিলেন জানি না তবে তাঁর গলার স্বরে মনে হয়েছিলো যে তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তি।

প্রদেশের সর্বত্র যখন বোমাবাজি এবং লুটতরাজ হচ্ছে তখন একদিন কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক খোন্দকার মোকাররম হোসেন ফোন করে জানালেন যে, তাঁর ডিপার্টমেন্টে বারুদ জাতীয় কিছু বিস্ফোরক জমা রয়েছে। তিনি ভয় পাচ্ছেন যে গেরিলারা এগুলো চুরি করে নিয়ে ব্যবহার করবে। আর্মি যেনো এগুলো সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে। তাঁর অনুরোধ আর্মিকে জানিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

বিস্ফোরক দ্রব্যগুলি কার্জন হল এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রফেসর মোকাররম হোসেন ভয় পাচ্ছিলেন যে বিস্ফোরক চুরি হয়ে গেলে তিনি নিজে ফ্যাসাদে পড়বেন।

নভেম্বরে একদিন গভর্নর মালেকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন যে করাচীর কোন শাহ সাহেব নাকি বলেছেন যে পাকিস্তান টিকে থাকবে। ডক্টর মালেক খুব ধর্মভীরু ছিলেন। শাহ সাহেবের এই ভবিষ্যৎ বাণীটি আক্ষরিক অর্থেই সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। পাকিস্তান অবশ্যই টিকে যায়, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা পায়নি। ডক্টর মালেক আরো জানালেন যে যাদের নিয়ে কোলকাতায় প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছে তাঁরা নাকি দু'দলে বিভক্ত। এক দল চাচ্ছিলেন ছ'দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে বোঝাপড়া করে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে। এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। অপরদলের প্রধান ছিলেন তাজউদ্দিন। এরা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছি হয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। ডক্টর মালেক বললেন যে এ সমস্যা নিয়ে কোলকাতায় বিতর্ক চলছে এবং শিগগিরই ভোটাভুটি করে এর মীমাংসা হবে। পরে শুনেছি যে খন্দকার মোশতাকের দল নাকি এক ভোটে হেরে যায়। তবে আমার বিশ্বাস যে প্রবাসী সরকারের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন কিছু করার ক্ষমতা ছিলো না। ইন্দিরা সরকারের নির্দেশেই তারা পরিচালিত হতেন। সুতরাং ইচ্ছা করলেই গৃহযুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের হতো কিনা, সন্দেহ।

একদিকে যেমন স্বাধীন বাঙলা থেকে নানা কথা প্রচার করা হতো তেমনি অন্যদিকে ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফ মানেক শ'র নামে উর্দু, পাঞ্জাবী এবং পশতু ভাষায় পাকিস্তান আর্মির উদ্দেশ্যে রোজই বক্তৃতা প্রচারিত হতো, কোন জায়গায় লিফলেট ছড়ানো হতো। বলা হতো যে পাকিস্তান আর্মির যুদ্ধে জয়লাভ করার কোন সম্ভাবনাই নেই; প্রাণ রক্ষা করতে হলে সৈন্যরা যেন অবিলম্বে অস্ত্র ত্যাগ করে এবং ইন্ডিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তবে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ রকম আত্মসমর্পণের কোনো খবরই আসেনি।

যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন পাকিস্তান আর্মি অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়েছিল, প্রশাসনেও তারা কোন দক্ষতা দেখাতে পারেনি। এদের চোখের সামনে বহুলোক মার্চ থেকে করে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন পথে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছিল। কেউ কেউ আর্মির সহযোগিতায় ইংল্যান্ড আমেরিকা পর্যন্ত গেছে। একদিন শুনে অবাক হলাম যে ইসলামী ইতিহাসের অধ্যাপক এ বি এম হাবিবুল্লাহ যাঁকে টিক্কা খান বরখাস্ত করেছিলেন, করাচী হয়ে প্রথমে আফগানিস্তানে যান এবং সেখান থেকে লন্ডনে

উপস্থিত হন। পশ্চিম পাকিস্তানে আটক বাঙালী অফিসার যারা বিদ্রোহে যোগদান করতে চান তারাও আফগানিস্তান পালিয়ে যেতেন এবং সেখান থেকে বিমানযোগে ইন্ডিয়ায় চলে আসতেন। একদল মুনাফা লোভী লোক মালপত্রের মধ্যে এদের লুকিয়ে সীমান্ত পার করে দিতো। এটা একটা বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল।

নভেম্বরের শেষ দিকে অবস্থা আরো সংকটময় হয়ে ওঠে। ভারতীয় অনুপ্রবেশের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। শোনা যায় যে, কোন তারিখে ইন্ডিয়ান আর্মি ঢাকা দখল করবে সেটাও নাকি স্থির হয়ে গেছে।

উপায়ন্তর না দেখে তেসরা ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটাও ছিলো তার একটি ভুল পদক্ষেপ। কারণ এতদিন ইন্ডিয়া পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করলেও সে যে প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তান দখলের চেষ্টা করছে, সে কথা স্বীকার করতো না। এবার আর সে বাধা রইলো না। ইন্ডিয়ান আর্মি পশ্চিম পাকিস্তানেও আক্রমণ করতে শুরু করে। ব্যাপারটা তখন জাতিসংঘে পেশ করা হয়। সাধারণ পরিষদে ভোটাধিক্যে যুদ্ধ বন্ধ করার আবেদন জানানো হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। রাশিয়া এই প্রস্তাব বানচাল করে।

ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর থেকে ঢাকার উপর বিমান আক্রমণ শুরু হয়। দশ কিংবা এগারই ডিসেম্বর একদিনে যখন একদিনে এগারটি ভারতীয় বিমান ভূপাতিত হয় তখন হঠাৎ ঢাকার আকাশ-বাতাস পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। এই আকস্মিক বিজয়ে পাকিস্তানের প্রতি জনসাধারণের আস্থা আবার ফিরে আসে। কিন্তু এটা ছিলো ক্ষণিকের ব্যাপার। এরপর ভারতীয় আক্রমণে পূর্ব পাকিস্তানে যে কয়টি বিমান ছিলো তা ধ্বংস হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান আরো অরক্ষিত হয়ে পড়ে, কারণ বিমানের সহযোগিত। না পেলে আধুনিককালে স্থল বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবু যে রহস্য আমরা কখনো বুঝতে পারিনি তা হলো পাকিস্তান আর্মি কেনো কোলকাতার তার উপর হামলা করলো না। আমি আগেই বলেছি যে জেনারেল নিয়াজীর স্ট্রাটেজি বুঝবার সাধ্য আমাদের ছিলো না। কোন সেক্টরেই তিনি আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। অথচ আর্মি অফিসাররা বলে বেড়াতেন যে সাহসে ও বীর্যে একজন পাকিস্তান সেনা দশ জন ইন্ডিয়ান সৈনিকের সমান। এই আস্ফালনের কোনো পরীক্ষাই হয়নি।

১৩ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডিয়ান ছত্রী বাহিনী অবতরণ করবে বা করছে এরকম গুজব ছড়ায়। এতে আতঙ্ক আরো বেড়ে যায়।

১৩ এবং ১৪ই ডিসেম্বর ভাইস চান্সেলরের বাসার উপরেও বিমান আক্রমণ হয়। কয়েকটা আমাদের বাগানে এবং দালানের দু'এক জায়গায় লাগে। নিষ্প্রদীপ মহড়ার জন্য তখন বাসার দরজা-জানালার কাঁচে কালো কাগজ এঁটে দেওয়া হয়েছিল। সন্ধ্যার পর অধিকাংশ বাতি নিভিয়ে রাখা হতো। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, এই বাসাটাও একটি সামরিক টার্গেটে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া মহসিন হল অঞ্চলেও একদিন বোমা পড়ে। কারণ একটি গুজব ছড়িয়েছিলো যে পাকিস্তান আর্মি কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছে।

১৪ই ডিসেম্বর

১৪ তারিখ রাত্রে বাসার উপর বিমান আক্রমণের পর আমি স্থির করি যে এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। কিন্তু এখান থেকে বেরুনোও ছিলো বিপদজনক, সারা শহরে তখন কারফিউ। আমি একজন আর্মি জওয়ানকে ডেকে কারফিউ- এর মধ্যে আমাদের পুরানো বাসা ১০৯ নম্বর নাজিমুদ্দিন রোডে পৌছে দিতে বললাম। সে রাজী হলে কাপড়ের দু'টো সুটকেস নিয়ে আমরা এ বাসায় ফিরে আসি। সব মালপত্র পড়ে থাকে ভাইস চান্সেলর ভবনে। এর অধিকাংশ আর পরে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আর একটা ঘটনা বোধ হয় উল্লেখ করা দরকার। নভেম্বরের শেষ দিকে পাকিস্তান আর্মি কতটা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল তার প্রমাণ পেলাম যখন শুনলাম যে রাও ফরমান আলী গোপনে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব ইন্ডিয়াকে দিয়েছে। তাঁর প্রস্তাবের শর্ত কি ছিলো, জানি না। কিন্তু এ গুজব একেবারে ভিত্তিহীন ছিলো না বলে আমার বিশ্বাস। জেনারেল নিয়াজী নাকি চেয়েছিলেন শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। দরকার হলে আর্মি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় নিতো কিন্তু এমন কিছুই হয় নাই। তাছাড়া গভর্নর মালেকও কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁর সরকারের পক্ষ থেকেও আত্মসমর্পনের কথা ওঠে। কিন্তু মন্ত্রী সভার সব সদস্য এতে সম্মত হননি। ১৪ তারিখে গভর্নর হাউজে মন্ত্রী সভার বৈঠক হবার কথা ছিলো। এই সভয়ই স্থির হতো যে সরকার আত্মসমর্পণ করবে না যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কিন্তু এই মিটিং হতে পারেনি। তার কারণ মিটিং-এর খবর কোন গুপ্তচর দিল্লীতে পৌছায়। তার মানে করাচীতেও গুপ্তচর বৃত্তিতে কিছু লোক নিযুক্ত ছিলো। মিটিং- এর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সভা কক্ষের উপর বোমা হামলা হয়। ডক্টর মালেক এবং মন্ত্রীরা কোন রূপে বেসমেন্টে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে রক্ষা পান।

দেশের ভিতরে গুপ্তচর বৃত্তির এটাই একমাত্র প্রমাণ নয়। যে সমস্ত কান্ড হচ্ছিলো তাতে সন্দেহের কারণ ছিলো যে এ অঞ্চলে বেসামরিক এবং সামরিক সব খবর নিয়মিতভাবে ইন্ডিয়াতে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। কারা এ গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছিলো জানি না। তবে কে বিশ্বাসযোগ্য এবং কে বিশ্বাসযোগ্য নয় তা স্থির করা রীতিমতো মুশকিল হয়েপড়ে। নভেম্বরের আগে বা বোধ হয় সেই মাসেই কুর্মিটোলায়র ক্যান্টনমেন্ট সম্পর্কে এক গুজব আমাদের কানে আসে। শুনলাম ক্যান্টনমেন্ট মসজিদের ইমাম গুপ্তচর। সে ভালো কেরাত করে কোরআন শরীফ পড়তে পারতো। কিন্তু প্রমাণিত হয় সে আসলে একজন শিখ, গুপ্তচর বৃত্তির জন্যই এসব শিখেছিলো। ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের সেক্রেটারিয়েট এবং অন্যান্য অফিস সম্পর্কে অনেক খবর রটতে থাকে। এ রকম একটি খবরের ভিত্তিতে একবার আর্মি ইউনিভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আমি মহা মুশকিলে পড়ি। কারণ এটা নিশ্চত ছিলো যে বিদ্রোহী দল এজন্য ভাইস চান্সেলরকে দোষারোপ করবে। তারপর অবশ্য আমার অনুরোধে এঁদের সবাইকে একজন একজন করে ছেড়ে দেয়। এদের মধ্যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের আহসানুল হক ও রশিদুল হাসান ছিলো। খালাস করার সময় আর্মি নাকি এদের শিখিয়ে দিয়েছিলো যে আপনারা প্রথমেই যেয়ে ভাইস চান্সেলরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

১৪ই ডিসেম্বরের আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেদিন অফিসে বসা মাত্র খবর এলো যে ঐ দিন ভোর রাত্রে নাকি একদল সশস্ত্র ব্যক্তি ইউনিভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষককে ধরে নিয়ে গেছে। যারা এসেছিলো তারা নাকি আর্মির লোক নয় কিন্তু এরা কারা সে রহস্য আজও উদঘাটিত হয় নাই। ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছাড়াও আরো কিছু ব্যক্তিকে পাকড়াও করে এই দল নিয়ে যায় এবং ১৬ই ডিসেম্বরের পর লাশ মীরপুরের আশেপাশে পাওয়া যায়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন বাংলার মুনীর চৌধুরী,ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের রশিদুল হাসান, ইতিহাসের গিয়াসউদ্দিন আবুল খায়ের এবং সন্তোষ ভট্টাচার্য। আরো ছিলেন ইউনিভার্সিটির সহকারী মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার মুর্তজা।

ডাঃ মুর্তজা পিকিং পন্থী বামপন্থী দলের সমর্থক ছিলেন এবং বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন না। এই কারণে এদের মৃত্যু রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখা দরকার যে এঁদের ব্যক্তিগত মতামত যাই হয়ে থাকুক,প্রকাশ্যভাবে এরা কেউ গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। অবশ্য এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে তখন শিক্ষক যারা কোন রকমে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রায়ই কোলকাতা থেকে নানা হুমকি দেওয়া হতো। ১৬

তারিখে যখন পূর্ব পাকিস্তনের পতন ঘটে তখনো আমরা কেউ জানতাম না এ লোকগুলোর কি হয়েছে। এবং আজ পর্যন্ত আর্মি এবং রাজাকারদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শোনা গেলেও এদের মৃত্যূ রহস্য সন্দেহাতীতভাবে উদঘাটিত হয় নাই। যখন পাকিস্তান আর্মি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তার পূর্বক্ষণে তাদের বা তাদের সমর্থকদের এ রকম কান্ড ঘটাবার সাহস না থাকারই কথা।

১৪ই ডিসেম্বর যখন চারদিকে আতঙ্ক এবং যে কোন মুহূর্তে পাকিস্তান সরকারের পতন ঘটবে বলে শোনা যাচ্ছে তখন রাত্রে খুলনা থেকে একজন আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে ঢাকার অবস্থা কেমন? আমি যখন বললাম যে এখানের অবস্থা ভাল নয়, সে জানালো যে খুলনার দিকে ইন্ডিয়ান আর্মি প্রবেশ করতে পারেনি। পাকিস্তান আর্মি স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় ইন্ডিয়ানদের বাঁধা দিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত ১৬ই ডিসেম্বর যখন জেনারেল নিয়াজী জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন তখন কিশোরগঞ্জ,সিলেট এ রকম ব জায়গায় যুদ্ধ চলছিলো। কিশোরগঞ্জে মওলানা আতাহার আলী ১৬ তারিখের পরও কয়েকদিন পাকিস্তানের পতাকা নামাতে রাজী হননি। পরে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে পতাকা নামাতে রাজী করানো হয়।

১৫ই ডিসেম্বর রাত্রের অবস্থা বর্ণনা করা সহজ নয়। তখন অনেক গেরিলা ঢাকায় প্রবেশ করছে। সারা রাত ভরে গোলাগুলির আওয়াজ কানে আসতে থাকে। আরো শুনি যে আগামীকাল রমনার মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান আর্মি আত্মসমর্পণ করবে, সত্য জেনেও তখনো এ কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত ছিলো যে পাকিস্তান সত্যি সত্যি ভেঙ্গে পড়ছে। সারারাত ধরে ৪৭ সালের আগস্ট মাসের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আদর্শবাদের কথা ভাবি। যারা তখন পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে বাংলার আকাশ বাতাস ভরে তুলেছিলো তাদেরই একদল আজ 'জয় বাংলা' চিৎকার করে আহ্লাদে ফেটে পড়ছে- এ ছিলো আমার জন্য এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। মনে হয়েছিলো আমরা যেনো এলিসের ওয়ান্ডার ল্যান্ডের মতো কোনো দেশের অধিবাসী যেখানে কোন কিছুরই স্থিরতা নেই। ভাবলাম এটা কি আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট? মনে হয়েছিল, যে ফজলুল হক সাহেব ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তিনিই ১৯৪৬ সালে ইলেকশনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং একবার কোলকাতা হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার পথে পাকিস্তান সম্বন্ধে এমন এক উক্তি করেছিলেন যার ফলে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তাঁকে দেশদ্রোহী বলতে বাধ্য হন। মওলানা ভাসানী যিনি সিলেটের গণভোটের সময় এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, তিনিও

একবার পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে ছিলেন। এ রকম আরো অনেক লোকের কথা জানতাম যাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুহূর্তেই পাকিস্তানের আদর্শে আস্থা হারিয়ে নানা কথা বলতেন। আমি বরঞ্চ কাজী আব্দুল ওদুদ বা সৈয়দ মোজতবা আলীর মতো ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি। তাঁরা পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেননি এবং প্রথমাবধি পশ্চিম বাংলায় থেকে যান। তারপর কংগ্রেসের মুসলিম সদস্য যাঁরা পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন তাঁদের মনোবৃত্তিও কিছুটা বুঝতে পারতাম। কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ক্ষু হয়ে নেহেরুকে এক চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু যারা এককালে পাকিস্তানের বদৌলতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন এবং যাঁরা পাকিস্তান না হলে সমাজের নিম্নস্তরে পড়ে থাকতেন তাঁরা এবং তাঁদের সন্তানেরা যে যুক্তিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেই যুক্তি আমার বোধগম্য ছিলো না।

১৫ তারিখ রাত্রে আরও ভাবি যে, যে পরিবর্তন আসছে তাতে আমার নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনো স্বস্তিই পাচ্ছিলাম না। নয় মাসে চারদিকে প্রতিহিংসার আগুন যেভাবে জ্বলে উঠেছিলো তাতে দেশের এবং সমাজের কোনো মঙ্গল হতে পারে এ কথা বিশ্বাস করা ছিলো আমার পক্ষে অসম্ভব।

তাছাড়া আরেকটা কথা ভাবি, এই তথাকথিত মুক্তিবাহিনী যদি নিজেরা যুদ্ধ করে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো তাতেও অগৌরবের কিছু আমার চোখে পড়তো না। বিচ্ছিন্নতাকে আমি সহজে মেনে নিতে পারতাম না সত্যি কিন্তু তা হলেও মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে পারতাম যে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্তান টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু যা হতে যাচ্ছিলো সেতো বিদেশী একটি রাষ্ট্রের সাহায্যে একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা মাত্র। ইন্ডিয়ান আর্মি এই দেশকে যুদ্ধে পরাজিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে এটা দখল করতে আসছিলো। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বা যারা এখন নিজেদের বাঙালী বলতে শুরু করেছিলো তাদের গৌরবের কি থাকতে পারে? এরা ইচ্ছা করে একটা বিদেশী শক্তির কাছে দেশকে তুলে দিতে যাচ্ছিলো এবং এর নাম দিয়েছিলো স্বাধীনতা। শুনেছি এখনো কোলকাতায় নাকি পূর্ব পাকিস্তান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ইন্ডিয়া বিজয় লাভ করেছিলো এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে কৌশলে ইন্ডিয়া বিজয় লাভ করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে তারও প্রশংসা আমি করতে পারি। কিন্তু পাকিস্তানী হিসাবে এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না।

আরও মর্মাহত হচ্ছিলাম এই ভেবে যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা অধিবাসী, সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তার মধ্যে বীরত্বের কিছু ছিল না। যুক্ত বাংলায় যেমন সংখ্যাগু হয়েও মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যেত, এখানেও তাই। অথচ এটাকে বলা হচ্ছিল বাঙালীর সাহস ও বীরত্বের প্রতীক।

১৬ই ডিসেম্বর ভোরে উঠে দেখলাম প্রায় বাড়ীতেই 'জয় বাংলা' পতাকা। তবে আমাদের মহল্লায় রাস্তায় কোন উল্লাস হয়নি। দিন দশটার দিকে নাকি জেনারেল অরোরা এবং অন্যান্য ইন্ডিয়ান অফিসার রমনার মাঠে উপস্থিত হন এবং এঁদের কাছে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন। শুনেছি তিনি নাকি তখন কেঁদে ফেলেছিলেন।

এ সময় গভর্নর মালেক এবং তাঁর মন্ত্রীরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই হোটেলটিকে 'নিউট্রাল গ্রাউন্ড' বলা হতো। বিদেশী সাংবাদিকরাও এখানে থাকতেন।

সবচেয়ে দুঃখ পেলাম যখন শুনলাম যে আমাদের পরিচিত কোন কোন পরিবার বিরিয়ানী রান্না করে ইন্ডিয়ান সৈন্যদের জন্য পাঠাচ্ছে। আমার নিজের ফুপাতো ভাই হাসিনা মঞ্জিলের সৈয়দ ফখরুল আহসানের মেয়েরা এরকম দু'ডেক পোলাও রমনা কিংবা ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে ছিলো। এ ছিলো এক অদ্ভূত দৃশ্য।

পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ হলেও ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। এই যুদ্ধ বন্ধ হয় আমেরিকার হুমকিতে। অথচ পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার জন্য আমেরিকা কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। একবার শোনা গিয়েছিলো যে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর পূর্ব পাকিস্তানের দিকে এগিয়ে আসছে। এ খবর কদ্দুর সত্য তা আমি এখনো জানি না। তবে চাপ দিলে ইন্দিরা গান্ধী যে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পাঠাতে সাহস পেতেন না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৬, ১৭, ১৮ ডিসেম্বর মহা উৎকন্ঠার মধ্যে কাটে। তখন চারদিক থেকে শুধু হত্যাকান্ডের খবর আসছিল। পাকিস্তান সমর্থক বলে যাদের উপরই সন্দেহ হয়েছে তাদেরই বিনা বিচারে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে ছিল কয়েক হাজার বিহারী এবং বহু বাংলা ভাষী মুসলমান। ১৭ তারিখে বোধ হয় সৈয়দ আলী আহসানের ছোট ভাই সৈয়দ আলী নকী আমার সাথে দেখা করতে আসে। সে বলে, সাজ্জাদ ভাই! আপনি এখান থেকে সরে যান। আমি জবাব দিয়েছিলাম যে, আমি পাকিস্তানে বিশ্বাস করতাম এ কথা সত্য কিন্তু আমি কোন খুন জখম বা অনুরূপ অপরাধ

করিনি। আমি পালাবো কেনো? তাছাড়া পরিবারকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে আত্মগোপন করা হবে চরম কাপুরুষ। যদি আমার নসিবে মৃত্যু থাকে সেটা রোধ করা অসম্ভব হবে। কিন্তু পালিয়ে আমি কাপুরুষতার দুর্নাম অর্জন করতে রাজী নই। ১৯ তারিখে ভাইস চান্সেলরের সেক্রেটারিকে খবর দিলাম সে যেনো ফাইল নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। সে আমাকে ফাইল পাঠিয়ে দিলো কিন্তু নিজে আসতে সাহস পেলো না। পরে শুনেছি ক্যাম্পাসে ১৬ তারিখ থেকেই আমার খোঁজাখুঁজি হয়।

ফাইলে আমি যে কথাগুলি লিখেছিলাম তা আমার মনে আছে। আমি যে ১৬ তারিখের পর টিক্কা খানের আদেশে যে সমস্ত শিক্ষক চাকুরীচ্যূত হয়েছিলেন তাঁদের উপর আরোপিত সে আদেশ এখন অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

১৯ তারিখ সকাল বেলা রেডিওতে যে ঘোষণা শুনি তাতে মনে হয়েছিলো যে আমার বিপদ খুব কাছিয়ে এসেছে। সেদিন রেডিও খুলতেই এক পরিচিত ছাত্র নেতা আ স ম আব্দুর রবের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে গভর্নর মালেক, সবুর খান, ফজলুল কাদের এবং হাসান জামানের নাম উল্লেখ করে বললো যে এঁদের কি শাস্তি হওয়া উচিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল সে প্রাণদন্ডের কথাই বলছে। আমার নাম এ ঘোষণায় ছিলো না কি ঘোষণাটি শোনা মাত্র আমার পাশের বিছানায় শোওয়া ফুপাতো ভাই সৈয়দ কামরুল আহসানকে বলি, আমাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। হয় তো শিগগির আমাদের ধরতে আসবে।

ঐ দিন বিকাল সাড়ে তিনটার সময় আমি উপর তলায় আমার বড় মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ একটা গন্ডগোলের শব্দ কানে এলো। মনে হলো কতগুলি লোক আমাদের বাড়ীর ভিতরে ঢুকে উপরে আসার চেষ্টা করছে। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা তাদের থামাতে চেষ্টা করছে। মুহূর্তেই টের পেলাম যে এরা আমার জন্য এসেছে। আমি নিচে যাওয়ার চেষ্টা করতেই আমার মেয়ে আমাকে টেনে ধরে দরোজা ব করে দিলো। আমি বললাম, এতে লাভ হবে না। তোমরা এভাবে আমাকে বাঁচাতে পারবে না। এ কথা শেষ না হতেই মনে হলো একদল লোক ছাদের উপর উঠে এসেছে। প্রচন্ড জোরে লাথি দিয়ে ছাদের দিকের দরোজাটা ভেঙ্গে ফেললো। আমাকে দেখা মাত্র বললো, 'হ্যান্ডস আপ'। যেনো আমার কাছে কোন বন্দুক বা পিস্তল ছিলো। তারপর এ ভাঙ্গা দরোজা দিয়ে ঢুকে আমার শার্ট ধরে ওরা আমাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যায়। শীতের দিন আমার পরনে ছিলো পশমী প্যান্ট এবং শার্টের উপর কার্ডিগ্যান। চারদিকে তাকাবার অবসর ছিলো না। যারা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের সবার হাতে অস্ত্র। আমাকে যখন বাইরে

নিয়ে আসা হলো তখন দেখলাম গেটের সামনে একটি খোলা জিপ। এবং জিপের দু'দিকে মহল্লার লোকজন জড়ো হয়ে আছে। কেউ কিছু বললো না। বুঝতে পারলাম আমি কতটা অসহায়। আমাকে ঠেলে ওরা জিপে উঠিয়ে দিলো। মনে হলো এই আমার শেষ যাত্রা। হয়তো এখনি নিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে।

অধ্যায় ৯

১৯শে ডিসেম্বরের ঘটনা

১৯শে ডিসেম্বর যারা আমাকে বাসা থেকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়, তারা ছিলো সব ছাত্র। এর মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রও ছিলো। তবে আমার ডিপার্টমেন্টের নয় এবং এদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো পরিচয় ছিলো না। আমাকে নিয়ে জিপ যখন বকশীবাজারের দিকে রওয়ানা হয় তখন শুনলাম এরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে ইনিই ডক্টর সাজ্জাদ হোসায়েন কিনা। আমি ওদের আশ্বস্ত করে বললাম যে তাদের সংশয়ের কারণ নেই, আমিই ঐ ব্যক্তি। মিথ্যা পরিচয় দেওয়ার কোন প্রবণতা আমার ছিলো না। মিথ্যা পরিচয়ে মৃত্যুবরণ করে কি হবে? কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে আমাকে নিয়েই তো ওরা মেরে ফেলবে।

জিপটা বকশী বাজারের অলিগলি ঘুরে ক্যাম্পাস এলাকায় প্রবেশ করে এবং এটাকে ল' ফ্যাকালটির বিল্ডিং প্রাঙ্গণে দাঁড় করানো হয়। ছাত্ররা আমাকে টেনে তেতলার একটা কামরায় নিয়ে আসে। খুব সম্ভব সেখানে আরো দু'একটি ছেলে উপস্থিত ছিলো। কামড়ার দরজা বন্ধ করেই ওরা আমাকে মারধোর করতে শুরু করে। এক ঘুষিতে আমার চশমা ছুটে পড়ে যায়। মারের মধ্যে একজন আমার গায়ের কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং হাতের ঘড়িও ছিনিয়ে নেয়। আমার পরনে যে প্যান্ট ছিলো তার বেল্ট খুলে নিয়ে সেটা দিয়ে আমার বুকে- পিঠে- হাতে আঘাত করতে শুরু করে। লক্ষ্য করে দেখলাম ডান হাতের আঙ্গুলের গোড়ার চামড়া ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। আমি চুপ করে এসব সহ্য করছিলাম। কারণ জানতাম এদের সাথে তর্ক করতে গেলে নিপীড়ন বৃদ্ধি পাবে। মারের সঙ্গে আমাকে গালাগালিও করা হচ্ছিলো। পাকিস্তান আর্মির দালাল হিসাবে আমি নাকি বহু হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত। আমি শুধু একবার বলেছিলাম যে আমার অপরাধ হয়ে থাকলে তার বিচার হোক। বলাবাহুল্য এতে যেনো ওদের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেলো।

বেশ কিছুক্ষণ মারধোর করার পর ওরা পিঠমোড়া করে আমার দু'হাত বেঁধে দিলো এবং চোখও রুমাল দিয়ে বাঁধা হলো। এরপর বন্দুকধারী এক যুবকের জিম্মায় আমাকে রেখে বাকী সবাই ঐ কামরা থেকে চলে যায়। এই ছেলেটি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে আমাকে পাহারা দিতে থাকে।

আমি ঐ ছেলেটিকে বললাম তোমরা বিচার না করেই আমার উপর নিপীড়ন চালাচ্ছো কেনো? আমাকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করতে পারো কিন্তু তার

আগে বিচার হওয়া উচিত। ছেলেটি বললো আমাকে কেনো ধরে নিয়ে আসা হয়েছে সে সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। সে গফরগাঁও কলেজের ছাত্র; গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। দল নেতার নির্দেশে সে আজকের অপারেশনে শরীক হয়। তবে কোথায় অপারেশন হতে যাচ্ছে সেটা তাকে আগে জানানো হয়নি। তারপর সে বললো যে দলের নির্দেশ পেলেও সে আমাকে গুলি করতে পারবে না। এতে সান্ত্বনা লাভ করার আমার কিছু ছিলো না। কারণ গুলি করার লোকের অভাব হতো না। তারপর ছেলেটি যে সমস্ত কথা বললো সেগুলো মনে রাখবার মতো। সে বললো, নভেম্বরের শেষের দিকে আমরা হতাশ হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে দেশে ফিরবার কথা ভাবছিলাম। কারণ আমাদের বিশ্বাস হয়েছিলো, দশ বছর এভাবে যুদ্ধ করেও পাকিস্তান, আর্মিকে হারাতে পারবো না। ভারতের হস্তক্ষেপে অবস্থা নটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। আমরা শুধু ভারতীয় আর্মির সঙ্গে সঙ্গে চলে আসি।

ঐ ছেলেটির নাম আমার এখন মনে নেই। সে এখন বেঁচে আছে কিনা, তাও জানি না। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে তার মুখে যে স্বীকৃতি শুনেছিলাম তার মধ্যে আমাদের অভিমতেরই সমর্থন ছিলো। ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তান আর্মির যে পরাজয় ঘটে তার মধ্যে গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। এটা ছিলো ভারতীয় বাহিনীর বিজয়। এরপর এ ছেলেটির সঙ্গে আর বিশেষ কথা হয়নি। মনে আছে একবার আমি একটু পানি খেতে চেয়েছিলাম, ছেলেটি এক কাপে করে পানি আমার ঠোঁটের কাছে ধরে বললো, আমার চোখ খুলে দিলে ও নিজে বিপদে পড়বে। আমি চুপচাপ পাকিস্তানের ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলাম এবং বারবার যাদের ফেলে এসেছি তাদের কথা মনে হলো। এদের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে, এ আশা ছিলো না। কালেমা শাহাদত পড়ে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে লাগলাম। ধারণা হয়েছিলো যে যারা ঐ ছেলেটির কাছে জিম্মায় আমাকে রেখে গেছে তারা কিছুক্ষণ বাদেই ফিরে এসে আমাকে মেরে ফেলবে। ঐ ছেলেটি আমাকে জানিয়েছিলো যে আরো অনেক লোককে ধরে এনে ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং এ আটক করে রাখা হতো এবং সেখানেই ওদের গুলি করা হতো।

কতক্ষণ এভাবে কাটে, আমার খেয়াল নেই। ঐ স্বাভাবিক পরিবেশে খালি গায়ে আমি কোনো শীত অনূভব করছিলাম না। ক্রমে ক্রমে মনে হলো- রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ কমে এসেছে। ভাবলাম এখন নিশ্চয়ই রাত এগারটা সাড়ে এগারটা হবে। হঠাৎ দরজায় একটা ধাক্কার শব্দ শুনলাম। আমার পাহারাদার দরজা খুলে দিলে দু'জন ছেলে ঢুকলো। আমি তাদের দেখভে পাচ্ছিলাম না। কথাবার্তায় মনে হলো এরাও ইউনিভার্সিটির ছাত্র। আমাকে আরো কিছু কিলচাপ্পড়

মেরে ওরা আরো মজবুত রশি দিয়ে আমার হাত বেঁধে চোখের বাঁধুনি আরো শক্ত করে দেয়। এবং মুখে রুমাল ঢুকিয়ে দিয়ে আমার কথা বলা বন্ধ করে। আমি তখনো আস্তে আস্তে কালেমা শাহাদত পড়ছি। ওরা ঠাট্টা করে বললো এসব মন্ত্রে কোনো কাজ হবে না। মুখ বন্ধ হওয়ার আগে আমি আবারো একবার জিজ্ঞাসা করলাম, আমার অপরাধ কি? ওদের একজন ইংরেজীতে জবাব দিলো, Mr Vice Chancellor, you have lived too long. আমি নাকি ইউনিভার্সিটি এলাকায় যতো হত্যাকান্ড ঘটেছে তার জন্য দায়ী। সেগুলি mastermind করেছি। আমি তর্কে নিবৃত্ত হলাম। কারণ মনে হচ্ছিলো এদের চোখ মুখ থেকে ক্রোধের আগুন ঠিকরে পড়ছে। ভাবলাম ওরা এখনই হয়তো আমাকে তুলে নিয়ে গুলি করবে। সে জন্য অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে ঈমানের সঙ্গে যাতে মরতে পারি সে কথাই ভাবতে লাগলাম।

ছাত্র দু'টি রশি টেনে অন্য এক কামরায় নিয়ে গেলো, তারপর ঐ রশির এক মাথা মনে হলো কোনো টেবিল বা বেঞ্চের সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে দিলো যাতে আমি ভালো করে নড়াচড়া করতে না পারি। দু'জনের একজন কামরা থেকে বেরিয়ে যায়। তার সঙ্গী ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে একটা বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ে। আমি এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু নড়াচড়ার শব্দে টের পাচ্ছিলাম যে ছাত্রটি নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে। কারণ কিছুক্ষণ পরই তার নাক ডাকার শব্দ আমার কানে আসে।

এদিকে আমি বসে থেকেও কোনো স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। হাতের কবজি এমনভাবে বাঁধা ছিলো যে একটু নড়াচড়া করা মাত্র হাত কেটে যেতে শুরু করে। সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা, করছিলাম। এবার বিশ্বাস হলো যে ভোরে কোথাও ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। সারারাত কালেমা পড়ে কাটিয়ে দিলাম। মাঝে মাঝে নানা কথাও মনে হচ্ছিলোঃ ফ্যামেলির কথা, আত্মীয়- স্বজনের কথা এবং দেশের কথা। ১৯৪০ সালে যে স্বপ্নে আমরা তরুণরা মেতে উঠেছিলাম তার এ মর্মান্তিক পরিসমাপ্তির কথা কখনো কল্পনা করতে পারিনি।

ঘুমের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। ক্ষুধা- তৃষ্ণাও ছিলো না। মনে হলো ফাঁসির আসামীর মৃত্যুর পূর্বে এ রকমই কিছু অভিজ্ঞতা হয়। যখন মসজিদে ফজরের আজান হয়, তার কিছুক্ষণ পর আবার দরজায় শব্দ হলো। যে ছাত্রটি ভেতরে ছিলো সে জেগে উঠে দরজা খুলে দিলে একজন বা দু'জন ছেলে প্রবেশ করে। এবং আমাকে বলে গেটআপ। আমি উঠে দাঁড়ালাম। পায়ের স্যান্ডেল কোথায় সরে

গিয়েছিলো, টের পেলাম না। আর এখন এই মুহূর্তে স্যান্ডেল দিয়ে আমার কি হবে। আমি যাচ্ছি তো বধ্যভূমিতে।

ওরা আমাকে টেনে নিচে নামিয়ে আনলো। মনে হলো ওখানে একটা গাড়ি। প্রথমে আমাকে গাড়ির সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসানো হয়। পরক্ষণেই ওখান থেকে নামিয়ে এনে পেছনে ফ্লোরের উপর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তখন বুঝলাম এটা খোলা জিপ। আমার দু'পাশে অস্ত্রধারী কতগুলি লোক পা ঝুলিয়ে বসা ছিলো সেটা টের পেলাম বিভিন্ন সাড়া শব্দে।

জিপ আমাকে নিয়ে কোথায় এলো টের পাচ্ছিলাম না মোটেই। রাস্তায় যানবাহনের কোনো শব্দ ছিলো না। আর জিপ অনেক রাস্তা ঘুরে চলছিলো। তাই প্রথমে মনে হয় আমাকে শহরের উপকন্ঠে নিয়ে আসা হচ্ছে। ঢেছ। জিপ থামলে ওরা আমাকে টেনে বের করে এবং সোজা হয়ে দাড়াতে বলে। আমি ভাবলামঅআর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমাকে গুলি খেতে হবে। মুখে গ্যাগ থাকা সত্ত্বেও আমি একটু জোরেই কালেমা শাহাদত পড়লাম। একজন বিদ্রুপ করে বললোঃ পড়ো, তোমার মন্ত্র পড়ো। সেই মুহূর্তে শেক্সপিয়ারের হেমলেট নাটকের একটা লাইনও মনে উদিত হলোঃ The undiscovered country from whose bourne no traveller returns.

নির্যাতন ও প্রাণনাশের চেষ্টা

এরপর ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে আমার বুকে চার জায়গায় এবং পিঠে দুই জায়গায় খোঁচা দেওয়া হয়। অনুভব করলাম যে রক্ত বেরুচ্ছে। ভাবলাম ওরা আমাকে এভাবে একটু একটু করে মারবে। আমি তখন মনে প্রাণে শুধু কালেমা পড়বার চেষ্টা করেছি। হঠাৎ আমার মেরুদন্ডের উপর প্রচন্ড একটা আঘাত অনুভব করলাম। সেটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। মুহূর্তেই আমি জ্ঞান হারিয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ি।

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম, জানি না। যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন টের পেলাম যে আমি চিৎ হয়ে মাটিতে শোওয়া এবং আমার বুক থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। শরীরের নিম্নাংশে কোন অনুভূতিই ছিল না। মনে হলো রক্তপাতের ফলে ক্রমান্বয়ে আমার জীবণী শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। কিন্তু কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পরও যখন মনে হলো যে আমি তখনও প্রাণ হারাইনি তখন কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলাম কোন লোকজনের পায়ের আওয়াজ আসে কিনা। দু'একটা রিকশার টুংটাং কানে আসছিল। আমি এবার সাহস করে জিহ্বা দিয়ে মুখের গ্যাগটা সরিয়ে ফেলে

একটু জোরে বললাম, আমি কোথায়? মনে হলো আমার গলার আওয়াজে কয়েকজন লোক আমার দিকে এগিয়ে আসে। একজন বলে উঠলো এটাতো মরেনি। যেনো আমি একটা কুকুর বা বিড়াল। আমি ওদের আমার চোখের এবং হাতের বাঁধন খুলে দিতে অনুরোধ করলাম। ওরা জিজ্ঞেস করলো আপনাকে মেরেছে কে? আমি সত্য কথাই বললাম। জবাব দিলাম মুক্তিবাহিনী। এবার মহা ফ্যাসাদে পড়া গলো। আগন্তুকদের মধ্যে একব্যক্তি লেকচার শুরু করে দিলো। বললো যে আমার উচিৎ শাস্তি হয়েছে। আমার মতো ব্যক্তিদের জন্যই নাকি দেশের এই দুর্দশা। আমি কোনো সাহায্য বা সহানূভুতি পেতে পারি না। আমি বললাম, আমি ভো মরতেই চলেছি। আমার চোখটা খুলে দিন। তখন একজন এসে আমার চোখের ও হাতের বাঁধন খুলে দেয়। চোখ খুলবার পর দেখরাম যে আমার সামনে সতেরো আঠারো বছরের এক ছোকরা দাঁড়ানো এবং আমি গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনে যেখানে কামানটা ছিলো- পড়ে আছি। কামানের পাশের রেলিং ধরে কোন রকমে উঠে বসলাম। পায়ে দাঁড়াবার শক্তি একেবারেই ছিলো না। শরীর থেকে তখনো রক্ত বরুচ্ছে। আমি আবার লোকজনকে বললাম, আমাকে একটু রিকশায় তুলে বায়তুল মোকাররম মসজিদে দিয়ে আসুন। এবারে ওরা বাধা দিয়ে কাউকে কিছু করতে দিলো না। আমাকে জানালো আমার মতো আরেকজন নাকি কামানের অন্যদিকে পড়া ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কে? জবাব এলো আমি হাসান জামান। বুঝলাম তাঁকেও ঐ জায়গায় এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আমার পাশে ক্রমশঃই ভিড় জমে উঠতে লাগলে। কিন্তু চেষ্টা করেও কোনো রিকশা ডাকতে পারছিলাম না। রিকশা কাছে এলই লোকজন তাকে তাড়িয়ে দিতো। এক পর্যায়ে দেখলাম একট্রাক বোঝাই ইন্ডিয়ান সৈন্য গুলিস্তান সিনেমার পাশ দিয়ে যচ্ছে। আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। কারণ ওরা আমার গলার আওয়াজই শুনতে পলো না। আমি ক্রমশঃই হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। ঠিক এই সময় নাজিমউদ্দিন রোডের এক ব্যক্তি, যে আমাকে চিনতো, আমাকে দেখেই এগিয়ে আসে এবং একটা রিকশা ডেকে তাতে তুলে আমাকে বাসায় নিয়ে আসে। এবার লোকজন আর বাধা দেয়নি। রিকশা যখন মোড় ঘুরছে তখন দেখলাম ডক্টর হাসান জামান নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বায়তুল মোকাররমের দিকে যাবার চেষ্টা করছেন।

আমাকে যখন বাসায় নিয়ে আসে তখন বোধ হয় ভোর সাড়ে সাতটা। ধরাধরি করে রিকশা থেকে নামিয়ে সামনে একটা ঘরে মাদুরের উপর শুইয়ে দেওয়া হয়। দেখলাম বাড়ীতে কয়েকজন ইন্ডিয়ান সৈন্য। আমাকে ফার্স্ট এইড

দেওয়ার জন্য মহল্লার ডাক্তার রইসউদ্দিনকে খবর দেওয়া হলো। তাঁর ক্লিনিক ছিলো রাস্তার ওপারেই। তিনি আসতে অস্বীকার করলেন। জানালেন যে মুক্তিবাহিনী যাকে শাস্তি দিয়েছে তাঁর চিকিৎসা করতে গেলে তিনি বিপদে পড়বেন। এরপর খবর দেওয়া হয় চক বাজারের ডাক্তার শামসুল আলমকে। এ ছিলো আমার এক ফুপাতো ভাইয়ের ছেলে। এও সোজা আসতে অস্বীকার করে। তখন গুলবদন শাহ সাহেবের জামাতা ডাক্তার মুনির উদ্দিনকেই ডাকা হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন। শুনেছি পরে তাকে সে জন্য মারধোরও খেতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমার ফুপাতো ভাই সৈয়দ কামরুল আহসান, তিনি তখন আমাদের বাসায় ছিলেন, ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসারদের খবর দেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক ইন্ডিয়ান মেজর ডাক্তার নিয়ে হাজির হন। আমাকে পরীক্ষা করে এরা বলেন যে একে অবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা দরকার এবং তারাই সমস্ত ব্যবস্থা করে ওদের গাড়িতে আমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমাকে রাখা হয় দোতলায় ৯ নাম্বার ভি আই পি ক্যাবিনে। কয়েকজন ইন্ডিয়ান সৈন্য সাতদিন পর্যন্ত এই ক্যাবিন পাহারা দিয়েছিলো।

একটু পেছনের কথা বলা দরকার। বাসার লোকজনের মুখে শুনেছি যে আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবার পর সৈয়দ কামরুল আহসান বুদ্ধি করে ইন্ডিয়ান আর্মিকে খবর দিয়েছিলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে বাসায় পাহারা বসায় এবং সারা ঢাকা তন্নতন্ন করে আমার খোঁজখবর করে। কিন্তু ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংটার কথা মনে না হওয়ায় তারা সেদিকে যায়নি।

ইন্ডিয়ান আর্মি

যে কয়দিন ইন্ডিয়ান সৈন্যরা হাসপাতালে আমাকে এবং বাসায় আমার পরিবারকে পাহারা দিয়েছিলো তাদের ব্যবহারে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছি। মেয়েদের মুখে শুনেছি ওদের মধ্যে যারা ছোট ছির তাদের ওরা কোলে করে আদর করতো এবং নানা খাবার- দাবারও এনে দিতো। এ কথা অবশ্যই স্বীকার কবরো যে ইন্ডিয়ান আর্মির সাহায্য না পেলে আমার কোনো চিকিৎসাই হতো না এবং বোধ হয় আমাকে আবার ধরে নিয়ে যেয়ে গেরিলারা মেরে ফেলতো। যারা আমাকে গুলিস্তান চত্বরে ফেলে যায় তারা ধরে নিয়েছিলো যে আমি মরেই গেছি। কিন্তু আমি মরিনি টের পেলে আমাকে আবার পাকড়াও করা হতো, সে ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। বাসা থেকে ইন্ডিয়ান পাহারা উঠিয়ে দেবার পর ওরা আরো কয়েকবার আমার পরিবারের উপর হামলা চালায়,আমার গাড়িটা নিয়ে যায় এবং

একদিন রাত- দুটোর সময় খবর দিয়ে এসে টাকা পয়সাও নিয়ে যায়। তখন ভয়ে আমার মেয়েরা প্রতিবেশীদের বাড়ীতে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

আর একটা রহস্য আমি এখনো বুঝতে পারিনি। আমি বলেছি পিঠে প্রচন্ড আঘাতে আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। স্বভাবতই এ রকম অবস্থায় মানুষের উপুড় হয়ে পড়ার কথা। অথচ জ্ঞান ফিরে এলে আমি দেখেছি যে আমি চিৎ হয়ে আছি। এর কারণ এই হতে পারে যে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরও ওরা আমার দেহের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। তাছাড়া আমার বাম পায়ের হাঁটুটা তখন থেকে একেবারে বিকল হয়ে আছে। বিশ বছর পরও বাম পায়ে ভর দিয়ে আমি কোনো কিছু করতে পারি না।

আমার উপর হামলাকারীরা যে খুব পাকা লোক ছিলো সে সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই। শরীরের কোন জায়গায় আঘাত করলে মানুষকে সহজে ঘায়েল করা যায়, সেটা তারা জানতো। ওরা নিশ্চয়ই মনে করেছিলো যে মেরুদন্ডের উপর আঘাতের ফলে আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু মৃত্যুর আগে আমি অসম্ভব যন্ত্রণা ভোগ করবো। এর মধ্যে একটা প্রতিশোধের ব্যাপারও ছিলো। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা আর্মির গুলিতে আহত হয়ে চারদিন হাসপাতালে ছিলেন। তখন তার শরীরের নিম্নাংশ সম্পূর্ণ অবশ। আমার মনে হয় এই মৃত্যুর প্রতিশোধ আমার উপর নেওয়া হয়। এবং আমার মৃত্যু যাতে একই প্রণালীতে হয়, হামলাকারীরা প্ল্যান করে তার ব্যবস্থা করেছিলো।

যাক, বিশে ডিসেম্বর যখন আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই তখন আমার শরীরের ক্ষতি কতোটা হয়েছে তা বুঝবার উপায় আমার ছিলো না। এই যে বাম পা অচল হওয়ার কথা বললাম, এটা তখন টের পাচ্ছিলাম না। আমার দু' কাঁধে এখনো অসম্ভব ব্যথা অনুভব করি। সে ব্যথাও তখন বোধ করিনি। কারণ শরীরের নিম্নাংশ তো একেবারেই অবশ হয়েছিলো। উপরের অংশেও বোধ শক্তি বিশেষ ছিলো না।

হাসপাতালে আমার বুক এক্সরে করে দেখা হয়। কিন্তু পা এক্সরে করার কথা বলিনি। কারণ পায়ে কি হয়েছে সেটা মোটেই বুঝতে পারছিলাম না। হাসপাতাল বেডে ডাক্তাররা যখন আমাকে দেখতে আসেন, তারা আমাকে পা দু'টো উঁচু করতে বললেন। ডান পা অনেকটা উঁচু করতে পারলাম কিন্তু বাম পা মনে হলো অসম্ভব ভারি হয়ে গেছে। ওটা বিছানা থেকে ইঞ্চি দুয়ের বেশি উঁচু করা গেলো না।

সত্যিকারের যন্ত্রণা শুরু হলো যখন দেখলাম যে কিডনির উপর আঘাতের ফলে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। উনিশ তারিখের তিনটার পর থেকে আর কোনো প্রস্রাব হয়নি। তখন বহু চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছিলাম না। ডাক্তাররা বললেন যে ৩৬ ঘন্টা যদি প্রস্রাব বন্ধ হয়ে থাকে তারা ক্যাথিটার ব্যবহার করবেন। আমি আরো ঘাবড়ে গেলাম। শুনেছিলাম, ক্যাথিটারে নাকি অনেক যন্ত্রণা হয়। যাক শেষ পর্যন্ত ক্যাথিটার প্রয়োগ করতে হয়নি। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করতে আমার তিন বছর সময় লাগে। এরমধ্যে প্রচুর জ্বালা- যন্ত্রণা ভোগ করেছি।

হাসপাতালে আমাকে রোজই পেনিসিলিন ইনজেকশন দেওয়া হতো। আর প্রস্রাবের জন্য এক প্রকার মিক্সচার খেতে দিয়েছিলো। এটায় কিছুটা উপকার পেয়েছি। কিন্তু মাঝে মাঝে মূত্রাশয়ের মধ্যে প্রচন্ড যন্ত্রণা অনুভব করতাম। হাসপাতাল থেকে সুস্থ্য হয়ে ফিরতে পারবে, সে আশা করিনি। বলা নিষ্প্রয়োজন আমি একেবারেই চলৎশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিলাম। দু'জন লোক ধরে আমাকে বাথরুমে নিয়ে যেতো। বিছানায় এপাশ ওপাশ করার শক্তি ছিলো না। বোধ হতো, দুটো পায়ের সঙ্গেই ভারি ওজনের কিছু বাঁধা। রক্ত চলাচলের অভাবে এ অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

ডিসেম্বরের ২০ থেকে ১৫- ১৬ জানুয়ারী পর্যন্ত বিছানা থেকে উঠবার কথা ভাবতে পারিনি। এরপর লাঠি ভর দিয়ে অন্য লোকের সাহায্যে আস্তে আস্তে হাঁটা শিখতে হয়। ধরে না রাখলে পড়ে যেতাম। দুপায়ের উপর দাঁড়িয়ে মানুষ যেভাবে দাঁড়ায় সে শক্তি আমার ছিলো না।

হাসপাতালে আমার বাসার লোকজন রোজই দেখতে আসতো। আরো এসেছিলো আমার দু' খালাতো বোন। কিন্তু আর কেউ ভয়ে এদিকে পা বাড়াতো না। পুরানো সহকর্মীদের মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ম্যাথামেটিকস ডিপার্টমেন্টের ডক্টর আজিজুল হক একদিন এসেছিলেন। আরেক দিন প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান। ইনি ছিলেন কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আমার সহকর্মী।

মাঝে মাঝে দু' একজন গেরিলা হঠাৎ করে আমার ক্যাবিনে এসে ঢুকে পড়তো। বলতো আমার কথা তারা শুনেছে তাই চেহারা দেখতে এসেছে। একদিন আসে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের পুরানো এক ছাত্র। সেও গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। সে বললো, স্যার আপনাকে হত্যা করার ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছিলো। আমি একদিন আপনার বাসা ভালো করে দেখে আসি এবং কোন কামরায় আপনার শোবার জায়গা তাও লক্ষ্য করে আসি। তবে শেষ পর্যন্ত স্থির করি যে যুদ্ধ শেষ হলেই যা করার দরকার তা করবো। এই ছেলেটিকে আমি

বললাম, তোমরা বাংলাদেশ কায়েম করেছো, ভালো কথা, এখন অন্তত দেশে স্বস্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো।

আরেক দিনের কথা মনে আছে। ভয়ঙ্কর চেহারার এক ব্যক্তি হুড়মুড় করে আমার কেবিনে ঢুকে পড়ে। মুখে তার বড় বড় দাড়ি। মাথায় লম্বা চুল, হাতে বন্দুক। মনে হচ্ছিলো ও তখনই আমাকে গুলি করবে। লোকটা দাঁড়িয়ে আমাকে বললো, আপনার চেহারাটা এক নজর দেখতে এসেছি। এসব কিছুই ঘটে ইন্ডিয়ান আর্মির পাহারা উঠে যাবার। যে সাতদিন ইন্ডিয়ান আর্মির লোক আমাকে পাহারা দেয় তদ্দিন বাইরের কোন অপরিচিত লোককে আসতে দেওয়া হয়নি। সাতদিন পর স্থানীয় পুলিশের উপর দায়িত্ব দিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির লোকেরা সরে যায়। তখন থেকে শুরু হয় নানা উপদ্রব।

ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে অনেক কথা শুনতাম। তারা প্রায়ই বলতো, তুম লোগ ইয়ে বাগাওয়াত কিউ কিয়া? অর্থাৎ তোমরা এই বিদ্রোহ করলে কেনো? তোমাদের দেশে যা দেখলাম, এ তো ইন্ডিয়াতে নেই। তোমাদের ঘরে ঘরে টিভি, তোমাদের ইউনিভার্সিটি লেকচারারের গাড়ি এসব বিলাসের কথা আমরা ইন্ডিয়াতে ভাবতে পারি না। অথচ তোমরা এখানে এসব থাকা সত্ত্বে মুসলমান মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ করে এতোসব কান্ড ঘটিয়েছো। আমাদের তো আসতে হয়েছে ইন্দিরা মাইজির হুকুমে। আমরা সাধারণ সৈনিক, উপর থেকে যে হুকুম আসবে তা মানতেই হবে। ওরা, আরো বলতো, তোমাদের সিপাহীরা একেবারে অপদার্থ। একজন ইন্ডিয়ান সৈনিক দশটা পাকিস্তানী সৈনিকের সমান। এ কথা শুনে আমি মনে মনে হেসেছিলাম। কারণ ঠিক উল্টো রকমের আস্ফালনই পাকিস্তানের অফিসারদের কাছে আগে শুনেছিলাম।

ইন্ডিয়ান আর্মির লোকজন আমার সঙ্গে যে সদ্ব্যবহার করে তার কারণ এই নয় যে আমার মতো মুজিব বিরোধী একজন লোককে সাহায্য করতে তারা খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলো। মানধিক কারণ ছাড়া এই ব্যবহারের প্রধান কারণ ছিলো এই যে ১৬ই ডিসেম্বরের পর ইন্ডিয়ান অধিকৃত এ অঞ্চলে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর অত্যাচার হলে সে জন্য ইন্ডিয়ান আর্মিরই দূর্নাম হবে। তাছাড়া দেশ জয় করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অকারণে বেসামরিক লোকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কোন যৌক্তিকতা তাদের কাছে ছিল না।

অনুরূপ কারণে ১৬ই ডিসেম্বরের পর ইন্ডিয়ান আর্মি অনেক বিহারীকে গেরিলাদের হাত থেকে রক্ষা করে। একথাও শুনেছি যে হিন্দীভাষী ইন্ডিয়ান সৈন্যরা যখন দেখতে পায় যে উর্দুভাষী বিহারীদের উপর গেরিলারা নির্মম

অত্যাচার চালিয়েছে তখন বিহারীদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের প্রাণ রক্ষার কাজে এগিয়ে আসে। ৯ই জানুয়ারী পর্যন্ত আমি ৯ নাম্বার ক্যাবিনে ছিলাম। সেদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ করে আমাকে জানানো হলো যে আমাকে অন্য ক্যাবিনে সরে যেতে হবে। এখানে আসবেন এক মিনিস্টার। রাত্রের মধ্যেই স্ট্রেচারে করে আমাকে উনিশ নাম্বার ক্যাবিনে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালের প্রায় অপর প্রান্তে। আর ৯ নাম্বার ক্যাবিনে আসেন খন্দকার মুশতাক আহমদ। শুনলাম, আসলে তিনি অসুস্থ্য নন, তবে নতুন সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে বলে কুটনৈতিক অসুস্থতার আশ্রয় নিয়েছেন।

১৯ নম্বর ক্যাবিন

১৯ নম্বর ক্যাবিনে এসে শুনলাম যে আগামীকাল ১০ই জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরছেন। আমার এক আত্মীয় জনাব আবদুল মুঈদ (খান বাহাদুর আব্দুল মোমিন সাহেবের কনিষ্ঠ পূত্র), আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে গেলেন যে দেখবে ভাই শেখ মুজিব ফিরে এসে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবে এবং সবাইকে নিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলবে। আমি কিন্তু এ কথায় আশ্বস্ত হতে পারিনি। তবুও মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগ্রত হলো যে ১৬ই ডিসেম্বর থেকে যেভাবে অরাজকতা চলছে, তার বোধ হয় অবসান ঘটবে। বাসা থেকে একটা রেডিও আনার ব্যবস্থা করলাম যাতে শেখ মুজিবের আগমন বার্তা সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাই।

কাগজে দেখেছিলাম যে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করার পর শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁকে তখন লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বৃটিশ বিমান বাহিনীর বিমানে দিল্লী হয়ে ঢাকা আসেন। দিল্লীতে কয়েক ঘন্টা ছিলেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, একটা সভায়ও বক্তৃতা করেন। লন্ডনে তাকে রাখা হয়েছিলো ক্লারিজেস হোটেলে। এটা লন্ডনের সর্বোত্তম হোটেলগুলোর একটি। রাষ্ট্র প্রধানদের সাধারণত এ হোটেলে রাখা হয়। লন্ডন অবস্থানের সময় শেখ মুজিব এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে দাবী করেন যে বাংলাদেশে যুদ্ধে ৩ মিলিয়ন অর্থাৎ ৩০ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে। এই আজগুবি সংখ্যার কথা আজো বাংলাদেশ সরকার এবং এখানকার রাজনৈতিক দলগুলি বলে বেড়াচ্ছে। নয় মাসের যুদ্ধে যেখানে কোন ভারি কামান ব্যবহার হয়নি, প্রচন্ড কোনো সংঘর্ষ হয়নি সেখানে ৩০ লক্ষ লোক কিভাবে নিহত হলো,

তা কেউ বুঝাতে পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও রাশিয়াকে বাদ দিলে অন্যান্য শক্তির মধ্যে মৃতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ হবে না। কেউ কেউ বলে যে শেখ মুজিব তিন লাখের অর্থে ৩ মিলিয়ন বলেছিলেন। মিলিয়ন এবং লাখের তফাত তাঁর জানা ছিলো না। অনেক প্রবীণ ব্যক্তির কাছে শুনেছি যে মৃতের সংখ্যা দশ হাজারের বেশী নয়। কেউ কেউ বলে আসল সংখ্যা আরো কম। তবে এটা যে কোন রূপেই ৩০ লক্ষ হতে পারে না, সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তবুও এই ৩০ লক্ষের কথা বলে বাংলাদেশের তরুণদের এখনো উত্তেজিত করা হয়। আর এই ভাবপ্রবণ দেশে এর বিরোধিতা করতে গেলেই স্বাধীনতার দুশমন বলে চিহ্নিত হতে হয়। চিন্তা- ভাবনা বা যুক্তি- তর্কের অবকাশ এখানে আছে বলে কেউ মনে করে না । বাস্তবিক পক্ষে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ন' মাসে ক'জন নিহত হয় তার কোনো জরিপ হয়নি। একদিকে যেমন বলা হলো যে পাকিস্তান আর্মি ৩০ লক্ষ বাঙালীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, অন্যদিকে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে ৩ লক্ষ নারীর ইজ্জতও তারা নষ্ট করেছে। এবং প্রথম প্রথম এসব নির্যাতিত মেয়েদের পুনর্বাসন এবং বিবাহের ব্যবস্থা করা হবে এ আশ্বাস দেওয়া হয়। এসব বীরাঙ্গনাকে গ্রহণ করতে তরুণরা যাতে ইতস্ততঃ না করে সে পরামর্শ তারা পেয়েছিলো। একপর্যায়ে এদের জন্য ঢাকায় এক আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়। তখন শুনেছি শত খোঁজখবর করেও এ রকম বীরাঙ্গনার সন্ধান পাওয়া যায়নি। দেশের বিভিন্ন পতিতালয় থেকে দু'একজন মেয়েকে এখানে হাজির করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত যখন দেখা গেলো যে এরকম বীরাঙ্গনার সংখ্যা একশতেও উঠছে না তখন চুপচাপ করে এ প্রকল্প পরিত্যাগ করা হয়। এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনিনি। তবে শেখ মুজিবের আমলে যেমন এখনও তেমন পঁচিশে মার্চ বা ১৬ই ডিসেম্বর সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে তিন লক্ষ মা বোনের নির্যাতনের উল্লেখ থাকে।

আর্মির হাতে কেউ মারা পড়েনি বা কোন মেয়ে নির্যাতিত হয়নি, এ রকম উদ্ভট দাবী আমি করছি না। কিন্তু কথা হচ্ছে সংখ্যা নিয়ে। গ্রামে গ্রামে সুষ্ঠুভাবে জরিপ করলে নিহত এবং নির্যাতিতের সঠিক সংখ্যা অবশ্যই বের করা যেত। কিন্তু সরকার জরিপ করার সাহস পায়নি। কারণ কোনো জরিপ করলে তার মধ্যে নাম ধাম উল্লেখ করে ত্রিশ লাখের প্রমাণ পাওয়া যেতো না। ছয় বছর স্থায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বোমায় বৃটেনে ষাট হাজার নরনারী নিহত হয়। জার্মানীতে বেসামরিক লোকজন যারা মিত্র শক্তির বিমান অক্রমণে নিহত হয়েছিলো তাদের সংখ্যা তিন লাখ। এসব আমার মনগড়া কথা নয়। বইপত্রে যে সমস্ত তথ্য সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছে তার মধ্যেই এসব হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্রশ্ন

ওঠে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতো প্রলয়ংকরী একটা দুর্যোগে যেখানে মৃতের সংখ্যা এই সেখানে বাংলাদেশের গৃহযুদ্ধে ত্রিশ লাখ লোক নিহত হলো কি রূপে? আমি আগেই বলেছি যে এদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বিশেষ করে যারা পাকিস্তান বিরোধী কোনো ভূমিকায় জড়িত ছিলো তারা এ সম্বন্ধে কোনো পুনর্বিচার করতে রাজি নয়। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে স্বীকার করেন যে ত্রিশ লাখের কথা একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ এর বিরোধিতা করতে এখনো সাহস পান না।

যে সমস্ত তরুণ- তরুণী ইতিহাস জানে না, '৭১ সালে যাদের জন্মই হয়নি বা তখন যারা শৈশবাস্থা অতিক্রম করেনি তারা ধরে নিয়েছে যে ত্রিশ লক্ষ এবং তিন লক্ষ হিসাবের মধ্যে কোনো অতিরঞ্জন নেই। এর ফলে বিশ বছর পরও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারছে না। কারণ স্বাভাবিক করার কথা বললেই একদল লোক এদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঐ ত্রিশ লক্ষ ও তিন লক্ষের কথা। আমরা এখনো একাত্তর সালের গৃহযুদ্ধের ফলে যে বিষবাষ্প সৃষ্টি হয়েছিলো তার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারিনি। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে জার্মানী এবং জাপানের সঙ্গে মিত্র শক্তিকে লড়াই করতে হয় তারা উভয়েই পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার মিত্র। যুদ্ধের পর যে সমস্ত চুক্তি হয় তাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিলো যে জার্মানী এবং জাপানকে ভবিষ্যতে সমরোপযোগী বাহিনী গঠন করতে দেওয়া হবে না। অথচ এখন আমেরিকাই জার্মানী এবং জাপানকে নিন্দা করছে এই বলে যে একানব্বই সালের মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে তারা সৈন্য পাঠাতে রাজী হয়নি কেনো?

কথা হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চিরশত্রু ও চিরমিত্র বলে কোন কথা নেই। এর ব্যতিক্রম দেখছি শুধু বাংলাদেশে। পাকিস্তানের প্রতি হিংসা এবং বিদ্বেষ এক শ্রেণীর মধ্যে একটা কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়েছে, সে কথা আমি আগে একবার বলেছি। এর ফলে দেশের কি ক্ষতি হচ্ছে তা এরা ভাবছে না।

১০ই জানুয়ারী রেডিও খুলে শেখ মুজিবের ঢাকা আগমনের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। সংবাদ পরিবেশক বলতে লাগলেন কয়েক লক্ষ লোক নাকি তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য এয়ারপোর্টে জমায়েত হয়েছিলো। এদের গলার আওয়াজও মাঝে মাঝে শোনানো হচ্ছিলো। শেখ মুজিবকে এয়ারপোর্ট থেকে মিছিল করে সোজা রমনা রেসকোর্সে নিয়ে আসা হয়। এখানেও লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিলো বলে শুনেছি। শেখ মুজিব আবেগজড়িত কণ্ঠে অনেক কথা বললেন। বাঙালী জাতির স্বাধীনতার কথা বললেন। আর বললেন ন'মাসে জাতির

উপর যে অত্যাচার করা হয় তার কথা। কিন্তু কোথায়ও কোনো ক্ষমার কথা ছিলো না। ছিলো তথাকথিত দালালদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা, বিশেষ করে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে মামলায় যারা সাক্ষী দিয়েছে তাদের শাস্তি দেওয়ার কথা।

আমি একটু নিরাশ হলাম। শেখ মুজিবের অবর্তমানে তাঁর দলীয় লোকেরা যে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিলো তার ক্ষান্ত হওয়ার আশু সম্ভাবনা আমি দেখতে পেলাম না। শেখ মুজিব যদ্দিন পাকিস্তানে আটক ছিলেন ততদিন সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংরাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তাজুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী। এঁরা শেখ মুজিবকে কোলকাতায় বসেই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন। ২০ শে ডিসেম্বর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহমদ এবং অন্য মন্ত্রীরা ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। তার অর্থ যে অন্ততঃ ১৬ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত এ অঞ্চলটি সরাসরি ইন্ডিয়ার অধীনে ছিলো। আইনের দিক থেকেও সেটা ঢাকা দেওয়া যেতো না। আরো একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। ১৬ তারিখে পাকিস্তান আর্মির আত্মসমর্পণের দলিলেও বাংলাদেশ সরকারের কোন স্বাক্ষর নেই। কোলকাতা থেকে দাবী করা হতো যে বিদ্রোহীরা কর্ণেল ওসমানীর নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আত্মসমর্পণের দলিলে কর্ণেল ওসমানীরও কোনো স্বাক্ষর ছিলো না। এটা ছিলো নিতান্তভাবে ইন্ডিয়া- পাকিস্তানের যুদ্ধজনিত একটা ঘটনা মাত্র।

২০শে ডিসেম্বর আমাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তখন দেশে কি হচ্ছে বা আমার বাসার লোকজনই বা কিভাবে দিন কাটাচ্ছে সে সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশ করার শক্তি আমার ছিলো না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা দেহে এবং দেহের অভ্যন্তরেও এতো যন্ত্রণায় ভুগছিলাম যে তিন চার দিন শুধু চুপ করে পড়ে থেকেছি। বাসার লোকজনও আমাকে কিছু বলেনি। এদের উপর যে অত্যাচার হয়েছিলো সে কাহিনী শুনেছি অনেক পরে। কিন্তু সেটা এখানে বিবৃত করা দরকার।

উনিশ তারিখে যেদিন গেরিলারা আমাকে পাকড়াও করতে আসে, তারা প্রথমেই বাড়ীর চাকর- চাকরাণীকে বন্দুক উঁচিয়ে সাবধান করে দেয়, তারা যেনো টু শব্দটি না করে। তারপর ওরা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। সামনে আমার স্ত্রী এবং মেয়েদের পেয়ে তাদের চুল ধরে লাথি মেরে সরিয়ে দেয়। বয়সে যারা একেবারে ছোট তারাও রেহাই পায়নি। বড় মেয়ে উপরের কামরায় আমার সঙ্গেই ছিলো, সে কথা আগে উল্লেখ করেছি। মেঝো মেয়ের বয়স তখন সতেরো। তার উপরই বেশী জুলুম হয়। আমার কামরায় যখন গেরিলারা উঠে আসে তখন আমার বড় মেয়ে

ছাড়াও দশ বছরের কাজের মেয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলো। তার নাম ছিলো হোসনে আরা। সে চিৎকার করতে করতে কতক্ষণ গেরিলাদের জিপের পেছনে দৌড়াতে থাকে। তার গায়েও চড় চাপ্পড় লাগে। বাসার এক চাকর যার বয়স তখন চব্বিশ- পচিঁশ সেও প্রচন্ড মার খায়। আরো শুনেছি যে গেরিলাদের আমার বাসার সন্ধান দিয়েছিলো নাজিমউদ্দিন রোডের আওয়ামী লীগ শাখার এক ছোকরা। সে নিজে অবশ্য গেরিলাদের সঙ্গে বাসায় আসেনি, খুব সম্ভব চক্ষু লজ্জায়। কারণ এদের পরিবারকে আমরা বহুদিন যাবত চিনতাম। এবং এরা নাকি এখনো আওয়ামী লীগের প্রতি অনুগত। আমি এ ঘটনা উল্লেখ করছি এই কারণে যে ন'মাসের গৃহযুদ্ধের ফলে দেশে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে কে কোন দলের এ প্রশ্নটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। পুরানো পরিচয় বন্ধুত্ব সবই যেনো মুছে গিয়েছিলো। একদিকে ছিলো শেখ মুজিবের সমর্থকেরা, অন্যদিকে আমার মতো যারা পাকিস্তানে বিশ্বাস করতো তারা।

ডিসেম্বরের শেষে আমি আমার বেতনের চেকের জন্য ইউনিভার্সিটিতে লোক পাঠাই। ওরা আমাকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত বেতন দিয়ে জানিয়ে দেয় যে আমার চাকরি নেই। এই আদেশ কখন জারী করা হলো তা আমাকে জানানো হয়নি। এবং আমার যদ্দুর মনে পড়ছে জানুয়ারীর আগে ভাইস চান্সেলরের পদে কাউকে নিযুক্ত করা হয়নি। খুব সম্ভব রেজিস্টার নিজের দায়িত্বে আমাকে চাকরি থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। প্রথমে জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী এসে আবার ভাইস চান্সেলরের পদ অধিকার করেন। তিনি ১৫ই মার্চ থেকে লিখিতভাবে পদত্যাগ করেছিলেন, সে কথা আগে বলেছি। কিন্তু এখন যেভাবে তিনি এসে আবার ঐ চাকরিতে বহাল হলেন তাতে তাঁর পদত্যাগের কোনো উল্লেখ ছিলো না, যেনো বেআইনীভাবে ন'মাসে তাঁকে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো। তবে তিনি ডিসেম্বরের শেষেই এসেছিলেন বা জানুয়ারীর প্রথম দিকে, সে কথা আমার স্মরণ নেই। যদ্দুর মনে পড়ে এটা জানুয়ারীর প্রথম দিকেই হবে। শেখ মুজিবুর রহমান দেশে প্রত্যাবর্তন করে স্থির করেন যে তিনি আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে নিজে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করবেন।

মুজাফফর চৌধুরী

এরপর পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রফেসর মুজাফফর আহমদ চৌধুরীকে ভাইস চান্সেলর নিযুক্ত করা হয়। ইনি ছিলেন ভারত- প্রত্যাগত। আমার মনে আছে

ষাটের দশকে ইনি 'সোনার বাংলা' পাকিস্তানে কিভাবে শ্মশানে পরিণত হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইউনিভার্সিটিতে যে কয়েকজন শিক্ষক আওয়ামী লীগ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন মুজাফফর আহমদ তাদেরই একজন। যদিও কর্মজীবনে একাত্তরের আগে তাঁর সঙ্গে আমার সদ্ভাব ছিলো, এখন পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি আমাকে কতটা ঘৃণা করেন সেটা বুঝলাম আমার পরিবারের প্রতি তাঁর ব্যবহারে। আমি আগে বলেছি যে ১৫ই ডিসেম্বর আমরা তড়িঘড়ি করে কাপড়ের দু'টো সুটকেস নিয়ে ভাইস চান্সেলরের বাসা থেকে পুরনো ঢাকার বাসায় চলে এসেছিলাম। আমার বই, আসবাবপত্র, রান্নাঘরের সরঞ্জাম, বিছানার চাদর বালিশ, হাড়ি ডেকচি, শিলপাটা সবই ফেলে এসেছিলাম। মুজাফফর আহমদ চৌধুরী যখন ভাইস চান্সেলরের বাসায় পাকাপাকিভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন, আমার মেয়েরা আমাদের মালপত্রগুলো উদ্ধার করতে যায়। প্রথম দু'দিন ওদের গেট থেকেই বিদায় দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত যখন ওরা ভিতরে যেতে অনুমতি পায় তখন ওদের বলা হয় যে আমাদের মালপত্র ওখানে কিছুই নেই। বাসায় যা আছে তা ইউনিভার্সিটির সম্পত্তি। সেটা কিছুতেই দেওয়া যাবে না। আমার ব্যক্তিগত বই দু' কামরায় সাজানো ছিলো। এক কামরার কিছু বই মেয়েরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। অন্য কামরায় ওদের যেতেই দেওয়া হয়নি। ফলে ছাত্র জীবন থেকে সংগৃহীত বহু মূল্যবান বইপত্র আমাকে হারাতে হয়েছে। যেসব জিনিস মেয়েদের চোখের সামনে পড়ে এবং যেগুলি তারা চিনতে পারছিলো সেগুলিও তাদের স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে ছিল আমাদের পুরানো শিল পাটা এবং রান্না ঘরের হাড়িপাতিল। আমার বড় মেয়ে বিয়েতে একটা সুন্দর কার্পেট উপহার পেয়েছিলো, সেটা দেখতে পেয়ে মেয়েরা যখন বলে, ওটা বড় আপার কার্পেট, তখন ওদের এই বলে ধমকে দেওয়া হয় যে ওরা যেনো ফাঁকি দিয়ে নতুন ভাইস চান্সেলরের জিনিসপত্র হরণ করার চেষ্টা না করে।

আমাদের ব্যবহৃত প্লেট, পেয়ালা, চায়ের সেট, ছুরি- কাঁটা সবই এভাবে খোয়াতে হয়। আমি অনেক পরে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাসায় এসে এই ক্ষতির কথা শুনি। আশ্চর্য হয়ে ভাবি ভাইস চান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তির কাছে তো এই নোংরামী আশা করা যেতো না। কিন্তু একাত্তরে আমাদের সমস্ত মূল্যবোধ কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিলো।

এদিকে আমার বাসা থেকে আমার গাড়িটাও গেরিলারা নিয়ে যায়। এটা ছিলো একটা ছোট স্কোডা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি, ৬৭ সালে কিনেছিলাম। আমি

শুনেছি এই গাড়িতে করে অপহরণকারীরা ডাকাতিতে বের হতো। আমাদের ফ্যামিলি এতে আরো শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কারণ শেষ পর্যন্ত ডাকাতির অপরাধে গাড়ীর মালিকই অভিযুক্ত হতে পারতো। গাড়ীটাকে ওরা যখন প্রায় অচল করে ফেলেছে তখন খোঁজ পাওয়া যায় যে ওটা একটা থানায় পড়ে আছে। সেখান থেকে অনেক তদবির করে গাড়ীটা ফেরৎ আনা হয়। এবং এটাকে আবার চালু করতে বেশ কিছু পয়সা খরচ হয়।

আমি বলেছি যে উনিশে ডিসেম্বর আমাকে যখন ওরা ধরে নিয়ে যায় তখন আমাদের বাসায় আমার ফুপাতো ভাই সৈয়দ কামরুল আহসান ছিলেন। তিনি সচরাচর থাকতেন হবিগঞ্জে। রাজনীতি করতেন। নেজামে ইসলাম পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ষাটের দশকে একবার প্রাদেশিক এসেমব্লিতে নির্বাচিত হন এবং পরে ন্যাশনাল এসেমব্লিরও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একাত্তরের অক্টোবরের দিকে আওয়ামী লীগের সিটে ইয়াহিয়া খান যে বাই ইলেকশনের হুকুম দিয়েছিলেন তাতে তিনি আবারও ন্যাশনাল এসেমব্লির সদস্য পদে নির্বাচিত হন। পিন্ডিতে যাবার পথে ঢাকা এসেছিলেন। কিন্তু তেসরা ডিসেম্বরে ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় তাঁর যাওয়া হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারী হয় হবিগঞ্জে। হবিগঞ্জের পুলিশের নির্দেশ মতো তাঁকে খুঁজতে ঢাকার পুলিশ তার পৈত্রিক বাসা হাসিনা মঞ্জিলে যায়। কিন্তু তিনি ছিলেন আমাদের বাসায় জোহরা মঞ্জিলে, রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে। পুলিশ যখন তাঁকে না পেয়ে ফেরত যাচ্ছে তখন তার আপন মেজো ভাইয়ের মেয়েরা বলে দেয় যে উনি আছেন বোনের বাসায় - জোহরা মঞ্জিলে। আমাদের বাসায় তল্লাশি শুরু হয়। এখানে তাঁকে সরু একটা গোলাঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। পুলিশ আবার যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল তখন ঐ মেয়েরাই পুলিশকে জানিয়ে দেয় ভালো করে গোলা ঘরে খুঁজে দেখতে। দ্বিতীয় বারের তল্লশিতে তিনি ধরা পড়েন। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীরা যাদের সঙ্গে কামরুল আহসানের কোনো পূর্ব শত্রুতা ছিলো না, তারাই এখন নিজেদের বাংলাদেশ প্রেমিক প্রমাণ করার লোভে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলো। এ রকম ঘটনা আরো হাজার হাজার হয়েছে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছে নিজের প্রাণ বাঁচাতে এবং প্রত্যেকে মনে করেছে যে প্রাণ বাঁচাবার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে অন্য কাউকে গেরিলাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া।

এরপর হামলা হয় সৈয়দ কামরুল আহসানের ছোট ভাই এডভোকেট সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসানের উপর। সেও নেজামে ইসলামী পার্টিতে ছিলো। থাকতো হাসিনা মঞ্জিলেই। প্রথম দিন যখন তার তল্লাশি শুরু হয়, সে এসে আমাদের

বাসায় আশ্রয় নেয়। আগের মতো হাসিনা মঞ্জিল থেকে জোহরা মঞ্জিলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মঞ্জুর তখন দেওয়াল টপকে পেছন দিয়ে সরে যায়। কয়েকদিন পাশের দু'একটি বাসায় লুকিয়ে থাকে। এরা আসলে আত্মীয় না হলেও তাকে আশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। তারপর যখন মঞ্জুর টের পায় যে এভাবে আত্মগোপন করে থাকলে তাকে ধরতে পারলেই গেরিলারা গুলি করে মারবে তখন সে স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে সারেন্ডার করে।

সৈয়দ কামরুল আহসান আমি হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই উনিশ দিন পর রিট পিটিশন করে জেল থেকে খালাস পেয়েছিলেন এবং তারপর দু'বছর ঢাকায় থাকতে বাধ্য হন। মাঝে মাঝে গোপনে আমাদের বাসায় আসতেন। হবিগঞ্জে যেতে সাহস পেতেন না এই ভয়ে যে পুলিশ ছেড়ে দিলেও গেরিলারা তাঁকে রেহাই দেবে না।

মঞ্জুরকে ছ'মাসের উপর জেলে কাটাতে হয়েছিলো। আমি জেলে যেয়ে শুনেছি যে সেও তখন জেলে। তারপর রিট পিটিশন করে সে উদ্ধার পায়, বন্দী অবস্থায় তার ফ্যামিলিতে একটি ট্রাজেডি ঘটে। তার চৌদ্দ বছরের বড় মেয়েটি টাইফয়েডে ভুগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

আমরা যারা দালাল বলে চিহ্নিত হয়েছিলাম, ভয়ে এবং আতঙ্কে কোন আত্মীয়- স্বজন বা বন্ধু- বান্ধব আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতো না। আমার এক সহপাঠীর কথা শুনেছি। তিনি কয়েক বছর নাজিমউদ্দিন রোড দিয়ে যাতায়াত করতেন না। পাছে আমার বাসার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয়।

এর ব্যতিক্রম পেয়েছি দু'টি ক্ষেত্রে। আমার এক খালাতো বোনের ফ্যামিলি প্রায়ই এসে হাসপাতালে খোঁজ- খবর করতো। ভগ্নিপতি সৈয়দ আহমদ রুমী ছিলেন আদর্শবাদী লোক। ছেলেমেয়েরা যদিও পুরাপুরি তার সে আদর্শে বিশ্বাস করতো না, আমার সঙ্গে ব্যবহারে তারা কখনো সে আভাস দেয়নি। তবে একদিন এই ফ্যামিলির বড় ছেলে লুলু আমাকে অবাক করে দিলো এক প্রশ্ন করে। জিজ্ঞাসা করলো, মামা, এ কথা কি সত্য যে আপনি যখন ভাইস চান্সেলর তখন আপনি মেয়েদের হল থেকে ক্যান্টনমেন্টে মেয়ে সাপ্লাই করতেন? আমি তাকে বললাম, লুলু, তুমি ছোটকাল থেকে আমাকে চেনো আর তোমার মায়ের সঙ্গে আমার, পরিচয় আমার জন্মের পর থেকেই। তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো যে ঐরকম অপকর্ম আমার দ্বারা সম্ভব? লুলু একটু থমকে গেলো। বললো, না মামা, আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এতো লোকে কথাটা আমার কানে দিয়েছে যে ভাবলাম আপনাকে সাহস করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবো।

ব্যাপার হলো যে আমরা যারা বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করিনি তাদের বিরুদ্ধে সব রকম অপবাদ প্রচার করা হয়। মুজাফফর আহমদ চৌধুরী ইউনিভার্সিটির লিগ্যাল এডভাইজারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমার বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের মামলা রুজু করতে। ঘটনাচক্রে তখন লিগ্যাল এডভাইজার ছিলেন আমার স্কুল জীবনের গৃহশিক্ষক মোহাম্মদ হোসেন। তিনি নিজে মঞ্জুর আহসানকে বলেছেন যে মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর প্রস্তাব তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন যে, আমি সাজ্জাদ কে ছোটকাল থেকেই চিনি। সে তহবিল তছরুপ করবে এ কথা আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই। সত্তর বৎসর বয়স্ক গভর্নর মালেকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও ছিলো। খাজা খায়ের উদ্দিন, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী এঁদের বলা হতো খুনী, তাঁরা নাকি নিজেরা অর্ডার দিয়ে বহু লোককে খুন করিয়েছেন।

অন্য যে এক ব্যক্তি সেই দুর্যাগের সময় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো সে ছিলো রাজশাহী ইউনিভার্সিটির এক হলের পিয়ন। নাম মোক্তার হোসেন। এর কথা আগে উল্লেখ করেছি। ছেলেটি ঢাকায় আমাদের বাসায়ই মানুষ হয়। বড় হলে বিয়ে দিয়ে রাজশাহীতে ওকে একটা চাকরী দিয়েছিরাম। যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় সেও আমাদের বাড়ীতে প্রতিপালিত একটি এতিম মেয়ে। মোক্তার আমার খবর শুনে ছুটির একটা দরখাস্ত দিয়ে ঢাকা ছুটে আসে। এক মাস সে আমার কাছে হাসপাতালে ছিলো। চাকরীর পরওয়া করেনি। এক মাস বা দেড় মাস ছুটি মঞ্জুর হবে, সে রকম আশা ছিলো না, কিন্তু বলে কয়েও তাকে রাজশাহীতে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারিনি। আমি যখন একটু একটু করে হাঁটার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছি তখনই কেবল বুঝিয়ে শুনিয়ে ওকে রাজশাহীতে পাঠনো হয়।

এই গরীব ছেলেটির মহানুভবতা ভুলবার নয়। যখন আত্মীয়- স্বজন ভয়ে কাছে ভিড়তো না তখন সাহস করে এই ছেলেটি সুদূর রাজশাহী থেকে ছুটে এসে যে উদারতা দেখিয়েছিলো সে রকম উদাহরণ একাত্তর- বাহাত্তর সালে ছিলো খুব বিরল।

বাসায় চাকর- চাকরানী যারা ছিলো দু' একজন ছাড়া প্রায় সবাই ভয়ে পালিয়ে যায়। কারণ রাস্তাঘাটে আওয়ামী লীগের লোকেরা এদের নানা হুমকি দিতো। বাসা যখন প্রায় একেবারে খালি এবং একজন চাকর ছাড়া পুরুষ আর কেউ নেই তখন আমার স্ত্রীর অনুরোধে বরিশালের কয়েকটি ছেলেকে বাসার বৈঠকখানায় থাকতে দেওয়া হয়। এদের সঙ্গে পরিচয় বহুদিনের। আমার স্ত্রীকে

ওরা ফুপু বলতো। ওরা ছিলো চার ভাই। এরা পথেঘাটে নানা বিদ্রুপ ও হুমকির সম্মুখীন হতো।

একদিন রাত্রে বন্দুকধারী কয়েকজন গুন্ডা এসে হাজির হয়। তখনো বরিশালের ছেলেগুলি বাসায় আসেনি। পুরুষের মধ্যে আমাদের সেই পুরানো চাকর রহমান একা। গুন্ডারা জোর করে বাড়ীতে ঢুকে লুটপাট করবে। আমার স্ত্রী একা ওদের মোকাবেলা করছেন। রহমান সঙ্গে দাঁড়িয়ো হঠাৎ সে গুন্ডাদের একজনকে চিনে ফেলে। বলে ওঠে আপনি না আলী আহসান সাহেবের ছোট ভাই আলী রেজা সাহেবের ছেলের বন্ধু। আমি এখনই আপনার বন্ধুকে খবর দিচ্ছি। আচমকা এ কথা শুনে বন্দুকধারী ছেলেটি লজ্জা পেয়ে যায়। এবং তখন বাড়ী ছেড়ে চলে যায়।

এই যে ছেলেটির কথা বললাম একে আমিও চিনতাম। ওদের বাসা ছিলো নাজিমুদ্দিন রোড এবং হোসনী দালাল রোডের সংযোগ স্থলে। বাপ শিক্ষিত। ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষক আহসানুল হক এ বাড়ীতে বিয়ে করেন। ছেলেটিকে যখন প্রথম দেখি তখন এর বয়স বোধ হয় নয় দশ হবে। একাত্তর সালে সম্ভবত আঠারো উনিশ। এই বয়সের এবং এ রকম পরিবারের বহু ছেলে দেশ উদ্ধারের নামে গুন্ডামী ও ডাকাতি করে বেড়িয়েছে।

এরাই ১৬ই ডিসেম্বরের পর ঢাকা এবং অন্যান্য শহরের বহু বাড়ী দখল করে এবং কারখানা ফ্যাক্টরী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করায়ত্ত করে। একটা গল্প শুনেছি। এক গেরিলা ধানমন্ডি এলাকার এক বিরাট বাড়ী দখল করে তার ফ্যামিলিকে সেখানে নিয়ে আসে। বাপ ছিলেন ধর্মভীরু। তিনি যখন টের পান যে একেবারে বেআইনীভাবে বাড়ীর মালিককে তাড়িয়ে দিয়ে আসবাবপত্র সহ বাড়ীটা দখল করা হয়েছে তখন তিনি আপত্তি করতে থাকেন। ছেলে তাকে শুনিয়ে বলে আপনি সারাজীবন চাকরী করে আর তসবিহ টিপে এক কাঠা জমির মালিকও হতে পারেননি। আপনার পছন্দ না হলে আপনি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। অবশ্য বাপকে সে জন্য সত্যই তাড়িয়ে দিয়েছিলো কিনা তা শুনিনি। কিন্তু এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলো না।

বুভুক্ষু পঙ্গপালের মতো গেরিলারা এবং আওয়ামী লীগের লোক যারা দেশের ভিতরে চুপ করে ছিলো তারা পাকিস্তানবাদী এবং বিহারী বলে চিহ্নিত লোকদের বাড়ী ঘরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের জন্য কোনো আইন ছিলো না। দেশোদ্ধারের জন্য এরা পরিশ্রম করেছে তার পারিশ্রমিক স্বরূপ এদের অবাধে লুটপাট করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এর মধ্যে সরকারী অফিসাররাও ছিলেন।

তাঁরাও সুবিধা মতো বাড়ী- ঘর- সম্পত্তি দখল করেছেন। শুনেছি শেখ মুজিবুর রহমানের বন্ধু এক পুলিশ অফিসার রাজারবাগে কয়েক বিঘা জমি এ রকম করে দখল করেন। এই জমিটা ডায়াবেটিক সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ডাক্তার মোহাম্মদ ইবরাহিম ডায়াবেটিক হাসপাতাল করার জন্য সরকার থেকে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই এটা পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত সরকার ডাক্তার ইবরাহিমকে শাহবাগে এক খন্ড জমি দান করে। এখানেই বর্তমানে ডায়াবেটিক সেন্টার ও হাসপাতাল অবস্থিত।

ন' মাসে ব্যাংক লুটের ঘটনা কিছু কিছু ঘটেছে। কিন্তু এখন এটা হয়ে দাঁড়ায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শোনা যায়, এ রকম ঘটনার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের এক ছেলে জড়িত ছিলো। এ কথা বহু লোকের মুখে শুনেছি। তবে এর সত্যতা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব।

শেখ মুজিবুর রহমান দেশে এসেই প্রথমে ঘোষণা করেন যে প্রথম তিন বছর তিনি জাতিকে কোনো কিছুই দিতে পারবে না। এ সময়টা ব্যয়িত হবে পুনর্গঠনের কাজে। এবং তখন নানা আত্মত্যাগের জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি আরো দাবী করেন যে পাকিস্তান আর্মির আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেশে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিদেশীরা নির্বিঘ্নে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। এক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব জানান যে ঢাকার পরিস্থিতি নিউইয়র্কের চেয়েও নিরাপদ। রাত্রেও নাকি এখানে নির্ভয়ে লোকেরা রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে। অথচ হাসপাতালে শুয়ে রোজই শুনতাম এবং কাগজেও দেখতাম বিভিন্ন এলাকায় খুনের খবর। পাকিস্তানপন্থী এবং উর্দুভাষী বিহারী এ সময় বিনা বিচারে গেরিলাদের নিমর্মতার শিকার হয়েছে। বহু জায়গায় উন্মত্ত জনতা লোকজনকে ধরে দালালীর অভিযোগে সেখানেই হয় পিটিয়ে কিম্বা বন্দুকের গুলিতে কিম্বা দা দিয়ে মাথা কেটে শাস্তি দিয়েছে।

বাহাত্তরের জানুয়ারীর আরো দু'টি ঘটনা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। চারদিকে তখন বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং মুজিববাদের শ্লোগান। হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদ উঠে গেছে। শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র বাঙালী জাতির ত্রাণকর্তা এবং সেহেতু বাঙালীদের নিয়ে যেখানেই যা হচ্ছিলো তার তদারক ও বিচার করার দায়িত্ব যেনো তাঁর। আওয়ামী লীগের ছাত্র নেতা আ স ম আবদুর রব দাবী করেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সুভাষ বসুর রহস্যজনিত মৃত্যু সম্পর্কে একটি তদন্তে কমিশন গঠন করতে হবে। কারণ তিনি তো বাঙালী।

ছাব্বিশে জানুয়ারী ইন্ডিয়াতে যখন রিপাবলিক ডে বা প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয় তখন ইন্ডিয়ার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য এক ডেলিগেশন দিল্লী যায়। দেশবাসীকে বুঝানো হলো যে 'দখলদার' পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের পর কংগ্রেসের আদর্শের সঙ্গে আমাদের আর বিরোধ নেই। এই ডেলিগেশনে মন্ত্রীরাও কেউ কেউ ছিলেন।

নতুন সরকার আর এক কান্ড করে। যার ফলে নৈরাজ্য আরো বৃদ্ধি পায়। যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের মূলনীতি ছিলো চারটিঃ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সেহেতু সমাজতন্ত্রের নামে সব ব্যাংক, কর্পোরেশন, মিল ফ্যাক্টরী সরকারের আয়ত্তাধীনে আনা হয়। পুরাতন ম্যানেজার এবং ডিরেক্টরদের সরিয়ে আওয়ামী লীগের লোকজনকে ঐ সব বড় বড় পদে বসানো হল। এরা ছিলো একেবারেই অনভিজ্ঞ। নতুন ক্ষমতা পেয়ে এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারখানা বা মিলের মালপত্র যন্ত্রপাতি বিক্রয় করে রাতারাতি বড় লোক হওয়ার চেষ্টায় মেতে উঠে। শুনেছি যে এভাবে দেশের পাটের কল এবং টেক্সটাইল মিলগুলি প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়ে। পুরাতন মাত্রায় উৎপাদন চালিয়ে যাবার উদ্যোগতো ছিলোই না বরঞ্চ চাকরির খাতায় (payroll) বহু ভুয়া নাম বসিয়ে তাদের নামে টাকা আত্মসাৎ করা হতো। ফলে রাতারাতি এ সব মিল কারখানায় মুনাফার বদলে লোকসানের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি পায় যে আজ পর্যন্ত বিশ বছর পরও সে ঘাটতি থেকে বাংলাদেশ পরিত্রাণ পায়নি। তারপর আরো শুনেছি যে এসব আওয়ামী লীগপন্থী পদ- কর্তার সাহায্যে বহু যন্ত্রপাতি ইন্ডিয়াতে পাচার হয়ে গিয়েছিলো।

পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ জুট মিল- এ বহু বিহারী কর্মী ছিলো। এই মিলের জেনারেল ম্যানেজারও ছিলেন একজন অবাঙ্গালী। পাট সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাঁকেও নানাভাবে নাজেহাল করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ইন্ডিয়ায় চলে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কলকাতায় জুট মিলে একটা বড় চাকরি পান।

শুধু যে ভুয়া নাম বসিয়ে টাকা আদায় করা হতো তা নয়। শ্রমিকরা মনে করতে শুরু করে যে কাজ করুক বা না করুক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাদের বেতন গ্রহণের অধিকার থাকতে হবে। মিলগুলো কোন রকমে চালু রাখতে সরকারকে তখন থেকে প্রচুর পরিমাণ গচ্চা দিতে হচ্ছে। এক পর্যায়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমানে নাম শেরাটন) কর্মরত শ্রমিকরা দাবী তোলে যে হোটেলটি যেনো তাদের মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কারো ছিলো না। একেতো মুজিবের সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন অর্থনীতিবিদ যাঁরা কেতাবী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন এবং মুজিবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কলকারাখানা, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিলে বাংলাদেশ রাতারাতি একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হবে। শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনাও মাফ করে দিয়েছিলেন। শেষে যখন দেখা যায় যে এর ফলে রাজস্বে একটা বিরাট ঘাটতি সৃষ্টি হবে তখন আমলারা তাঁকে বুঝিয়ে খাজনা আবার পুনঃ প্রবর্তিত করেন উন্নয়ন ট্যাক্স বা ডেভলপমেন্ট ট্যাক্স নামে।

মুজিববাদ

কাগজপত্রে বক্তৃতায় প্রচার করা হতো যে 'মুজিববাদ' বিশ্বে একটা বিপ্লব এনে দেবে। সমাজতন্ত্রের চাইতেও নাকি এর মধ্যে প্রগতির সম্ভাবনা আরো অধিক। এই 'মুজিববাদের' প্রধান তাত্বিক ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে শেখ মনি। এ যে শ্লোগান চালু করে সেটা হলো, 'বিশ্বে এলো নতুন বাদ- মুজিববাদ, মুজিববাদ'। মুজিববাদের বৈশিষ্ট্য নাকি. এই যে সমাজতন্ত্র যেখানে জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি নেই সেখানে মুজিববাদে জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্বে একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করা হলো এবং এই পথেই এশিয়া এবং আফ্রিকার সমস্ত অনুন্নত দেশের মুক্তি খুঁজতে হবে। এই শেখ মনিই পরে বিপুল সংখ্যক আওয়ামী যুবককে নিয়ে পূর্ব জার্মানীতে 'ইয়ুথ ফেস্টিবালে'- যোগ দিয়েছিলো।

ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারীর শুরুতে আরো অনেক খবর কানে আসতে থাকে। শুনলাম যে যদিও সৈয়দ আলী আহসান ইন্ডিয়াতে গিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে প্রচার কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন, তার আপন চাচাতো ভাই যশোরের সৈয়দ ওবায়দুল্লাহ ওরফে সুবা এ সময় গ্রেফতার হয়ে জেলে যায়।

১৬ই ডিসেম্বরের পরের অরাজকতা

গেরিলারা ১৬ই ডিসেম্বরের পর নির্যাতন করে সুবার একটা হাতও ভেঙ্গে ফেলে। সুবার মতো তাঁর ভগ্নিপতি বশির উদ্দিন মাজমাদারও নির্যাতিত ও গ্রেফতার হন। মাজমাদার সাহেব পাকিস্তান আমলে কিছুকাল প্রাদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো যে এঁরা দুজনেই পাকিস্তানে বিশ্বাসী।

পাকিস্তানে বিশ্বাসী আমাদের পরিচিত আর এক ব্যক্তির অবস্থা নিয়ে এ সময় অনেক জল্পনা- কল্পনা শুনেছি। এর নাম মৌলবী ফরিদ আহমদ। মৌলবী ফরিদ আহমদ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে ডিগ্রী নিয়েছিলেন। আমার চার বছরের ছোট খুবই আদর্শবাদী। পাকিস্তান জাতীয়তাবাদে তাঁর আস্থা ছিলো মজবুত। তিনি জানতেন তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। ১৬ই ডিসেম্বরের আগে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দেখলাম সঙ্গে বন্দুকধারী গার্ড। প্রথম প্রথম শুনতাম যে পাকিস্তান আর্মির আত্মসমর্পণ করার পর তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে চলে যান এবং সেখান থেকে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব গুজবের কারণ, মৌলবী ফরিদ আহমদকে যারা চিনতো তারা জানতো যে সহজে নতি স্বীকার করার লোক তিনি নন। অনেক পরে খবর পেয়েছি যে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটি হলে আটক করে তাঁকে খুন করা হয়। কিন্তু অদ্যবধি তাঁর লাশের কোনো খোঁজ হয়নি।

'জয় বাংলা' বলতে অস্বীকার করায় বহু লোককে জবাই করা হয়। দাড়িওয়ালা লোক দেখলেই গেরিলারা ধরে নিতো যে সে হয় মুসলিম লীগ বা জামাতের সমর্থক। এভাবে যে কত লোক নিহত হয় তার হিসাব কেউ জানে না। তখন এই নিধন যজ্ঞকে বলা হতো দেশ প্রেমের উৎকৃষ্ট প্রকাশ।

একটা গৃহযুদ্ধের অবসান হবার পর ক্রোধ এবং হিংসার বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশে যতো লোক ১৬ই ডিসেম্বরের পর বিভিন্ন গেরিলা বাহিনীর নির্মমতার শিকার হয়েছে ততো আর কোনো দেশ হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ফ্রান্স নাৎসী মুক্ত হলে হিটলার বিরোধী প্রতিরোধে যারা যোগ দিয়েছিলো তারা অনেক শত্রুকে গুলী করে মেরে ফেলে। কিন্তু এদের সংখ্যা তেমন নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, মার্শাল পেঁত্যা নাৎসীদের সহায়তায় ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে ভিশিতে এক সরকার গঠন করেছিলেন। তাঁকেও বিজেতা জেনারেল দ্যাগল হত্যা করেননি। মার্শাল পেঁত্যার বিচার হয়েছিলো। তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করা হয় যে মার্শাল পেঁত্যার মতো ব্যক্তি যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন তাকে দেশদ্রোহী বলা সমীচীন হবে না। তিনি চেয়েছিলেন যে ফ্রান্স যাতে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়। অবশ্য তাঁর মন্ত্রী সভার কয়েকজন সদস্য হিটলারবাদের সমর্থন করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন লাভাল এবং এডমিরাল দারলাঁ। আমার যদ্দুর স্মরণ আছে এ দু'জনের মৃত্যুদন্ড হয়। মার্শাল পেত্যাঁকে নিয়ে বহুদিন বিতর্ক চলে। শেষ পর্যন্ত

তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে জাতীয় বীরের সম্মান দেওয়া হয়েছে।

১৬ই ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশে দেখলাম এর ব্যতিক্রম। যাঁরাই শেখ মুজিবকে সমর্থন করেননি তাঁরাই হয়েগেছেন পাকিস্তান আর্মির ঘৃণ্য দালাল। আর অনেক চোর- বদমাশ গাঁয়ে মুজিববাদের লেবেল এঁটে হয়ে উঠে বড় দেশপ্রেমিক। দেশ প্রেমিক নির্ধারণের এই নতুন মাত্রাটি বিশ বছর পরও পরিত্যক্ত হয়নি। তার ফলে একাত্তর সালে দেশে যে বিভেদ ঘটেছিলো তা নিরসনের আশু সম্ভাবনা নেই বললেই চলে এবং এখনো সমাজ দ্বিধা বিভক্ত।

আমার উপর যে হামলা করা হয়েছিলো সে সম্বন্ধে কোন খবর দেশের কোনো পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। জানুয়ারীতে একদিন দেখলাম ইংরেজী অবজারভার পত্রিকায় আমার নাম। দালাল হিসেবে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিলো সেই তালিকায়। তখন বুঝতে পারলাম যে আমি একজন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি। এবং এটাই পুলিশ পাহারার কারণ। তখনো জানা ছিলো না ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় শিগগিরই আমাকে জেলে পাঠানো হবে।

একদিন হাসপাতালের অন্য ক্যাবিন থেকে এক ব্যক্তি দেখা করতে আসেন। বয়স্ক লোক। মুখে দাড়ি। বললেন ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত অনশন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর এমনই ভক্ত যে তাঁকে পাকিস্তান থেকে রেহাই না দিলে আমরণ অনশন চালিয়ে যেতেন। শেখ মুজিব এসে খবর পেয়ে লোকটিকে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার্থে পাঠিয়েছিলেন। এ রকম ঘটনা আরো দু'একটির কথা শুনেছি। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে শেখ মুজিবের উপর প্রগাঢ় আস্থা ছিলো। তারা বিশ্বাস করতো যে দেশের মাটিতে শেখ মুজিব পা দেওয়া মাত্র দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ রকম এক ব্যক্তির লেখা এক চিঠি অবজারভারে পড়ি। শেখ মুজিব বোধ হয় খন্দকার মোশতাক বা ও রকম কাউকে দেখতে হাসপাতালে এসেছিলেন। ভদ্রলোক লিখেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক গার্ড ছিলো না। দেশের এই সংকটময় মুহুর্তে এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলেছেন- এ আশংকায় ভদ্রলোক শিউরে উঠেছিলেন। তবে মজার কথা, ঐ জানুয়ারী মাসেই অন্য রকমের কথাও কানে আসতে থাকে। কিন্তু এ কথা সত্য যে ১৬ই ডিসেম্বরের পর সারাদেশে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে এক ধরনের ইউফোরিয়া বা উল্লাস ও আশাবাদের সঞ্চরণ হয়েছিলো।

জিনিস পত্রের দাম জানুয়ারীতে হুহু করে বাড়তে শুরু করে। এ বৃদ্ধির পরিমাণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা ছিলো অসম্ভব। আমার মনে আছে একদিন আমার এক মেয়ে জিজ্ঞাসা করে কিছু জামদানী শাড়ী কিনে রাখবে কিনা। ওগুলো ত্রিশ- পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রী হচ্ছিলো। আমি বারণ করেছিলাম এই বলে যে এটা কেনাকাটা করার সময় আমাদের নয়। তখন ধারণাই করতে পারিনি যে ত্রিশ টাকার শাড়ী কয়েক দিনের মধ্যেই হাজার টাকা ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমানে এসব শাড়ীর দাম চার- পাঁচ হাজার টাকার উপর উঠেছে বলে শুনেছি।

মুজিব সরকার প্রচলিত সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে নতুন রাষ্ট্র গড়তে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। পাকিস্তান আমলের কোনো কিছুই রাখা হবে না। বলে ঘোষণা করা হয়। নতুন যে মুদ্রা চালু করা হলো তার নাম দেওয়া হয় টাকা। টাকা কথাটা নতুন নয় বৃটিশ আমলেও ইন্ডিয়ার অন্যত্র যে মুদ্রাকে রুপী বলা হতো, বাংলা ভাষায় তার নাম ছিলো টাকা। পুরানো নোটে প্রায় আট- দশটি ভাষায় মুদ্রার নাম লেখা থাকতো। ইংরেজি, হিন্দী, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় যে শব্দটি পাওয়া যেতো সেটি হলো রুপী বা রুপিয়া আর বাংলায় টাকা। মুদ্রার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে টাকা করাতে ইন্ডিয়ান রুপী বা পাকিস্তানের রুপীর সঙ্গে এক বিনিময় হারের প্রশ্ন ওঠে এবং প্রথম দিকে এতে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়।

পাকিস্তান আমলের ব্যাংকগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকার নতুন কতগুলি নামের ব্যাংক চালু করে। এর মধ্যে ছিলো সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ইত্যাদি। ব্যাংকিং ব্যবসায় এই বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে বাংলাদেশ পুরানো ব্যাংকগুলোর সম্পদ থেকে রাতারাতি বঞ্চিত হয়। দেশ পরিচালনার ভার যাদের উপর এসে বর্তেছিলো তারা মনে করতেন যে একেবারে নতুন করে তাঁরা সবকিছু করবেন, ঐতিহ্যের প্রয়োজন নেই। পাকিস্তান আমলের খবরের কাগজে কতগুলোর নাম ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে বদলে যায়। পাকিস্তান অবজারভার আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার নামে, দৈনিক পাকিস্তানের নাম হয় দৈনিক বাংলা এবং মর্নিং নিউজের পরিবর্তে বের হয় বাংলাদেশ টাইমস। আমার যদ্দুর মনে পড়ে ১৬ই ডিসেম্বরের কিছুকাল পরই মর্নিং নিউজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এই পত্রিকাটির উপর আওয়ামী লীগের আক্রোশ ছিলো বেশী। এর এডিটর ছিলেন একজন উর্দুভাষী ভদ্রলোক। অবজারভারের মালিক হামিদুল হক চৌধুরী পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন। এবং যদিও একাত্তর সালে তিনি পাকিস্তানের পতনের সম্ভাবনায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর ইংরেজী পত্রিকা ছিলো প্রধানতঃ বাঙালী জাতীয়তাবাদের লালন

ক্ষেত্র। সত্তর সালেও এডিটর আবদুস সালাম এবং হামিদুল হক চৌধুরী স্বনামে প্রবন্ধ লিখে আলাদা বাঙালী কালচারের কথা প্রচার করেন। এঁদের চৈতন্যোদয় হয় যখন সত্তর সালের অক্টোবরের দিকে আওয়ামী লীগপন্থী তরুণরা বলতে করে যে তারা ক্ষুদিরামের বংশধর। আমার মনে আছে সালাম সাহেব এর জোরালো প্রতিবাদ করে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বলেছিলেন যে পূর্ব বাংলা মুসলমানের ঐতিহ্য তো ক্ষুদিরামের ঐতিহ্য নয়। কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

খুব সম্ভব গভর্ণর মোনেম খান 'পয়গাম' নামে যে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন সেটাও ১৬ই ডিসেম্বরের পর বন্ধ হয়ে যায়। 'পয়গামের' প্রেস আওয়ামী লীগাররা দখল করে। তবে এটা কোন তারিখের ঘটনা, সে কথা আমার পরিস্কার মনে নেই।

মুজিব সরকারের আরেক কীর্তি হচ্ছে রেডিও ও টিভি থেকে কোরআন তেলাওয়াত বাতিল। তাদের যুক্তি ছিলো যে ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াতের সঙ্গতি বিধান করা যায় না। শেষে শ্রোতাদের প্রবল চাপে আবার যখন কোরআন তেলাওয়াত পুনরায় চালু করতে হয় তখন স্থির করা হয় যে কোরআনের সঙ্গে গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ করা হবে। এ ব্যবস্থা এখনো চলছে।

আমি উপরে বলেছি যে মুজিব বিরোধী বহুলোক ১৬ই ডিসেম্বরের পর নির্যাতিত এবং গ্রেফতার হয়। এর মধ্যে এমন লোকও ছিলো যারা শেষ দিকে বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগ দেয়। এ রকম এক ব্যক্তি ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাবেক ভাইস চান্সেলর ডক্টর মোহাম্মদ ওসমান গনি। ভিসির পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কেনিয়ায় পাকিস্তানের হাইকমিশনার হন। এবং সেখানে মুজিবের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে লন্ডন চলে যান। কিন্তু এতে তিনি রেহাই পাননি। ঢাকায় গভর্নর মোনেম খানের কট্টর সমর্থক বলে তার দুর্নাম ছিলো। লন্ডনে আট বা নয় জানুয়ারী শেখ মুজিব যখন পৌছান তখন বাঙ্গালী যারা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এসেছিলো ডক্টর গনিও তার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিচয় জানাজানি হওয়া মাত্র তাকে নাজেহাল করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এ রকম আরেক ব্যক্তি ডক্টর মফিজউদ্দিন আহমদ চাকরিচ্যূত হন। তিনি ছিলেন কেমিস্ট্রির অধ্যাপক। সত্তর সালে জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর নিযুক্ত হন। তিনি কোনো মুজিব বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। কিন্তু যেহেতু তিনি ভিসির পদ লাভ করেন গভর্ণর মোনেমের আমলে সেহেতু

মুজিব সরকার তাকে বরখাস্ত করে। তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন সৈয়দ আলী আহসান।

শেখ মুজিব দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর সবচেয়ে বড় নাটক শুরু হয় পরাজিত পাকিস্তানী সৈন্যদের নিয়ে। এদের সংখ্যা ছিলো ৯৩ হাজার। প্রথমতঃ শেখ মুজিব দাবী করেন যে তাঁর মুক্তি বাহিনী এদের পরাস্ত করেছে। এদের তিনি যুদ্ধ অপরাধের জন্য বিচার করবেন। বলা হয়, এরা পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা অভিযান চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করেছে। সুতরাং বিনা বিচারে এদের ছেড়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তিনি একটা ইনকোয়ারী কমিশনও গঠন করেন। পাক আর্মি কোথায় কি অঘটন ঘটিয়েছে সে সম্বন্ধে তদন্ত করে সাক্ষ্য প্রমাণসহ রিপোর্ট তৈরি করার ভার ছিলো এই কমিশনের উপর। কার্যতঃ ইন্ডিয়া যখন বিজেতা শক্তি হিসাবে যুদ্ধ বন্দীদের এদেশ থেকে সরিয়ে নেয় তখন বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নেবার প্রয়োজনও সে বোধ করেনি। তবে শেখ মুজিবের অনুরোধে বাছাই করা ১৯৩ জন আর্মি অফিসারকে রেখে যাওয়া হয়। এরাই নাকি গণহত্যার নীল নকশার প্রস্তুতকারক। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এরাও ইন্ডিয়াতে স্থানান্তরিত হয় কারণ তখন যুদ্ধ বন্দীদের বিচারের ব্যাপারটা ক্রমান্বয়ে চাপা পড়ে যায়। আসল কথা হচ্ছে যে আইনতঃ যুদ্ধ বন্দীদের উপর বাংলাদেশের কোনো কর্তৃত্ব ছিলো না। এরা ইন্ডিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং জেনেভা কনভেনশন মোতাবেক মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এদের থাকবার কথা ইন্ডিয়ার দায়িত্বে। হয়েছিলোও তাই। কিন্তু প্রথম দিকে জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী মাসে এ ব্যাপার নিয়ে যে আসফালন শুরু হয়েছিলো সেটা একটা প্রহসন হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

যুদ্ধাপরাধ তদন্ত কমিশনে বহু সরকারী অফিসার নিযুক্ত হন। বেশ কিছু টাকা পয়সাও ব্যয় করা হয়। তখন কথায় কথায় শুনতাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে জার্মানীর নুরেমবার্গে এবং জাপানের টোকিওতে যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচার হয়েছিলো, সেই কথা। তবে এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে পৃথিবীর কোনো দেশেই বাংলাদেশের এ প্রস্তাবের সমর্থন পাওয়া যায়নি। ইন্ডিয়াও চুপ করেছিলো।

একই প্রকারের আসফালন শুরু হয় পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়ে। শেখ মুজিব প্রশ্ন করেন, আমি কোন পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেবো, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে? অর্থাৎ একাত্তরের বিপর্যয়ের পর পাকিস্তান বলে কিছু নেই। আছে কতগুলো খন্ড রাজ্য।

আরো মনে পড়ে যে শেখ- মুজিব যদ্দিন ১৬ই ডিসেম্বরের পর পাকিস্তানে বন্দী ছিলেন তদ্দিন প্রায়ই হুমকি দেওয়া হতো যে তাঁর মুক্তি বিলম্বিত হলে বাংলাদেশের দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তানেও পাঠানো হবে। এবং পূর্ব পাকিস্তান যেভাবে তাদের কবলিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানকেও তারা সেভাবে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

বাঙালী গেরিলারা পশ্চিম পাকিস্তানে কিভাবে কাজ করবে সে কথা আমাদের মতো ব্যক্তির পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিলো না। আমরা জানতাম যে গেরিলাদের স্থানীয় ভাষা জানতে হয় এবং স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে যে সমস্ত গেরিলা তৎপর ছিলো তারা ছিল সব ফরাসী ভাষী। মাঝে মাঝে শুনতাম যে দু'একজন ইংরেজকে বিশেষভাবে তালিম দিয়ে প্যারাসুট যোগে ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে নামিয়ে দেওয়া হতো। একবার একটি মেয়ে কে এই কাজে ফ্রান্সে পাঠানো হয়। খবরে পড়েছি যে তাকে কয়েকদিন ধরে মদে গোসল করিয়ে তার গায়ের গন্ধ যেনো ফরাসী মেয়েদের মতোই হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। বলাবাহুল্য সে অনর্গল শুদ্ধ উচ্চারণে ফরাসী বলতে পারতো। বাঙালী গেরিলারা যারা উর্দু- পাঞ্জাবী- পশতু কিছুই জানতো না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে যারা ছিলো একেবারেই অজ্ঞ তাদের মুখে পশ্চিম পাকিস্তানে তৎপর হওয়ার হুমকি আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। তবে এটা বোধ হয় আমাদের এ অঞ্চলের লোকের স্বভাব। মিথ্যা গর্ব করা এবং অলীক স্বপ্ন নিয়ে মেতে থাকতে আমরা যতোটা ভালবাসি, ততোটা আর কিছুতে নয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পূর্ব- পাকিস্তানের বিপর্যয়ের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে দাঁড়ান। একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চের আগে এবং তেহাত্তর সালের পর মিঃ ভুট্টোর ভূমিকা যতোই বিতর্কিত হোক না কেনো বাহাত্তর সালে তিনি পরাজিত জাতিকে একটা আশার বাণী শোনাতে পেরেছিলেন। আর্মি যদি তখনো ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকতো পশ্চিম পাকিস্তান হয়তো খন্ডবিখন্ড হয়ে যেতো।

১৬ই ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি দান করে ইন্ডিয়া এবং তার পরই বৃটেন। বৃটেনের এই সিদ্ধান্তে পাকিস্তানীরা খুবই মর্মাহত হয়েছিলো। কারণ পাকিস্তান তখনো কমনওয়েলথ সদস্য। মিঃ ভুট্টো সঙ্গে সঙ্গে কমনওয়েলথ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

আমরা আশ্চর্য হলাম আরো যখন মুসলিম রাষ্ট্রদের মধ্যে মালয়েশিয়া প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলো। আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু যে এই ত্বরিৎ সিদ্ধান্তের কথা মনে করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান কতটা বন্ধুহীন হয়ে পড়েছিলো।

আরো আশ্চর্যের কথা যখন পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ চলছিলো এবং যেকোন মুহূর্তে ইন্ডিয়ার কাছে পাকিস্তান পরাজিত হবে এ সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন ইরানের রেজা শাহ পাহলবী বেলুচিস্তানের অংশ বিশেষের উপর তাঁর দাবীর উল্লেখ করেন। অথচ ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের ছিলো গাঢ় সম্পর্ক। এ সব ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চিরস্থায়ী শত্রুতা কিংবা বন্ধুত্বের কোনো স্থান নেই। শত্রুতা ও বন্ধুত্ব দু'টোই সাময়িক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। দুটোরই অর্থ আপেক্ষিক।

দালাল আইন ও উগ্র জাতীয়তাবাদ

যদিও শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের আগে থেকেই বহু লোককে ধরপাকড় এবং হত্যা করা হয়, কলাবরেটর আইন পাস হয় সম্ভবতঃ ১০ ই জানুয়ারীর পর। কলাবরেটর শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে দালাল শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই দালাল আইনের আওতা ছিলো এতো ব্যাপক যে শেখ মুজিবের বন্ধু- বান্ধবও ভীত হয়ে পড়েছিলেন। যাঁরাই সক্রিয়ভাবে গেরিলা তৎপরতায় শরীক হননি তারাই হয়ে উঠেন দালাল। আমার মনে আছে শেখ মুজিবের বন্ধু জহির উদ্দিন যিনি এককালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি বেগম মুজিবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তাঁর অপরাধ ছিলো যে একেতো তিনি কলকাতার লোক; উর্দু ভাষী। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যক্ষভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থন করেননি। দালাল আইনে হাজার হাজার ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রজু করা হয়। আমি এক উকিলকে বলতে শুনেছি যে এ সব মামলার ফলাফল যাই হোক, এগুলো চালাতেই ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর লাগবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনেক মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে হাই কোর্ট রায় দেয় যে দালাল আইনটি অসাংবিধানিক। এ সব মামলা চালাবার লোক পাওয়া যেতো না। উকিলরা ভয় পেতেন যে দালাল আইনে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করতে গেলে তারাও দালাল হয়ে পড়বেন। বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ঘটনা বহু ঘটেছে।

দালাল আইনের ধারা নিয়ে আলোচনা করার স্বাধীনতা কারোর ছিলো না। ও সম্বন্ধে আইনের দিক থেকে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা মাত্র আপত্তিকারীকে

দালাল বলে চিহ্নিত করা হতো। ভয়ে এবং আতঙ্কে হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন থেকে শুরু করে মফস্বলের উকিলরা পর্যন্ত চুপ করে থাকতে বাধ্য হন। দু'একজন উৎসাহী মুজিববাদী উকিল দালাল আইনের পক্ষে জোরালো প্রচারণা চালান। তাদের সে সমস্ত উক্তি ছিলো যেমন যুক্তিহীন তেমনি ন্যক্কারজনক। এক উৎসাহী উকিল- যার নাম এখন আর আমার মনে নেই- দালাল আইনের সমর্থনে ছোটখাট একটা বইও প্রকাশ করেন। অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের নীতি বোধ এবং বিবেকবুদ্ধি কিভাবে পরিবর্তিত হয়, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তার যতো উদাহরণ দেখা গিয়েছিলো ততো বোধ হয় সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর কোথায়ও চোখে পড়বে না।

শেখ মুজিব দেশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতির পিতা হিসাবে অভিনন্দিত হন। সঙ্গে সঙ্গে চাটুকারের দল তার স্ত্রী লুতফুন নেসাকে 'জাতির মাতা' বলে অভিহিক করতে আরম্ভ করে। এও ছিলো এক হাস্যকর ব্যাপার। এ কথা সত্য যে কোনো কোনো দেশে বিশেষ কারণে কোনো ব্যক্তিকে জাতির পিতা বলা হয়। কিন্তু এটা নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি কোথায়ও হয়নি। আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটনকে কেউ কেউ মার্কিন জাতির পিতা বলে। কারণ যে যুদ্ধে বৃটেনকে পরাজিত করে আমেরিকান উপনিবেশগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তিনিই আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তেমনি উনিশ শতাব্দীতে যখন দক্ষিণ অঞ্চলগুলি দাসত্বের প্রশ্নে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে উত্তর অঞ্চলে যে যুদ্ধ হয়, তার নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন আব্রাহাম লিংকন। গেটিসবার্গ রণক্ষেত্রে তিনি যে বক্তৃতা দেন সেটা শুধু আমেরিকার ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় দলিল। এই বক্তৃতায় তিনি Government of the people, by the people, for the people শব্দগুলি ব্যবহার করেন। লিংকন আততায়ীর গুলীতে নিহত হলে ওয়াল্ট হুইটম্যান তার কবিতায় তাকে মাই ফাদার বলে সম্বোধন করেন। ওয়াশিংটন এবং লিংকন দুজনকেই আমেরিকানরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। কিন্তু জাতির পিতা সমস্যা নিয়ে সে দেশে কোনো বিতর্ক নেই। তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করে কোনো ব্যক্তি কোনো কালেই সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না।

শেখ মুজিবের চাটুকার দল এতোটা বাড়াবাড়ি করতে শুরু করে যে শুনেছি তারা নাকি প্রস্তাব দিয়েছিলো যে জার্মান এয়ার লাইন লুফথানসা নামের অনুকরণে বেগম মুজিবের নামানুসারে বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের নাম লুতফুন

নেসা এয়ার লাইনস করা হোক। তবে এ ব্যাপার নিয়ে সরকারী মহলে সত্যি কোনো আলোচনা হয়েছে বলে শুনিনি। কিনতু বেগম লুতফুন নেসাকে কোনো অনুষ্ঠানে দেখা গেলে জাতির মাতা ধ্বনি শোনা যেতো।

১৯৭২ সালের প্রথম ক'মাস উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের যুগ। সব কিছুর মধ্যেই বাঙালীত্বের সন্ধান করা হতো। এমন কি ইংরেজী ভাষায়ও বাঙালীকে বেংগলী বলা চলবে না- এই দাবী উঠেছিলো। এটাও ছিলো এক হাস্যকর অভিনয়। বিদেশী ভাষায় কোন জাতি বা ভাষার নাম কি হবে সেটা ঐ ভাষাভাষী লোকেরাই স্থির করে। তাদের মুখে যে ধ্বনিটা সদূজভাবে আসে সেটা প্রচলিত হয়। ফরাসী ভাষায় ফরাসীর ফ্রাঁসে। ইংরেজীতে বলি ফ্রেঞ্চ, বাংলায় ফরাসী। উর্দুতে ফ্রানসিসি। অন্য ভাষায় কি বলে আমি জানি না। তবে যদি কোনো ফরাসী নেতা দাবী করে বসেন যে অন্য কোনো ভাষায় ফ্রাঁসে ছাড়া আর কিছু বলা চলবে না তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে? জার্মানীকে জার্মানরা বলে 'ডয়েচল্যান্ড'। ফ্রান্সে বলে আলমাইন। আরবীতেও আলমাইন। এ নিয়ে জর্মোনীতে কোন কূটনৈতিক প্রতিবাদ করতে শুনিনি। ১৯৭০ সালে যখন চীনে যাই, ওদেশের লোকদের মুখে শুনলাম অদ্ভুত শব্দ। সেটা অনেকটা ব্যজিস্তানের মতো। কারণ পাকিস্তান শব্দটা ওরা পরিস্কারভাবে বলতে পারে না। মক্কায় দেখেছি তুরস্কের লোকেরা তককিরের সময় যে ধ্বনিটি উচ্চারণ করে সেটা আল্লাহ হুয়াচবার এর মতো শোনা যায়। আমি বহুবার চেষ্টা করে শুনবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দেখেছি ওরা আকবার বলতে পারে না। এ তুর্কী ভাষারই কোন বৈশিষ্ট্য হবে।

বাঙলাকে বেংগলি বলা চলবে না বলে যারা চিৎকার করে তারা একবারও ভেবে দেখে না যে আমরা নিজেরা অন্য দেশের নাম কিভাবে বিকৃত করি। ইংরেজী কথাটা খাঁটি বাংলা। ইংল্যান্ডের ভাষার নামতো ইংরেজী নয়, ইংলিশ। ফরাসীরা বলে আংলে। কোন ইংরেজ সরকার যদি বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করেন অভিধান থেকে ইংরেজী শব্দটা তুলে দিতে আমরা বোধ হয় খুব অসুবিধায় পড়বো। তাছাড়া পৃথিবীতে, প্রায় হাজার চারেকের মতো ভাষা প্রচলিত। এগুলির মধ্যে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিতে প্রচুর প্রভেদ বিদ্যমান। আরবীতে মহাপ্রাণ ধ্বনি নেই। খ চ ছ ট ঠ প ফ ড় ঢ় এর কোনটাই নেই। ওদেশের লোকদের মধ্যে পাকিস্তানকে 'বাকিস্তান' বলতে শুনেছি। ভুট্টোকে বলতো বুতু। ঐভাবেই তারা এসব নাম উচ্চারণ করতে পারে। তেমনি বাংলাদেশের আরবঅ নাম 'বানজলাদেশ'।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে বানান সম্বন্ধে এ- রকমের হঠকারিতার এক ঘটনা ঘটে। তিনি একবার সৌদি আরব গিয়েছিলেন। সেখানে শোনেন যে সৌদিরা

মক্কার ইংরেজী বানান Mecca বদলে Makkah করেছে। তার কারণ Mecca নামটা ইংরেজীতে একটা শব্দে পরিণত হয়েছে। ঘোড় দৌড়ের বাজির আড্ডাকে Mecca বলা হয়। সৌদীরা মনে করতে শুরু করে যে এতে মক্কা শহরের পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বানান পাল্টে দেওয়া হল। এও মূর্খতা বই কি? এই পরিবর্তন দেখামাত্র এরশাদ সাহেব হুকুম করেন যে ঢাকার বানান হবে Dhaka। যেন জোর করে ইংরেজদের দিয়ে মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঢ' উচ্চারণ করানো যাবে। এই মূর্খতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমি 'Arab News' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সরকারী কাগজপত্রে, গাড়ীর নেমপ্লেটে, দোকানের সাইনবোর্ডে বানান বদলাতে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। Dacca University-র পুরানো ছাত্রদের এখন Dhaka লিখতে হবে। এ দু'টো যে একই বিশ্ববিদ্যালয় সেটা সার্টিফিকেটে প্রমাণ করতে এখনও অসুবিধা হয়।

কিন্তু যাদের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানোর জন্য এই আয়োজন তারা তো ড্যাকাই বলছে। আমরা শুধু অনর্থক কতগুলি পয়সা নষ্ট করেছি। অপকর্মের পয়সা খরচের ব্যাপারে আমাদের জুড়ি নেই। এ রকম আরো অনেক ভাষায় উচ্চারণের তারতম্য আছেই। আফ্রিকায় ভাষাগুলির স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। অনুরূপভাবে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন ইনকাদের বংশধরদের মধ্যে বিভিন্ন ধ্বনি কিভাবে উচ্চারিত হয় তাও বলতে পারবো না। কিন্তু যে জন্য এতো কথার অবতারণা করলাম সে হলো এই উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে বাংলাদেশে যে মূর্খতার প্রকাশ দেখেছি তাতে লজ্জাবোধ করেছি। যেনো আমরা ধমক দিয়ে পৃথিবীর সব অঞ্চলের উচ্চারণ সংশোধন করে ফেলতে পারবো। এ এক ধরনের পাগলামী, যে জন্য আমাদের প্রচুর খেসারত দিতে হচ্ছে। নিজেদের এতো স্পর্শকাতর করে তুলেছি যে এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অন্য কিছু করার সময় আর থাকে না। কিন্তু মনে আছে ৭২ সালের প্রথম দিকে এ সব নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে দেশদ্রোহিতার দায়ে পড়তে হতো, দেশ প্রেমের একমাত্র সংজ্ঞা ছিলো বিনা প্রতিবাদে মুজিবপন্থী লোকদের ক্রিয়াকর্মের সমর্থন করা।

অধ্যায় ১০

শহীদের বন্যা

মুজিবপন্থী কোনো ব্যক্তি দুর্ঘটনায় মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে শহীদ হয়ে যেতো। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে এ রকমের শহীদের সংখ্যা যে কতো তা গণা যায় না। শহীদ কথাটার আসল তাৎপর্য এই যে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে কেউ যদি নিহত হয় তার মৃত্যুকেই শাহাদত বলা হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) এর জীবদ্দশায় কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে বদর, ওহুদ প্রভৃতি স্থানে যাঁরা মারা যান তাঁদেরই, শরিয়ত মতে শহীদ বলা হয়। কিন্তু তখনো অন্য অবস্থায় কাফেরদের হাতে যাঁরা নিহত হন তাঁদের শহীদ বলার নিয়ম নেই। কাফেরদের অতর্কিত আক্রমণে মারা গেলেই শাহাদত হবে তার কোনো কথা নেই। শুধু যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম বিরোধী শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনিই শহীদ। পূর্ব পাকিস্তানে '৭১ সালের আগেও দেখেছি সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে কারো মৃত্যু হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে শহীদ ঘোষণা করা হতো। '৭১ সালে পাকিস্তান আর্মির হাতে যারা নিহত হলো তারা সবাই হয়ে গেছে শহীদ। অথচ এর মধ্যে ধর্মযুদ্ধের কোনো কথা নেই।

আমি এ কথা স্বীকার করি যে যেহেতু বাংলায় শহীদের কোন প্রতিশব্দ নেই, এ শব্দটা বাংলায় গৃহীত হয়েছে একটু ভিন্ন অর্থে। যে ব্যক্তি কোন আদর্শের জন্য প্রাণ দেয় তাকে শহীদ বলার একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু যে ব্যাপক অর্থে এবং বিকৃত রূপে শব্দটা ৫২ সাল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে তার পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে দল বিশেষের লোকের অপঘাতে মৃত্যু হলেই কাগজেপত্রে তার শাহাদত প্রাপ্তির খবর ঘোষণা করা হয়।

ডিসেম্বর- জানুয়ারীতে আরো একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়। সে হলো নাম বদলের পালা। যে সব রাস্তাঘাট প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে ইসলাম শব্দটা যুক্ত ছিল, সেখান থেকে ঐ শব্দটা তুলে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে, পাকিস্তান আমলের বা তার আগের কোনো মুসলমান নেতার নামে কোন রাস্তাঘাট- শিক্ষা প্রকিষ্ঠানের নামকরণ হয়ে থাকলে সেখান থেকেও ওসব নাম অপসারিত হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল হলো সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, আর জিন্নাহ হলের নাম থেকে জিন্নাহর নাম সরিয়ে বসানো হলো সূর্যসেনের নাম। এ ছিলো এক ধরণের গোঁয়ার্তুমির অভিব্যক্তি। সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক। পঁচিশে মার্চের আগে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহ করতে যেয়ে গুলীতে মারা পড়েন। আগরতলা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। যখন আগরতলা

ষড়যন্ত্রের কথা প্রথম প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন আওয়ামী লীগ তারস্বরে চিৎকার করে বলতে শুরু করে যে এটা সরকারের সম্পূর্ণ বানোয়াট। একাত্তর সালের পর শেখ মুজিবসহ এ ষড়যন্ত্রের নায়কেরা স্বীকার করেছেন যে তারা সত্যই দেশের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ার সঙ্গে এক যোগসাজশে লিপ্ত হয়েছিলেন। সে একজনের নাম ইকবালের মতো বিশ্ববিখ্যাত কবি ও দার্শনিকের নামের পরিবর্তে একদল ছাত্রের জিদে গৃহীত হওয়ায় আমরা ব্যথিত এবং আশ্চর্যান্বিত হই। ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন এ কথা সত্য। কিন্তু তিনি ইন্তেকাল করেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ন'বছর আগে ১৯৩৮ সালে। ১৬ই ডিসেম্বরের পর পাকিস্তান বিরোধী তৎপরতা এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে পাকিস্তান এবং ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইতিহাসের চিহ্নটুকু মুছে ফেলবার প্রয়াসে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মেতে উঠেন।

সূর্যসেনের নাম আরো আপত্তিজনক। তিনি ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সাথে জড়িত। হিন্দু ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিকরা বর্তমানে অধিকাংশই স্বীকার করেন যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর যে সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয় সেটা ছিলো একান্তভাবে একটা হিন্দু মৌলবাদী আন্দোলন। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল যারা এই সন্ত্রাসবাদে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা জয় কালির নামে শপথ নিয়ে ইংরেজ হত্যার প্রতিজ্ঞা করতেন। তাঁদের মূলমন্ত্র ছিলো গীতার বাণী। এ সন্ত্রাসবাদীরা জানতেন যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামক যে নতুন প্রদেশটি গঠিত হয়েছিলো সেটা টিকে থাকলে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু এর ফলে হিন্দুজমিদার এবং বণিক শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত লাগবে বলে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাদের চাপের মুখে ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টে নেন। বাংলার দুই অংশ পুনর্মিলিত হয়। আবার শুরু হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের ইতিহাসে আর এক শোষণের যুগ। তখন থেকেই মুসলমানরা সংঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসের সংশ্রব ছাড়তে শুরু করে। ১৯২৩ সালে কংগ্রেস নেতা সি আর দাস বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় মুসলমানের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হবে না। তিনি বেঙ্গল প্যাক্ট নামক এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এটায় চাকরিতে এবং ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দেবার প্রতিশ্রুতি ছিলো। কিন্তু সি আর দাসের মৃত্যুর পর তার অনুসারী সুভাষ বোস, শরৎবোস, বিধান রায় ঐ চুক্তি বাতিল ঘোষণা করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এর পেছনে ছিলো সন্ত্রাসবাদীদের চাপ। বিশেষ করে সুভাষ বোস

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। বিশের দশকে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সদস্য হিসাবে সূর্যসেন অস্ত্রাগার লুন্ঠন করতে যান সেটা ১৯০৫ সালের সন্ত্রাসী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের রূপ। অথচ '৭২ সালে একদল ছাত্র তাকেই বাংলাদেশের জাতীয় বীরের মর্যাদায় স্থাপন করলো। এরা একবারও ভেবে দেখেনি যে, সূর্যসেন যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তার মধ্যে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার কোনো কথা ছিলো না। সন্ত্রাসবাদীরা মুসলমান সমাজকে সম্পূর্ণভাবে পাশ কাটিয়ে গীতার মন্ত্রে দীক্ষিত এক সমাজ এবং রাষ্ট্র কায়েম করতে চেয়েছিল।

ঐতিহ্য বর্জন

আমার আরো দুঃখ্য হলো যখন শুনলাম যে আমার পুরানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম বদলিয়ে নজরুল কলেজ রাখা হচ্ছে। (এ কথা উল্লেখযোগ্য যে কলেজটি পাকিস্তান আমলে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হলে এটাকে শুধু ইসলামিয়া কলেজ বলা হতো।) কিন্তু ইসলামের নাম এখন হয়ে পড়লো একান্তভাবে অপাংক্তেয়। যারা নজরুল ইসলামের নাম এ জায়গায় বসাতে গেলেন তারাও কবির নামের শেষ অংশটুকু বাদ দিলেন। কারণ তাতে ইসলাম শব্দটা এসে যায়। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে এক উদ্ভট নাম এই ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপানো হয়েছে। নজরুল বলে কোনো শব্দ আরবীতে নেই। নজরুল ইসলামের নজরুল নযর-উল-ইসলাম এর কি সংক্ষিপ্ত রূপ। এটা বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এ শব্দটিকে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে আমরা চরম মূর্খতার পরিচয় দিয়েছি। তাছাড়া ইতিহাসের প্রতি এই অবজ্ঞা কেন? আওয়ামী লীগ মনে করতো যে ইসলামের নাম তুলে দিতে পারলেই তারা প্রমাণ করতে পারবে যে তারা সত্যিকারভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। তাদের এ ধর্মনিরপেক্ষতার কপটতা ধরা পড়ে যখন দেখা যায় যে নটরডাম কলেজ, সেন্টগ্রেগরিজ স্কুল, হোলি ফ্যামিলি হসপিটাল, হোলি ফ্যামিলি কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন এ সবের নাম স্পর্শ করা হয়নি। লক্ষ্মীবাজারের কায়েদে আজম কলেজের নাম বদলে হলো সোহরাওয়ার্দী কলেজ। গভর্নর মোনেম খান প্রতিষ্ঠিত জিন্নাহ কলেজের নাম হলো তীতুমীর কলেজ। নতুন ঢাকার প্রধান সড়কের নাম ছিলো জিন্নাহ এভিনিউ তখন থেকে এটাকে সরকারীভাবে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ বলা হয়।

দেশের অন্যত্র এ রকম আরো পরিবর্তন ঘটে। রাজশাহী ইউনিভার্সিটির জিন্নাহ হলের নাম পরিবর্তিত হয়েছে ফজলুল হক হলে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ

নেই। প্রশ্ন হচ্ছে যে এভাবে ইতিহাসকে কি অস্বীকার করা যায়? অক্সফোর্ড কেমব্রিজ সাত- আটশ' বছরের পুরানো নাম এখনো সবাই ব্যবহার করে। অথচ ইংল্যান্ডের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক পরিবেশ একেবারে বদলে গেছে। সেন্ট জন্স কলেজ, সেন্ট ক্যাথরিন্স কলেজ প্রভৃতি নামে কেউ কখনো আপত্তি করে বলে শুনিনি। যদিও আধুনিক কালের ছাত্র- ছাত্রীরা বা শিক্ষকবৃন্দ খৃষ্টান ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন না। কিন্তু ইতিহাস তো আলাদা জিনিস। নতুন বাংলাদেশের নেতাদের কার্যকলাপে মনে হচ্ছিলো যে পুরানো ইতিহাসের প্রয়োজন একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। ১৬ই ডিসেম্বর থেকে যেনো আমরা জন্ম নিলাম। এর ফলে তখন থেকে যে স্ববিরোধিতা আমাদের আচরণে ধরা পড়ছে তার অবসান বিশ বছর পরও হয়নি। সমাজে এবং দেশে পরিবর্তন নিরন্তর ঘটে। কিন্তু ইতিহাসের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। সমস্ত পরিবর্তনের সামগ্রিক রূপ নিয়ে একটা জাতির পরিচয়। ফ্রান্সে এককালে রাজতন্ত্র ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পরও আবার কিছুকাল ঐ রাজতন্ত্র ফিরে এসেছিলো। বর্তমানে ফ্রান্সে গণতন্ত্র। কিন্তু তাই বলে সম্রাট নেপোলিয়ান বা রাজা ষষ্ঠদশ লুই এঁদের নাম তো ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয় এবং সে চেষ্টাও কেউ করে না। বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার সাহায্যে যে দল ক্ষমতায় আসীন হলো তারা মনে করতো যে কলমের খোঁচায় ডিক্রি জারী করে জাতির ইতিহাসই তারা পাল্টে দেবে।

শুধু ইসলামের সাথেই সম্পর্ক ছেদ হলো না, আরবী- ফার্সি যে দু'টি ভাষার সঙ্গে আমাদের কালচার নিবিড়ভাবে যুক্ত তাকেও পাশ কাটিয়ে এক নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করার চেষ্টায় নতুন শাসকরা মেতে উঠলেন। আরবী ফার্সির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করলেন না বটে কিন্তু কার্যত ঐ ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে নতুন পথে তাদের যাত্রা শুরু হলো। বাংলাদেশ সরকার যে সব নতুন পদবী সৃষ্টি করলো তার মধ্যে এর প্রমাণ ছিলো। গৃহযুদ্ধে যে সব সৈন্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলো তাঁরা কেউ হলেন বীরোত্তম কেউ বীরশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। বৃটিশ আমলেও মুসলমানদের উপাধিতে ফার্সি আরবীর পরিচয় থাকতো। তখনকার মুসলিম উপাধি ছিলো খান সাহেব, খান বাহাদুর, নবাব, শামসুল ওলামা প্রভৃতি। হিন্দুরা পেতেন রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, রাজা, মহামযোপাধ্যায় এরকম পদবী। এখন হিন্দু- মুসলিম প্রভেদ ঘুচে গেলো। মজার কথা এই যে ইন্ডিয়াতে ৪৭ সালের পর যে সমস্ত পদবী সৃষ্টি হয়েছিলো সেগুলি যেমন ছিলো সংস্কৃত ভিত্তিক যথা ভারত ভূষণ, ভারত রত্ন। বাংলাদেশে নতুন পদবীতে তার এক প্রতিধ্বনি ছিলো। যেনো আমরা সংস্কৃতিতে ইন্ডিয়ারই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ।

একাত্তরের মার্চ মাসে ছাত্ররা শেখ মুজিবুর রহমানকে যে উপাধি দেয় সেই বঙ্গবন্ধু কথাটাও চিত্তরঞ্জন দাসের 'দেশবন্ধু' উপাধির অনুকরণ। পাকিস্তান আমলে যে সমস্ত পদবী প্রচলিত ছিলো সেগুলো একেবারেই পরিত্যক্ত হলো। তখনকার পদবীর মধ্যে সুপরিচিত ছিলো তমগায়ে খিদমত, তমগায়ে কায়েদে আজম, সিতারায়ে ইমতিয়াজ, হিলালে পাকিস্তান, নিশানে পাকিস্তান ইত্যাদি। নতুন পরিবেশে এ সমস্ত পদবী চলতো না সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু পূর্বের সংস্কৃতির সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব বাদ দিয়ে সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ভাষাকে বালাদেশের কালচারের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিলো তার অর্থ স্পষ্ট। ভাবখানা এই যে যেহেতু রাজনৈতিক বিরোধের কারণে বাংলাদেশী সমাজ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সুতরাং ইসলাম ধর্ম, উর্দু- ফার্সি- আরবী ভাষা এ সমস্তই পরিত্যাজ্য। এগুলো যেনো একচেটিয়াভাবে পাঞ্জাবীদের সম্পত্তি। কালচারের ক্ষেত্রে এটা ছিলো এক চরম দেউলিয়াপনার পরিচয়। আমার মনে আছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন নাৎসীদের বিরুদ্ধে বৃটেন লড়াই করে যাচ্ছে তখন জার্মানীতে শেক্সপিয়ারের রচনাবলী নিয়ে গবেষণা চলতো। একদল জার্মান পন্ডিত এমন দাবীও করেছিলেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর কবি নাট্যকার শেক্সপিয়ারের যথার্থ উত্তরাধিকারী জার্মানরা, হীনবল বৃটিশদের শেক্সপিয়ারের উপর কোনো অধিকার নেই। তেমনি হিটলারের সহযোগী মুসোলিনী যে দেশে রাজত্ব করতেন সেই ইটালিতেই ল্যাটিন ভাষা এবং সাহিত্যের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক দান্তে, বোকাচো, পেত্রার্ক, কাবালকান্তি এঁরা সব ইটালির লোক। কিন্তু মুসোলিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেউ ল্যাটিন কবি ভার্জিল, হরেস, ঐতিহাসিক লিভি বা দান্তে প্রমুখ সাহিত্যিকের বিকদ্ধে সংগ্রাম মনে করেনি। জার্মানীর গ্যেটে, শিলার, হাইনে প্রভৃতির সাহিত্য বর্জন করার কথা ওঠেনি। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিলো না এবং এখনো নেই। কবি হোমার জন্মেছিলেন গ্রীসে প্রায় তিন হাজার বছর আগে। তাঁর অমর মহাকাব্য ইলিয়ড এবং ওডিসি ইউরোপের সর্বত্রই পঠিত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্রই এর মধ্যে নিহিত। কোনো যুগেই ইউরোপের কোনো দেশে গ্রীক সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি কেউ উঠায়নি।

মধ্যযুগে সভ্য ইউরোপে সাধারণ ভাষা ছিলো ল্যাটিন। যেমন মুসলমান আমলে ভারতের সর্বত্র ফার্সির চর্চা হতো। বাংলার মাটিতেও অনেকেই ফার্সিতে কবিতা লিখেছেন, ইতিহাস রচনা করেছেন। ইউরোপে যেমন মধ্যযুগের শেষদিকে আঞ্চলিক ভাষাগুলো উন্নতি লাভ করে বিভিন্ন দেশে নতুন সাহিত্যের জন্ম দেয়; ভারতেও আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে ফার্সির কোন

বিরোধ ঘটেনি। যেমন ঘটেনি ল্যাটিনের সঙ্গে কোনো আঞ্চলিক ইউরোপীয় ভাষার। আঠারো শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপের শিক্ষিত সমাজ পরস্পরের মধ্যে ল্যাটিন- এ ভাব বিনিময় করতে পারতো। এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন ডঃ জনসন ফ্রান্সে বেড়াতে যান, তিনি ল্যাটিন- এ কথা বার্তা বলেছেন। ফরাসী তিনি জানতেন কিন্তু ভয় পেতেন যে তাঁর ফরাসী উচ্চারণ হয়তো শুদ্ধ হবে না।

ল্যাটিন- এর এ ঐতিহ্য ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনো বর্তমান। অক্সফোর্ড- ক্যামব্রিজ সমাবর্তন সভায় প্রধান বক্তৃতা হয় ল্যাটিন- এ। পূর্ব ইউরোপেও এর ব্যতিক্রম নেই। ১৯৭৭ সালে পোলান্ডে পজনান শহরে এক সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটা ভুলবার নয়। সেখানকার ইউনিভার্সিটিতে এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেখলাম বক্তৃতা হলো চার ভাষায়। প্রথমে ল্যাটিন- এ পরে ফরাসীতে তারপর ইংরেজীতে এবং শেষে পোলিশ ভাষায়। ৭৭ সালের পোলান্ড ছিলো কমিউনিস্ট শাসিত। কিন্তু আশ্চর্য হলাম যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা প্রাচীন ঐতিহ্য ত্যাগ করার চেষ্টা করেনি। অথচ বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নাম দিয়ে নতুন সরকার ঢাকা এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটির মনোগ্রামে যে কোরআন শরীফের আয়াত ছিলো সেগুলি তুলে দেয়।

এসব কারণে মনে করার যথেষ্ট হেতু ছিলো যে একাত্তর সালের শেষে যে দল ক্ষমতা অধিকার করে তারা চেয়েছিলো দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন একটি পরিবর্তন ঘটাতে যাতে এর আসল পরিচয় চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কখনো কখনো মনে হতো যে পনেরো শতাব্দীতে সুলতানী আমলে রাজা গণেশ বলে একব্যক্তি যেমন সুলতান পরিবারের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছুকালের জন্য ক্ষমতা দখল করে বসে এ যেনো সে রকম একটা ব্যাপার। রাজা গণেশ সিংহাসন দখল করেই মুসলমান নিশ্চিহ্ন করতে শুরু করে। তখন নূর কুতবে আলম নামক এক বিখ্যাত আলেম সমাজকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে যে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে রাজা গণেশকে তার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে এই রাজা গণেশেরই পুত্র যদু ইসলাম গ্রহণ করে সুলতান জালাল উদ্দিন নামে ইতিহাসে খ্যাত। বাংলাদেশের ইতিহাসে ভবিষ্যতে কি ঘটবে ৭২ সালের শুরুতে তা আমরা কেউ বলতে পারছিলাম না। কিন্তু আমাদের জীবনে যে একটা বিরাট দুর্যোগ নেমে এসেছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান হয় তখন রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক মতামতের জন্য কাউকে কোনো শাস্তি প্রদান করার কথা আমরা ভাবিনি।

কংগ্রেসের হিন্দুরা তো ছিলোই, মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলো। কুমিল্লার আশরাফ আলী চৌধুরীর নাম আমি আগে উল্লেখ করেছি। এ রকম আরো অনেক ব্যক্তি ছিলেন যারা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সংগ্রামের বিপক্ষে কাজ করেছেন। জনাব এ কে ফজলুল হক পর্যন্ত ৪৬ সালের ইলেকশনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তার কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যরা। কিন্তু এদের কাউকে ৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের পর জেলে যেতে হয়নি বা কারো প্রাণহানি ঘটেনি। সরকারী চাকরি থেকে পাকিস্তান বিরোধিতার জন্য কাউকে চাকরিচ্যুত করা হয়নি। বরঞ্চ তখন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে নতুন দেশ গড়ার কাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। গণপরিষদে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাজনীতিতে ধর্মীয় ভেদাভেদের চিহ্ন আর থাকবে না, সবারই সমান অধিকার থাকবে নাগরিক হিসাবে।

যদি বলা হয় যে ৪৭ এবং ৭১ সালের মধ্যে প্রধান তফাৎ এই যে ৪৭ সালে গৃহযুদ্ধের মতো কোনো কিছু ঘটেনি, সে যুক্তিও হবে অচল। কারণ বাস্তবিক পক্ষে ১৯৪৬ সাল থেকে কোলকাতা, বিহার, পূর্ব পাঞ্জাবে যে দাঙ্গা হয় সেটা ছিল একাত্তর সালের ঘটনার চেয়েও ভয়াবহ। বিহার থেকে কয়েক লক্ষ মুসলমান এসে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলো। অন্যদিকে পূর্ব এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রায় চার- পাঁচ কোটি লোক এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে হিজরত করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে কত লোক মারা গেছে তার হিসাব কেউ জানে না। ৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কোলকাতায় যে দাঙ্গা হয় তখন আমি নিজে সেখানে ছিলাম। চারদিনের দাঙ্গায় হাজার চারেক লোক নিহত হয়েছিলো বলে শুনেছি। হঠাৎ কোলকাতার মতো শহর মুসলিম এলাকা এবং হিন্দু এলাকায় বিভক্ত হয়ে যায়। এটাকে যদি গৃহযুদ্ধ না বলি তবে কাকে গৃহযুদ্ধ বলবো? তখন মুসলমানের মনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোভ ও হিংসার সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি হিন্দুরাও মুসলমানের প্রতি চরম বৈরিতার মনোভাব পোষণ করতো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের সরকার কোনো হিন্দু কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেনি। যারা চলে গেলো তারা গিয়েছিল অপশন দিয়ে সেচ্ছায়।

হিন্দুরা বহু সম্পত্তি পূর্ব পাকিস্তানে ফেলে যায়। এ সমস্ত পরিত্যক্ত বাড়ীঘর, জায়গা- জমি সরকারের কর্তৃত্বে রাখা হয়। মুসলিম লীগের লোকেরা এগুলি বেআইনীভাবে দখল করেছে বলে শোনা যায়নি। গ্রামের দূরাঞ্চলে এ রকমের দু'একটা ঘটনা হতে পারে কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে, পাকিস্তান

ও ভারত সরকার উভয়ই পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঢাকার আদূরে নারায়ণগঞ্জে যে তিনটি কাপড়ের মিল ছিলো সেগুলো কোনো মুসলমান এসে দখল করেনি। হিন্দু জমিদারদের বাড়ীঘরও কোনো মুসলিম নেতা ভোগদখল করার সুযোগ পায়নি। অথচ ৭২ সালে ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর এলাকার বহু বাড়ীঘরের মালিক হয়ে বসলেন মুক্তিযোদ্ধারা।

দেশের আইনের কাঠামো নতুন সরকারের প্ররোচণায় যেভাবে ভেঙ্গে পড়লো তার নজির সাম্প্রতিক ইতিহাসে ছিলো না। এই যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হলো এর জের বহুদিন চলবে এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না। সাধারণ লোকে মুজিববাদী সমাজতন্ত্রের অর্থ করেছিলো এই যে এখন আর সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদই চলবে না। শিক্ষিত- অশিক্ষিতের প্রভেদ উঠে যাবে। মেধার কোনো কথা উঠবে না। যার যা দাবী সমাজকে তাই গ্রহণ করতে হবে। আমি হাসপাতালে বসে শুনতাম যে ভদ্রঘরের মেয়েরা সহজে ঘরের বাইরে বের হতে ভয় পেতো কখন কে তাদের হাত ধরে টান দেবে। দেশ ফেরত মুক্তিযোদ্ধারা পছন্দ মতো মেয়েদের জোর করে বিয়ে করতে শুরু করে। বাপ- মা ভয়ে কথা বলতে সাহস পেতো না। বাঁধা দিতে গেলে- সমস্ত পরিবারকে প্রাণ দিতে হতো। বিহারী মেয়েদের কথাই ছিলো না। তারা ছিলো লুটের মালের মতো। যদৃচ্ছা তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। এ রকম বহু করুণ ইতিহাস আমি ব্যক্তিগতভাবে শুনেছি। জানুয়ারীর ১৫ তারিখের দিক থেকে আমি লাঠি ভর করে একটু একটু করে হাঁটবার চেষ্টা করি। সঙ্গে লোক রাখতে হতো। না হলে হঠাৎ করে পড়ে যেতাম। শরীরের উপর দিকের অবশ ভাবটা একটু হ্রাস পেয়েছিলো কিন্তু পা দু'টি ছিলো প্রায় অকেজো। পায়ের তলায় অনবরত এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করতাম। যার ফলে মাটিতে পা রাখতে অসুবিধা হতো। আগেই বলেছি যে বিছানায় এপাশ ওপাশ হতে পারতাম না। আর একটু পরে যখন একটু একটু করে কারো সাহায্য ছাড়াই লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছি তখনই শুনলাম যে আমাকে হয়তো জেলে যেতে হবে। ৩০শে জানুয়ারী সকাল বেলার রাউন্ডে যে ডাক্তার এসেছিলেন তিনি বললেন, আমার সঙ্গে একটু কথাআছে। কামড়া থেকে অন্য লোককে সরিয়ে দিতে বললেন। তারপর জানালেন যে, অর্ডার এসেছে আগামীকাল আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হবে। আমি বললাম, আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। আমি এখনো ভালো করে দাঁড়াতে পারি না। আরো ১৫ দিন যদি হাসপাতালে রাখেন পায়ের শক্তি হয় তো কিছুটা বাড়বে। ডাক্তার বললেন, উপরের হুকুম। তিনি কিছুই করতে পারবেন না। আমি তার সঙ্গে আর

তর্ক করলাম না। বাসায় খবর দিলাম ওরা যেনো চেক বই নিয়ে অবশ্যই সেদিন বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করে। বিকেলে যখন ওদের বললাম যে কাল সকালে আমাকে জেলে যেতে হবে, মেয়েরা কেঁদে ফেললো। কিন্তু করণীয় কিছুই ছিলো না। আমি চেকগুলিতে সই করে দিলাম। বললাম একটু বেশী করে টাকা উঠিয়ে রাখতে। হঠাৎ যদি সরকার আমার ব্যাংক একাউন্ট ফ্রিজ করে তা হলে যেনো অসুবিধায় না পড়তে হয় ।

সেদিন রাত্রে আমার একেবারেই ঘুম হয়নি। জীবনে যা ভাবতে পারিনি তাই ঘটতে যাচ্ছিলো। আমরা যারা এককালে পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম এই বিশ্বাসে যে দেশ ও সমাজকে এভাবে শোষণের দায় থেকে মুক্ত করতে পারবো, তারাই হয়ে গেলাম ঘৃণ্য অপরাধী। আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছলো তা আমাকে জানানো হয়নি। কোন পরোওয়ানাও দেখানো হয়নি। পরোওয়ানা দেখবার কথা বলতেও রুচি হয়নি। কারণ জানতাম যে জিজ্ঞাসা করে কোনো লাভ হবে না তাই সারা রাত ধরে মনে মনে কারাবাসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলাম। ৩১ তারিখে সকাল ১০টার দিকে একজন পুলিশ অফিসার এসে বললেন তিনি আমাকে নিতে এসেছেন। আমি তৈরিই ছিলাম। কাপড়ের ছোট একটা সুটকেস নিয়ে লাঠি ভর করে তার সঙ্গে নীচে গেলাম। শুধু অফিসারকে অনুরোধ করলাম যে যেহেতু জেলখানা যেতে আমার বাসায় সামনে দিয়েই যেতে হবে, তার জিপটা যেনো এক মিনিটের জন্য বাসার গেইটে দঁড়ায়। অফিসার আমার এ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

বিশে ডিসেম্বর থেকে একত্রিশে জানুয়ারী সকাল পর্যন্ত মোট বিয়াল্লিশ দিন হাসপাতালে ছিলাম। আগে বলেছি যে প্রথম সাতদিন ইন্ডিয়ান আর্মির জওয়ানরা আমাকে পাহারা দিতো তখন কোনো বাইরের লোককে আমার অনুমতি ছাড়া ক্যাবিনে আসতে দেওয়া হতো না। অনেকটা নিরাপদ বোধ করতাম। সাত দিন পর যখন বাংলাদেশ পুলিশ পাহারার ভার গ্রহণ করে তখন আর নিরাপত্তা রইলো না। হঠাৎ করে যে কোনো ব্যক্তি কামরায় এসে ঢুকতো। পুলিশকে বললেও কিছু হয়নি। অনেক সময় শুনতাম পুলিশের লোক চা খেতে বা অন্য কোনো কাজে কোথাও চলে গেছে আমাকে না জানিয়েই।

হাসপাতালের প্রশাসনিক দূরাবস্থা দেখে মাঝে মাঝে মন খুব খারাপ হয়ে যেতো। ভি আই পি রুমে যদি আমার এ অবস্থা হয় তবে সাধারণ রোগীদের ভাগ্যে কি ঘটছে অনুমান করতে পারতাম। পীড়াপীড়ি না করলে সাতদিনেও বিছানার চাদর পাল্টিয়ে দেওয়া হতো না। আর যে চাদর পেতাম তাও ভালো করে ধোয়া

নয়। খাবার ব্যবস্থা ছিলো অতি নিকৃষ্ট। মাঝে মাঝে তরকারীতে মাছি, পোকা পাওয়া যেতো। খেতে পারতাম না। শেষ পর্যন্ত বাসা থেকে খাবার আনিয়ে খেয়েছি। তবে এ কথা স্বীকার করবো যে ডাক্তার সাহেবদের কাছে কোনো দুর্ব্যবহার পাইনি। আমি মুজিব বিরোধী ছিলাম বলে আমার প্রতি কেউ অবজ্ঞা দেখাননি। রাউন্ডে রোজই তারা আমার ক্যাবিনে আসতেন এবং ঔষধপত্রের জন্য আমাকে কোন পয়সা দিতে হয়নি। গ্রেফতারকৃত রোগী ছিলাম বলে ক্যাবিনের ভাড়াও আমার কাছ থেকে আদায় করা হয়নি। নিরাপত্তা নিয়েই নানা আশংকা বোধ করেছি। যেরূপ অরক্ষিত অবস্থায় ছিলাম হঠাৎ কোনো দুষ্কৃতকারী এসে আমাকে খুন করে ফেললেও আশ্চর্য হওয়ার কারণ থাকতো না। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। সেজন্য এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি।

জেলে প্রবেশ

১৯৭২ সালের একত্রিশে জানুয়ারী যখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম মনে হলো এবার সত্যিকারভাবে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আমার সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। জেল আমাদের বাসার কাছে হলেও জেলের অভ্যন্তর ভাগ কেমন সে অভিজ্ঞতা ছিলো না। আমাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় টেবিলে। এখানে এক জেল কর্মচারী আমার নাম পরিচয় ঠিকানা লিখে নিলেন। আমার সঙ্গে জিনিসপত্র কি আছে তা বলতে হলো। ঔষধপত্র সবই ওরা রেখে দিলো। বলা হলো যে, যে ঔষধের দরকার হবে জেল থেকেই তা সাপ্লাই করা হবে, কয়েদীর নিজের কাছে ঔষধ রাখবার অধিকার নেই। সেইফটি রেজারের সমস্ত ব্লেডও রেখে দিতে হবে। এটাও রাখার নিয়ম নেই। পরে শুনেছি ব্লেড, ছুরি, কাঁচি, দা এমন কি রশি পর্যন্ত কোনো কয়েদীকে রাখতে দেওয়া হয় না। থিওরি হচ্ছে যে জেলের অস্বাভাবিক পরিবেশে অনেকে আত্মহত্যার কথা ভাবে এবং এসব জিনিস পেলে তা দিয়ে নিজের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কথাটা যে অমূলক নয় বুঝতে দেরী হয়নি।

আমাকে নিয়ে আসা হলো সাত সেলে। এখানে সাতটা সেল আছে বলে সাধারণভাবে পাহারাদাররা একে সাত সেল বলে। চারদিকে দেওয়াল দেওয়া একদিকে ঐ এলাকায় ঢোকার একটা দরজা। দেখলাম সারা জেল অনেকগুলি ছোট অংশে বিভক্ত। ওখানে যে সমস্ত কয়েদীকে রাখা হয় তাদের পক্ষে অন্য কোন কয়েদীর সঙ্গে দেখা- সাক্ষাতের কোনো সুযোগ নেই।

সাত সেল- এ যাদের রাখা হয় তারা প্রথম শ্রেণীর কয়েদী। সাধারণ কয়েদীরা যে অঞ্চলে থাকে তাকে বলা হয় খাতা। সেখানে এক কামরায় ৪০- ৫০ জন করে লোক ঠাসাঠাসি করে- শোয়। তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয় দু'টো কম্বল- একটা বিছাবার একটা গায়ে দেবার। বালিশের কোন ব্যবস্থা নেই। বলাবাহুল্য এ সমস্ত তথ্য পরে জানতে পেরেছি।

আমাকে 'সাত সেলে' -নিয়ে এলেও প্রথম সাত দিন সাধারণ কয়েদীদের মতো দু'টো কম্বল নিয়ে মেঝেতে শুতে হয়েছে। আর খাবারও খেতে হয়েছে সাধারণ কয়েদীর, তবে সেলে যাদের পেয়েছিলাম তারা আমাকে সাহায্য করায় অসুবিধা যতোটা হওয়ার কথা ছিলো ততোটা হয়নি। সাত সেলে পেলাম ডক্টর দীন মোহম্মদ ও ডক্টর মোহর আলীকে। ওঁরা প্রথম থেকেই প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর মর্যাদা ভোগ করছিলেন। সন্ধ্যা হওয়ার একটু আগে দীন মোহম্মদ চুপ করে একটা বালিশ দিয়ে গেলেন। ওটা উনি বাসা থেকে আনিয়েছিলেন। ওঁদের জন্য যে খাবার আসতো তার অংশ আমাকে দিতেন। সাধারণ কয়েদীর খাবার যে কতোটা নিম্নমানের তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। সকাল বেলা এক ধরণের জাউ পেতাম। সেটা যেমন বিস্বাদ তেমনি তা দেখলেও মন বিষিয়ে উঠতো। দুপুর বেলা মোটা ভাতের সঙ্গে মাছ বা গোশতের একটা সালুন দেওয়ার কথা। কিন্তু মাছ বা গোশতের সন্ধান পাওয়া যেতো না। কোথাও কোন কাঁটা বা হাড়- এ রকম কিছু চোখে পড়লে বুঝা যেতো এটা মাছের বা গোশতের তরকারী। অথচ শুনেছি জেলের নিয়মাবলীর মধ্যে সবশ্রেণীর কয়েদীর যে খাদ্য তালিকা নির্দিষ্ট তাতে আমাদের দেশের মান অনুযায়ী কয়েদীর ভালো খাবারই পাবার কথা। কিন্তু ওসব কিতাবী নিয়ম কোন জেলেই নাকি অনুসরণ করা হয়না।

সবচেয়ে শক পেলাম টয়লেটের অবস্থা দেখে। 'সাত সেলে'র জন্য এক লাইনে পাঁচটা টয়লেট ছিলো। সামনে একটা দেয়াল। কিন্তু টয়লেটগুলোর মধ্যে কোন দরজা বা পর্দা নেই। একজনের সামনে দিয়েই আর এক ব্যক্তিকে অন্য পায়খানায় ঢুকতে হতো। ময়লা পরিস্কার করতো সশ্রম কারাদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা।

'সাত সেলে' আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ফরিদপুরের ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবের ভাই ফাইকুজ্জামান। পা ভাঙ্গা খোঁড়া লোক। তাঁর অপরাধ তিনি ওয়াহিদুজ্জামানের ভাই। ফরিদপুরের আর এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর নাম ভুলে গেছি। আর দু'জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন রাজশাহীর আয়েনউদ্দিন আর এক পুলিশ ইন্সপেক্টর শামসুদ্দীন। আয়েনউদ্দিন সাহেবকে আগে থেকেই চিনতাম।

তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় রাজশাহীতে। মুসলিম লীগ পার্লামেন্ট পার্টি মেম্বর হিসাবে তিনি ইউনিভার্সিটি সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন।

দেখলাম আমাদের সাতজনের কাজ কর্ম করার জন্য একজন 'ফালতু' মোতায়েন করা আছে। সেও নিম্নশ্রেণীর এক কয়েদী। দালাল আইনে গ্রেফতার হয়েছিলো। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক। তার অপরাধ কি তা- ও তাকে বলা হয় না। তার পরিবারের কথা মনে করে সে প্রায়ই কান্নাকাটি করতো।

অধ্যায় ১২

টেন সেলের ঘটনা

এ সময় কলাবরেটর কেসে আত্মরক্ষার জন্য অনেকে উকিলের পরামর্শে একটা শব্দ ব্যবহার করতেন। সেটা হলো DURESS অর্থাৎ চাপ। সবাই বলেছেন যে পাকিস্তান আর্মির চাপে তাদের অনেক কিছুই করতে হয়েছে যা হয়তো স্বেচ্ছায় তাঁরা করতেন না। এ কথা বলা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ অসত্য তাও নয়। আমি আগে বলেছি যে, পাকিস্তান আর্মি বাংলাভাষী প্রায় সবাইকে অবিশ্বাস করতো। সে জন্য তাদের রোষে না পড়ার একটা উপায়া ছিল একটু বেশি করে ইসলাম প্রীতি জাহির করা। এটা ছিলো অত্যন্ত বিব্রতকর একটা অবস্থা। আবার এদিকে প্রকাশ্যে শেখ মুজিবের বিরোধিতা করেছে এ অভিযোগ প্রমাণিত হলেও রক্ষা ছিল না। আমার মনে আছে ফজলুল কাদের চৌধুরিকে যখন কোর্টে হাজির করা হয় তিনি পর্যন্ত বললেন যে, তিনিও এক সময় মুজিবকে সাহায্য করেছেন এবং এমন ভাষা ব্যবহার করলেন যাতে মনে হতে পারে যে, তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। তাঁর জন্য দুঃখ্য হলো। অনেকের বোধ হয় মনে নেই যে, ১৬ই ডিসেম্বরের পর ফজলুল কাদের সাম্পান ভাড়া করে কিছু টাকা- পয়সা নিয়ে আরাকানের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফজলুল কাদের চৌধুরীর মতো ব্যক্তির পক্ষে আত্মগোপন করা অসম্ভব ছিল। পথ থেকে তাঁকে ধরে আনা হয়।

আমি উল্লেখ করতে ভুলে গেছি যে 'সাত সেলে' যখন প্রথম আসি তখন যাদের পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হাফিজউদ্দিন। হাফিজউদ্দিন ইসলামিয়া কলেজের আমার পুরানো ছাত্র। সে ছিলো এক ব্যাংকের ম্যানেজার। সম্ভবতঃ মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের ম্যানেজার। শেখ মুজিবের এক কেইসে তাকে সাক্ষী দিতে হয়, এই অপরাধে তার কারাবাস। সে ছিল খুব দিল খোলা লোক। মতাদর্শের দিক থেকে চরম মুজিব ভক্ত। সবাই বলতো আপনার মত ব্যক্তিকে কেন জেলে আসতে হল? পূর্ব পাকিস্তান কিভাবে শোষিত হয়েছে সে সম্পর্কে অনেক আজগুবি গল্প তার কাছে শুনতাম। দেশে নতুন ব্যাংক চালু করার প্রয়োজন যখন ঘটে তখন শেখ মুজিবের বার্তাবহ এক ব্যক্তি এসে তাকে নিয়ে যায়। সেদিনকার ঘটনটি বিশেষভাবে মনে থাকবার কারণ হাফিজউদ্দিন রাতের ভাত কিছুটা জমা করে পান্তা করে রেখেছিল। সকাল বেলা কাঁচা মরিচ আর পিয়াজ দিয়ে এসব খাবে- এই ইচ্ছা ছিল। প্রথমবার যখন খবর আসে তাকে জেলের

অফিসে যেতে হবে, সে জানায় সে গোসল সেরে নাশতা করে যাবে। দশ মিনিট পর আবার তাগিদ এলো। এবারও সে একই জবাব দিলো। মুক্তি আসন্ন এটা তাকে জানানো হয়নি। স্থির করেছিলে পান্তাটা খেয়েই সে যাবে। তৃতীয়বার আসল খবর পাওয়া গেলো। পান্তা আর তার খাওয়া হলো না। আমরা মোবারকবাদ জানিয়ে তাকে বিদায় দিলাম। এরপর আর কখনো তার সাথে দেখা হয়নি। হাফিজউদ্দিন ছিলো অত্যন্ত নিঃরহঙ্কার। বেশ লেখা পড়া জানতো। এ রকম লোকের মাথায় মুজিববাদী প্ররোচনা কিভাবে বাসা বেঁধে ছিলো তা নিয়ে আমি আর মোহর আলী অনেক জল্পনা- কল্পনা করেছি। জেলে কিছুদিন থাকবার পর ডাক্তার বাসেত স্থির করেন যে, তিনি শেখ মুজিবের কাছে মুক্তির আবেদন করবেন। তাঁকে নিরস্ত করা গেলো না। তাঁর আবেদনে আর্মি DURESS বা চাপের কথাতো ছিলোই আর ছিল তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা। এতে হয়তো কিছুটা কাজ হয়েছিলো। কারণ আমাদের ছয়মাস আগে, ৭৩ সালের মে বা জুন মাসে তিনি রেহাই পান।

তার কিছুকাল পরেই আমাকে জানানো হয় যে, নতুন 'টেন সেলে' আমাকে বদলী করা হবে। আমি এ অপেক্ষায়ই ছিলাম। কারণ আবদুল আউয়ালের উপস্থিতিতে একেবারে অতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিলাম। 'নতুন টেন'- এর বিল্ডিংটা ছিলো দোতলা। নিচের যে অংশে আমরা থাকতাম তার মধ্যে ছিলো কয়েকটা সেল। এখানে পেলাম খাজা খয়ের উদ্দিন, মওলানা নুরুজ্জামান, ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন এবং মওলানা মোখলেসুর রহমানকে। এই শেষোক্ত ব্যাক্তির সাথে আমার আগের পরিচয় ছিলো না। তিনি ইসলাম মিশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান চালাতেন। তেজগাও এলাকায় তিনি একটা এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পাকিস্তান পতনের কয়েকদিন আগে এটার উপর ইন্ডিয়ানরা বোমা হামলা করে। এক সঙ্গে তিনশ' এতিম মারা যায়। বাকী আর তিন জনকে আগে থেকেই চিনতাম। মওলানা নুরুজ্জামান আমার ফুপাতো ভাই সৈয়দ মুঈনুল আহসানের সহপাঠী- বরিশালের লোক- নামজাদা মওলানা। ১৬ই ডিসেম্বরের পর তাঁর বাড়ি- ঘর ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয়। আখতার উদ্দিন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন থেকে তাঁকে চিনতাম। তখন সম্ভবতঃ উনি ল' পড়ছেন অথবা পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের এমএ- তে ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যে চারজন ছাত্রকে নিয়ে আমি বার্মা সফরে যাই তার মধ্যে আখতার উদ্দিনও ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন ঢাকার নবাব বাড়ীতে। খাজা নসরুল্লাহর মেয়েকে। সেই সুত্রে খাজা খয়েরউদ্দিনের আত্মীয় হতেন।

খাজা খয়েরউদ্দিনকে শুধু নামে চিনতাম। এই প্রথম দেখা মুসলিম লীগের লোক। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যে কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠন করেন তার বিরোধিতা করে খাজা খয়েরউদ্দিনরা কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আইয়ুব সরকারের সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন। খুব খোশ- মেজাজী লোক। গল্পগুজব করতে ভালোবাসতেন। ভালো খাবারের দিকে আগ্রহ ছিলো। বিশেষ করে পনিরের প্রতি ছিলো দারুণ আকর্ষণ। ঢাকাই পনির ভেজে দিলে আর সব কিছু বাদ দিয়ে ওগুলি খেতেন।

খাজা সাহেবের কাছে শুনেছি যে, ১৬ই ডিসেম্বরের পর তিনি কিছুকাল আত্মগোপন করেছিলেন। একদিন গেরিলারা যে বাসায় তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে তাঁর খোঁজে এসে হাজির হয়। তিনি তখন এক গোসলখানায় ঢুকে পড়েন। গেরিলারা সেখানেও সার্চ করবে বলে জিদ ধরে তখন তাঁর এক আত্মীয়া অন্য পথে গোসলখানায় ঢুকে দরোজা ফাঁক করে গেরিলাদের ধমকান এই বলে যে তোমাদের কি মা- বোনদের মান- ইজ্জতের কোন জ্ঞান নেই। আমি গোসল করছি। এখানে ঢুকবে কিভাবে। এরপর ওরা চলো যায়। পরে খাজা সাহেব- উপায়ন্তর না দেখে পুলিশের কাছে সারেন্ডার করেন।

তিনি ছিলেন ঢাকা পিস কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর বিরুদ্ধে মুজিব দলের আক্রোশ ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁকে খুনের মামলায় জড়াবার চেষ্টা করা হয়। খাজা সাহেবের মামলা যখন শুরু হয় তখন তিনি কোর্টে একটি বিবৃতি পাঠ করেন। এটা রচনা করতে আমিও তাঁকে সাহায্য করেছিলাম। কথাগুলি ছিলো খাজা সাহেবের। কিন্তু ভাষা অধিকাংশই আমার। দুর্ভাগ্যবশতঃ খাজা সাহেব দলিলটি হারিয়ে ফেলেছেন। এই বিবৃতিতে তিনি যে কথা বলেন আর কোন মুসলিম লীগ নেতা সে রকম কথা বলেন নি বা বলতে সাহস পাননি। তাঁর বক্তব্য ছিলো যেমন সাহসী তেমনি দ্বিধাহীন। তিনি বলেছিলেন যে, মুসলিম লীগ তাঁরই পূর্ব পুরুষ নওয়াব সলিমুল্লাহর সৃষ্টি। এই আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জন্মসূত্রেই জড়িত। সুতরাং '৭১ সালে পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে হুমকি দেখা দেয় তার মধ্যে পক্ষ নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠেনি। যে আদর্শ যে বিশ্বাসে তিনি লালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন তা রক্ষা করার চেষ্টা তিনি করেছেন কর্তব্য মনে করে। এজন্য বর্তমান অবস্থায় যদি তাকেঁ শাস্তি দেওয়া হয় সেটা হবে অন্যায়। কিন্তু তিনি কিছুতেই বলবেন না যে '৭১ সালে তিনি ভুল করেছিলেন।

খাজা সাহেবের মামলা শেষ হবার আগেই '৭৩ সালের ডিসেম্বরে আমরা সবাই মুক্তি পেয়েছিলাম। সুতরাং খাজা সাহেবের কি শাস্তি হত সেটা আর বুঝা

গেল না। মাওলানা মোখলেসুর রহমান ও মওলানা নুরুজ্জামান দু'জনই ছিলেন খুব গোঁড়া লোক। এদের সঙ্গে ইসলাম সম্বন্ধে কথা বলতে ভয় করতো। কারণ অল্পতেই তাঁরা ঈমান নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন। একবার কি প্রসঙ্গে যেন দর্শনের কথা ওঠে। দর্শনের চরিত্র ব্যখ্যা করতে যেয়ে মহা মুশকিলে পড়লাম। উভয়ই ঘোষণা করলেন যে দর্শনের সংস্পর্শে এলে কারো ঈমান ঠিক থাকার কথা নয়। মোখলেসুর রহমান সাহেব দাবী করলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস থেকে দর্শন বিষয়টি তুলে দেওয়া দরকার। এঁর সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক মনে করলাম।

মওলানা নুরুজ্জামানের সেলের পাশে যে ভদ্রলোক থাকতেন তিনি ইস্ট পাকিস্তান সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারী পদে ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব মোটেই ছিল না। কিন্তু নামাজ- রোজা করতেন বলে তাকেঁ চাকরীচ্যুত করা হয়। বয়স পঞ্চাশের মাঝামাঝি, কিন্তু দেখলে মনে হতো আশির মতো। খুব জয়িফ হয়ে পড়েছিলেন। হাত কাঁপতো। খুব অমায়িক লোক। অল্প কথা বলতেন। শুনলাম তিনিও নাকি আমার ফুপাতো ভাই সৈয়দ মঈনুল আহসানের সহপাঠী ছিলেন। লক্ষ্য করতাম যে, তিনি খানা খেতেন দেশী মাটির বাসনে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি মনে করেন এ রকম বাসন ব্যবহার করা সুন্নত। রসূল (সঃ) তো মাটির বাসনেই খেতেন। আমি বললাম, চিনামাটির বাসনও তো মাটির বাসন। সেটা ব্যবহার করা সুন্নতের খেলাফ হবে কেন? তিনি কথাটি কখনো আগে ভেবে দেখেননি। আমার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন।

মওলানা নুরুজ্জামানকে নিয়ে একদিন এক অস্বস্তিকর সমস্যায় পড়েছিলাম। সেদিন পৃথিবীর নানা দেশের কথা হচ্ছিলো। মওলানা সাহেব 'চাইলের' স্বৈরশাসকের কথা উল্লেখ করলেন। আমি তো প্রথমে বুঝতেই পারলাম না কোন দেশের কথা তিনি বলছেন। পরে টের পেলাম 'চিলি' কে তিনি 'চাইল'- বলছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে তাঁর উচ্চারণ সংশোধন করার প্রবৃত্তি আমার হলো না। তিনি ভালো ইংরেজী বলতে পারতেন। একদিন ডক্টর শহীদুল্লাহ সম্পর্কে এক মজার গল্প শুনালেন। ফেকাহ শাস্ত্রের একখানা বিখ্যাত কিতাবের নাম -'বাকায়া'। আলিয়া মাদ্রাসায় এটা পড়ানো হয়। কিন্তু কিতাবখানা এত কঠিন যে সাধারণত ছাত্ররা মূল বাকায়াহটার ধারে কাছে না গিয়ে শারহে বাকায়া বা বাকায়া বোধিনী নামক পুস্তকের উপর নির্ভর করে। একদিন নাকি মাদ্রাসা সিলেবাস সম্পর্কে এক কমিটির আলোচনা প্রসঙ্গে 'বাকায়ার' কথা ওঠে। শহীদুল্লাহ সাহেব কমিটিতে ছিলেন। তিনি বার বার আপত্তি জানিয়ে বলতে থাকেন

কিতাবখানার নামতো 'শারহে বাকায়া' নুরুজ্জামান সাহেব বললেন আমি তো শুনে অবাক। বুঝলাম ডক্টর শহীদুল্লাহ কোনো দিন মূল বাকায়ার নামই শোনেননি।

'বিশ সেলের' কাছাকাছি ছিলো জেলের পাগলা গারদ। সেখান থেকে অনবরত চেঁচামেচির আওয়াজ কানে আসতো। এ পাগলাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলো যাকে সবাই বুজুর্গ মনে করতো। সে এখনো জেলে আছে কিনা জানি না। শুনেছি ১৬ই ডিসেম্বরের পর যখন জেলের ফটক খুলে দেওয়া হয় এবং সব কয়েদী বেরিয়ে যায় তখনো এ লোকটা তার আস্তানা ত্যাগ করেনি। এ ঘটনার ফলে জেলের পাহারাদারদের চোখে তার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। প্রথম প্রথম পাগলদের চেঁচামেচিতে ঘুমের ব্যাঘাত হতো। তারপর এতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। 'বিশ সেলের' উপর তলায় কয়েকজন কম্যুনিস্ট কয়েদী ছিলো। একজন ছিল রণজিৎ। আরেকজন পাবনার টিপু বিশ্বাস। এদের নামতে দেওয়া হতো না। তবে খাজা খায়েরউদ্দিন নীচে থেকে রণজিতের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন এবং তার চিঠিপত্র বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও মাঝে- মধ্যে করতেন। এ রকম একটা লম্বা চিঠি খাজা সাহেব আমাকে দেখিয়েছিলেন। ইংরেজীতে লেখা তার মধ্যে ছিলো মার্কসিস্ট দর্শনের আলোচনা। কিছুটা পড়ে দেখলাম রণজিৎ নামে এই ভদ্রলোক বিশ্বাস করেন যে মার্কসিস্ট দর্শনে বিশ্ব রহস্যের সমাধান রয়েছে। দুনিয়ায় এমন কোনো কিছু নেই যার ব্যাখ্যা এই দর্শনে নেই। এ লোকটিকে আমি কখনো দেখিনি। কারণ ঘাড়ে পিঠে ব্যাথা থাকার কারণে আমি মুখ উঁচু করে উপর দিকে তাকাতে পারতাম না।

মুজিববাদ

একদিন টিপু বিশ্বাস এক বিস্ফোরণ সৃষ্টি করলেন। জেলের কোনো কর্মচারীর ব্যবহারে রেগে ফেটে পড়ে বিষম জোরে ওদের শাসাতে লাগলেন এই বলে যে এর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বেন। জেল কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে থাকেন যে তিনি একেবারে অসহায় তবে এটা তাদের চরম ভুল। তার চিৎকারে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। জেল কর্তৃপক্ষ কোন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন না করে চুপ করে রইলেন। এত তর্জন গর্জন আমি জীবনে কখনো শুনিনি। বলা বোধ হয় প্রয়োজন যে টিপু বিশ্বাস একটি বামপন্থী সন্ত্রাসী দলের নেতৃত্ব করতেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটেছিলো কেনো সে রহস্যের সন্ধান আমি কখনো পাইনি। তবে এটা লক্ষ্য করেছি '৭২- ৭৩ সালে বহু লোক যারা একাত্তরে শেখ মুজিবকে সমর্থন

করেছিল এবং বহু দক্ষিণপন্থী লোকদের হত্যা করে বিজয় উল্লাস করতো তাদের সঙ্গেও আওয়ামী লীগের বিরোধ ঘটতে শুরু করে। আওয়ামী লীগ মনে করতো তাদের কোনো নীতি বা কর্মের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করা চলবে না। সামান্য সমালোচনা করলেও এরা মনে করতো যে আওয়ামী লীগের কর্তৃত্বে ফাটল ধরবে। শেখ মনি তো প্রথম থেকেই প্রচার করতে শুরু করেছিলো যে মুজিববাদের মত এমন একটা অভিনব রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক আদর্শ দুনিয়ায় আর কখনো দেখা যায়নি। এ সমস্ত কথা এ সময়ের বাংলা ও ইংরেজী দৈনিকে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হতো। শেখ মুজিব যিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক নেতা, তিনি হঠাৎ হয়ে গেলেন কার্ল মার্কসের মত এক তাত্ত্বিক। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে যে খন্দকার ইলিয়াসের মত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও 'মুজিববাদ' নামক এই অদ্ভুত তত্ত্ব পুরাপুরি হজম করেছিলেন।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে আমি, ডক্টর মোহর আলী ও ডক্টর দীন মোহাম্মদ ইউনিভার্সিটি থেকে চিঠি পেলাম যে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ দালাল হিসেবে আমাদের বরখাস্ত করেছেন। আমার বেলায় এই পদচ্যুতির তারিখ ছিল বোধ হয় ১৩ই জুলাই। তার অর্থ ১৯শে ডিসেম্বর '৭১ থেকে '৭৩ সালের ১৩ই জুলাই পর্যন্ত আইনতঃ ইউনিভার্সিটিতে আমার চাকরী বহাল ছিল। কিন্তু আমার বকেয়া বেতন পরিশোধ করা দূরে থাকুক, আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিতেও প্রথমে তারা অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত ডক্টর আবদুল মতিন চৌধুরীর আমলে যখন প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দেওয়া হয় তখন শুধু আমার নিজের জমা দেওয়া টাকাটাই পেয়েছিলাম। এর সমপরিমাণ টাকা ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে ঐ ফান্ডে জমা দেওয়ার কথা। সেটা আমাকে দেওয়া হয়নি। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসান সুপ্রীম কোর্টে মামলা করে যখন রায় পান যে দালাল আইনে আমার পদচ্যুতি সম্পূর্ণ অবৈধ তখনো ইউনিভার্সিটি সিন্ডিকেট আনুষ্ঠানিকভাবে সেই পদচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহার করেনি এবং আমাকে কোন খেসারত দেওয়া হয়নি। আমি যখন খেসারতের জন্য চিঠি লিখি তারা এক নতুন অজুহাতের আশ্রয় নিলেন, রেজিস্টার আমাকে জানালেন যে ইউনিভার্সিটি বা সরকারের এক নিয়ম আছে যে পদচ্যুত থাকাকালীন অন্য কোথায়ও যদি চাকরী গ্রহণ করেন তবে তিনি নতুন চাকরিতে যে বেতন পাবেন সেটা খেসারত থেকে বাদ দিয়ে শুধু বাকী টাকাটাই তাকে দেওয়া হবে। এই অদ্ভুত নিয়মের যৌক্তিকতা কি তা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। যদি সত্যিই এ রকম নিয়ম থেকে থাকে তবে তার অর্থ এই হবে যে পদচ্যুত ব্যক্তির যদি খেসারত প্রাপ্তির আশা থাকে তবে

তাকে চুপ করে কোন কাজকর্ম না করে অনাহারে থাকতে হবে। আর নতুন চাকরীর বেতন যদি পুরানো চাকরীর বেশী হয় তখন আর খেসারত প্রদানের প্রশ্ন উঠবে না। আমার বেলায়ও তাই ঘটেছিলো। এই সমস্ত প্রশ্ন যখন দেখা দেয় তখন আমি মক্কার ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করি। সেখানে ঢাকার চেয়ে বেশী বেতন পেতাম বলে আমাকে আমার প্রাপ্য দেওয়া হলো না।

'৭৩ সালের আরেকটি ঘটনা হচ্ছে যে আমার বিরুদ্ধেও দালাল আইনে সরকার মামলা রজু করেন। আমাকে এ নিয়ে দু'বার কোর্টে হাজির হতে হয়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। কোনো উকিল পাওয়া গেলো না। শেষ পর্যন্ত আমার ফুপাতো ভাই সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসান যিনি নিজে কিছুদিন আগে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, সাহস করে আমার কেইস পরিচালনা করতে এগিয়ে আসেন। মঞ্জুর আমাকে বলে দিয়েছিল যে, হাকিম আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোর্টে অভিযোগগুলো পাঠ করে শুনাবে এবং জিজ্ঞাসা করবে আমি গিল্টি বা দোষী নই কি না। আমাকে বলা হলো আমি যেনো বলি নট গিল্টি। তাই বললম। তারপর মামলাটি কিছুদিনের জন্য মুলতবি হয়ে যায়। দ্বিতীয় তারিখে আবার আমাকে কোর্টে হাজির হতে হয়। তখনো আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসানের সঙ্গে হাকিমের আলোচনার পর মামলাটি মুলতবি করা হয়। এটা ১৯৭৩ সালের শেষ দিকের ঘটনা। আর আমাকে কোর্টে যেতে হয়নি। কারণ ঐ সালের ৫ই ডিসেম্বর আমরা সবাই জেল মুক্ত হই।

'৭৩ সালের শেষার্ধে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। উত্তর বঙ্গে দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলো সে কথা আগে একবার উল্লেখ করেছি। অন্য দিকে হঠাৎ করে সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করতে যেয়ে সরকার যখন মিল- কারখানা অনভিজ্ঞ এবং দুশ্চরিত্র লোকদের হাতে অর্পণ করেন তখন উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং দেশের চতুর্দিকে দেখা দেয় চরম অভাব- অনটন। কিন্তু কাগজ পত্রে এ সম্বন্ধে কোন সমালোচনা হতো না। শুধু সংবাদ পাঠ করে আঁচ করা যেতো দেশে কি হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গের লাইফ স্টাইল

একদিকে দেশের এই দুর্দশা অন্য দিকে শুনতাম আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের বিলাসবহুল জীবনের কথা। এ সময় গাজী গোলাম মোস্তফা নামক এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশ রেডক্রসের প্রধান করা হয়। দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী সাহায্য আসা শুরু করে তার বন্টন- বিতরণের ভার ছিল

এই গোলাম মোস্তফার উপর। শুনতাম সাহায্যের সিকি পরিমাণ অর্থও লোকের হাতে পৌছাত না। খাদ্য- ঔষধ- কাপড়- চোপর- কম্বল ইত্যাদি যা এসেছিলো তার কিছুটা বিক্রী হতো ব্ল্যাক মার্কেটে, আর কিছু যেত ইন্ডিয়ায়। হেনরি কিসিঞ্জার একবার রিলিফের দ্রব্যাদি দিল্লীর রাস্তায় দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তখন এ দেশকে বটমলেস ব্রেড বাসকেট বা তলাবিহীন রুটির ঝুড়ি এই আখ্যা দেন। এ দুর্নাম আমাদের এখনও কাটেনি। হিসাব করে দেখা গেছে যে একাত্তরের পর কয়েক বছরে বাংলাদেশ যে বিদেশী সাহায্য পেয়েছিলো তার পরিমাণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত জার্মানী মার্শাল প্ল্যানের যে সাহায্য পায় তার চেয়েও বেশী। অথচ এর বিনিময়ে দেশ কিছুই পেল না। কারণ বলা নিষ্প্রয়োজন। এই বিপুল অর্থের সিংহভাগ বিদেশী ব্যাংকে জমা হতো আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নামে, দেশে তখন কে সবচেয়ে ধনী এরকমের একটা প্রতিযোগিতর কথা আমাদের কানে আসতো। অনেকের ধারণা ছিলো রেডক্রসের গাজী গোলাম মোস্তফাই নাকি বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমাদের কানে যে সমস্ত কথা এসেছে আমি সে কথাই বলছি। কারণ এ সব খবরের সত্যতা যাচাই করার সাধ্য আমাদের ছিল না।

আর এক গল্প শুনেছি। সে আরো মজার। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় এক নেতার বাড়ীতে তখন নাকি খানাপিনা তৈরী হতো তিন রকমের। দেশী, মোগলাই এবং সাহেবী। একদিন শুনেছি ছাত্রলীগের এক সদস্য যার সঙ্গে শেখ মুজিবের ছেলেদের বন্ধুত্ব ছিলো এই নেতার বাড়ীতে বেড়াতে আসে। তাকে দুপুরের খাবার খেয়ে যেতে বলাহয়। সে রাজী হয়। জিজ্ঞাসা করা হয় সে তিন ধরনের খাবারের কোনটা খাবে। সে মোগলাই খাবে বলে জানায়। পেট ভরে পোলাও- কোরমা খাবার পর যখন পেটে একেবারে জায়গা ছিল না তখন তার ধারণা হয় যে বিদায় নেবার আগে দেশী খানার চেহারাটা একবার দেখে নেবে। সেই টেবিলে যেয়ে তার তো চক্ষু স্থির। বড় বড় চিতল এবং রুই মাছের টুকরো দেখে ভরা পেটেও তার জিহ্বায় পানি আসে। কিন্তু তখন ওসব খাবার উপায় ছিলো না। তবুও সে এক টুকরা চিতল খাওয়ার লোভ সামলাতে পারেনি। এই ছাত্রটির মুখে যিনি গল্পটি শুনেছিলেন তিনিই আমাকে এসব কথা জানান।

আরো শুনেছি গাজী গোলাম মোস্তফার একটা কাজ ছিল রিলিফের টাকা দিয়ে আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের দৈনিক বাজার করে দেওয়া। শুনতাম '৭২- '৭৩ সালেও এদের প্রত্যেকের বাড়ীতে কাঁচা বাজারই হতো প্রায় হাজার টাকা। অর্থনীতি ধ্বংস হওয়ার আরেক কারণ মিল- কারখানা রাষ্টায়ত্ত হবার পর

কেউ আর কাজ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। অনুপস্থিত থেকেও অনেকেই বেতন নিয়েছে। আবার অনেক ভুয়া নাম বেতনের খাতায় বসিয়ে নতুন ম্যানেজাররা তাদের বেতন বাবদ টাকা নিতেন। সারা দেশে এভাবে শুরু হয় লুটপাটের পালা। মুক্তিযোদ্ধারা অবাঙ্গালী এবং পাকিস্তানপন্থী বাঙালীদের বাড়ীঘর সহায় সম্পত্তি দখল করে বসে। '৭৩ সালের সেপ্টেম্বর- অক্টোবরের দিকে অবস্থা যখন চরমে পৌছায় তখন বিপুল সংখ্যক লোকজনকে জেলে অটকে রেখে পোষণ করা হয়। সরকারের পক্ষে এটা কঠিন হয়ে পড়ে। এই কয়েদীদের অন্তত দু'বেলা খেতে দিতে হতো। আমি একথা বলছি না যে শুধু এই কারণেই ডিসেম্বরে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এ কারণটি যে সরকারী সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলেছিলো তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অক্টোবর থেকে সাধারণ ক্ষমার গুজব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এরকমের কথাবার্তা দু'বছরের মধ্যে অনেকবার শুনে নিরাশ হয়েছি বলে আমার নিজের মনে এ সময় কোনো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি। তারপর সরকার শেষ পর্যন্ত যখন ঘোষণা করেন যে দালাল আইনে আটক সমস্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তখনো এই আদেশে কতগুলো শর্ত আরোপ করা হয়। প্রথমতঃ খুন জখম এ রকমের কোনো অপরাধে যারা দন্ডিত হয়েছিলো তাদের বেলায় এটা প্রযোজ্য হবে না, এবং সে সম্বন্ধে সরকার নতুন কোন তদন্ত করবে না।

তাছাড়া কোর্টে যাদের মামলা ঝুলছিলো তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো যে সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দেখিয়ে হাকিমের কাছ থেকে ছাড় নিতে হবে। এতে কারো কারো বেলায় জেল থেকে মুক্ত হতে বেশ কয়েকদিন লেগে যায়। আমাকে মুক্ত করা হয় পাঁচই ডিসেম্বর। সকাল বেলায় আমার ফ্যামিলি আমাকে নিতে এসে শুনলো যে, কোর্টের হুকুম ছাড়া আমাকে ছাড়া হবে না। তখন সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসান সেদিনই কোর্টে গিয়ে তদবির করে এক হুকুম লিখিয়ে নিতে সমর্থ হয়। আমি সেদিন বিকাল বেলা সন্ধ্যার একটু আগে বাসায় ফিরে আসি। পেছনে রেখে এলাম অনেক অপমান, অবমাননা এবং দুর্ব্যবহারের স্মৃতি। আমি আগেই বলেছি প্রথম দিকে জেলের ওয়ার্ডাররা আমাদের মানুষই জ্ঞান করতো না। সে আচরণে সামান্য একটু পরিবর্তন এলেও জেলের নিয়ম অনুসারে এমন কতগুলো কাজ করা হতো যাতে ভুলবার উপায় ছিলো না আমরা কতটা অসহায়। সপ্তাহে একদিন জেলের আইজি সেল পরিদর্শন করতে আসতেন। তখন আমাদের আবার তালা দিয়ে সেলে বন্ধ করে রাখা হতো চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মতো। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগের কয়েকজন মন্ত্রী এ রকম

পরিদর্শনে একবার আসেন। এর মধ্যে ছিলেন তাজউদ্দিন এবং ডক্টর কামাল হোসেন। তাদের সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না কিন্তু ডক্টর কামাল হোসেন ইউনিভার্সিটিতে যখন শিক্ষকতা করেন তখন থেকে তাঁকে চিনি, উনি আমার দিকে তাকালেনই না। মুখে ছিলো চরম ঘৃণার ভাব, তাজউদ্দিন জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কেমন আছেন? মনে হলো এটাও একটা বিদ্রুপ, আরো অপমানিত বোধ করলাম এ জন্য যে পরিদর্শনে কেউ এলে সেলের ভিতরেও আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হতো। বসবার উপায় ছিলো না।

সাপ্তাহিক পরিদর্শন ছাড়া জেলের জমাদার রোজই একবার করে সমস্ত সেল ঘুরে দেখতো। ওয়ার্ডারদের একটু উপরেই তার স্থান। সামান্য একটু লেখাপড়া হয়তো জানতো। কিন্তু ব্যবহারে মনে হতো সে যেনো একজন বড় কর্তা ব্যক্তি। জেলে যে একেবারে ভালো ব্যবহার পাইনি, তা নয়। একজন ডিআইজি ছিলেন। তিনি যথা সম্ভব ভদ্র ব্যবহার করতেন। আমাদের আটক করে রাখা হয়েছে এজন্য উনি যেন কুন্ঠা বোধ করতেন। একবার এক ছোকড়া ওয়ার্ডার কিভাবে এক কয়েদীকে খতম করেছিলে। সে কাহিনী শোনায়। সে কয়েক বছর আগের কথা। কয়েদিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় তাদের উপর ফাঁকা গুলী করার হুকুম হয়। লোকটি আমাকে বললো যে ভুলে তার গুলী একটা লোকের পায়ে লেগে যায়। সে ভাবে লোকটি যদি জেল কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করে সে বেকায়দায় পড়বে। আহত কয়েদী যাতে আর কথা বলবার সুযোগ না পায় সেজন্য লোকটি আরেকবার গুলী করে তাকে মেরে ফেলে। বলা বাহুল্য, ঐ ঘটনার পরিসমাপ্তি ওখানেই ঘটে।

আরো শুনেছি যে, কয়েদীদের জন্য দৈনিক যে বাজার করা হয় তার ভাগ আইজি থেকে শুরু করে সব অফিসারদের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হয়। ছিটেফোঁটা যা থাকে তাই কয়েদীদের ভাগ্যে জুটে। আরেকটা ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার। কয়েদীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম হচ্ছে বিচারাধীন কয়েদী, দ্বিতীয়তঃ সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী। এই দুই শ্রেণীতেই আবার আরেকটা শ্রেণী বিভাগ আছে। বৃটিশ আমল থেকেই রাজনৈতিক বন্দীরা কতগুলো সুবিধা ভোগ করতো যা ছিলো অন্যদের জন্য নিষিদ্ধ। পাকিস্তান আমলে ইউনিভার্সিটি শিক্ষক যাঁরা দু'একবার ভাষা আন্দোলনের কারণে জেল খেটেছেন তাদের মুখেও শুনেছি যে খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে তাদের কোন অভিযোগ ছিল না। বরঞ্চ যে পরিমাণ দুধ- মাখন- রুটি মাছ- গোশত এদের জন্য বরাদ্দ ছিল তা অনেকে খেয়ে কুলাতে পারতো না। এঁরা টুথ ব্রাশ- টুথপেস্ট, খবরের কাগজ এ সবই পেতেন। কিন্তু আমরা যারা

একাত্তর সালের পর রাজনৈতিক কারণে বন্দী হয়ে জেলে এসেছিলাম আমাদের এসব সুবিধা কোনোটিই দেওয়া হয়নি। অনেকে এ নিয়ে অভিযোগ করেছেন। তাজউদ্দিন যখন পরিদর্শনে আসেন তখন নাকি খান আবদুস সবুর খান তাকে বলেছিলেন, "আমরা তোমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছি, এটা কি তার যথাযোগ্য প্রতিদান?"

জেলের কর্মচারীদের অভিযোগ অনেক ছিল। '৭৩ সালে দু'একজন বাদে প্রায় সবাই যখন মুজিববিরোধী হয়ে উঠে তখন এরা সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরি, খাজা খয়ের উদ্দিন- এদের বলতো স্যার আপনারা যখন সরকার গঠন করবেন, আমাদের দিকে একটু নজর রাখবেন। তার মানে এরা ধরেই নিয়েছিল যে আওয়ামী লীগ সরকার টিকছে না। আশ্চর্যের কথা জেল খাটা লোক আগেও পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষমতায় যেতে পেরেছেন কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে জেলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা উন্নয়নের কথা একবারও তাদের মনে হতো না। আমি আগেই বলেছি যে জেলের যে পরিবেশ তাতে ভালো লোকও এখানে অসৎ হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। সাজা প্রাপ্ত চোর- ডাকাত বেরিয়ে আবার চুরি ডাকাতিই করতে যায়। বরঞ্চ আরো একটু পাকা হয়ে। সাধারণ কয়েদীরা সামান্য একটু নিয়ম ভঙ্গ করলে ওয়ার্ডারদের হাতে বেদম মার খায়। আমাদের ফালতুদের মুখে প্রতি সপ্তাহেই এ সমস্ত কাহিনী শুনেছি। বিহারী হলে তো কথাই ছিলো না। তাদের সামান্য পদস্ফলন হলেও নির্যাতনের সীমা থাকতো না। জেলের পরিমন্ডলে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডারই স্যাডিস্ট হয়ে উঠে। নির্জীব লোকজনকে মেরে এরা এক রকমের পাশবিক আনন্দ উপভোগ করে।

আরেকটি ব্যাপার খুব খারাপ লেগেছে। দু' সপ্তাহ পর পরিবারের লোকজন যখন দেখা করতে আসতো, না ছিল কোনো প্রাইভেসি, না ছিলো ভালো বসবার ব্যবস্থা। এক কামরায়ই দু' তিন পরিবারের লোকজন জমায়েত হয়ে বিভিন্ন কোণায় আশ্রয় নিতো। তখন প্রাইভেসির কথা ভাবাই যেত না। ১৫- ২০ মিনিটের মধ্যেই আমাদের সেলে যাওয়ার তাগিদ পেতাম। প্রথম প্রথম রান্না করা খাবার আনা নিষেধ ছিলো। শুধু কলা বা ঐ জাতীয় ফল সেলে আনা যেত। পরে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়। বিশেষ, করে ঈদ এবং অন্যান্য পর্বের সময়। জেল থেকে যখন বেরিয়ে আসি তখন নিজের মনেই সন্দেহ হয়েছে যে আমি আবার স্বাভাবিক জীবন- যাপন করতে পারবো কিনা। শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিলাম, অর্থনৈতিকভাবে হয়ে পড়েছিলাম বিপর্যস্ত। ভবিষ্যতে যে কয়দিন আয়ু থাকবে সে সময়টা কি করে চলবে এই দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বাসায় ফেরত এলাম। তবে

দু'বছর পর মুক্ত হতে পেরেছি এই অনুভূতি সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠেছিলো।

বাসায় এসে অনেক কথা শুনলাম যা আগে আমাকে বলা হয়নি বা যা আগে জানবার উপায়ও ছিল না। তখন মনে হয়েছিল যে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছি বটে কিন্তু আমি যেন এক বৃহত্তর কারাগারে প্রবেশ করেছি। প্রথমতঃ আমরা যারা পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাস করতাম তাদের কোন বাক স্বাধীনতা ছিলো না। আকার ইংগিতেও পাকিস্তানের কথা বলা ছিলো চরম দন্ডনীয় অপরাধ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে দন্ড হতো মৃত্যুদন্ড। সরকার পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার না করলেও তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর লোকজন এসে এ রকম হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে অসংখ্য। তাদের বিরুদ্ধে নালিশ বা মামলা রজু করার কথাই উঠতো না। তারাই ছিলো দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। প্রায় রোজই খবরের কাগজে দেখতাম এ ধরনের সংবাদ। ইংরেজীতে 'উইচ হান্ট' বলে একটা কথা আছে। মধ্যযুগে যখন ইউরোপীয় সমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিলো যে ডাইনী বুড়িরা গোপনে শয়তানের উপাসনা করে এবং মানুষের ক্ষতি করার অপরিমিত ক্ষমতা তাদের আছে। তখন সমাজে কোন দুর্ঘটনা ঘটলেই ডাইনী খুঁজে বের করার চেষ্টা শুরু হতো। জুবজুবে কোনো বুড়িকে নিরালা কোনো জায়গায় দেখা মাত্র সন্দেহ করা হতো যে তারা অপকর্মে লিপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধরে এনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার রেওয়াজ ছিল। শাসক শ্রেণীর কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলেও সন্দেহ করা হতো যে এটা ডাইনীদের শয়তানির ফল। ইংল্যান্ডের প্রথম এলিজাবেথ একবার যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন অনেক বুড়ি প্রাণ হারিয়েছে। তাছাড়া এর পেছনে খৃষ্টান যাজকদেরও সমর্থন ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে তথাকথিত ডাইনীদের নির্মূল করে দিতে পারলে খৃষ্টান ধর্মের উন্নতির পথে একটা বড় অন্তরায় অপসারিত হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে উইচহান্টের ফলে সাধারণ লোকের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো। পাদ্রীরা অনবরত খোঁজ করে বেড়াতেন কারো ধর্ম বিশ্বাসে কোথাও ফাটল দেখা দিয়েছে কিনা।

উইচ হান্ট

নতুন বাংলাদেশে এ ধরনের উইচহান্ট শুরু হয় আওয়ামী লীগ বহির্ভূত লোকদের নিয়ে। প্রমাণের দরকার হতো না। গ্রামে- গঞ্জে, হাটে- মাঠে বিচারের প্রহসন করে কয়েক হাজার লোককে ১৬ই ডিসেম্বরের পর খতম করা হয়। এই প্রক্রিয়া ৭৩- ৭৪ সালেও অব্যাহত ছিলো। তাই বলছিলাম আমাদের মত ব্যক্তিদের নিঃশ্বাসও

ফেলতে হতো সন্তর্পণে। আমরা জেল থেকে যারা বেরিয়ে ছিলাম তারাও পরস্পরের সাথে দেখা করতে ভয় পেতাম। মনে হতো কে কখন আবার ধরা পড়বে।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করলাম যে আওয়ামী লীগের লুটপাটের ফলে দেশের অর্থনীতি এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে যে সাধারণ লোকের পক্ষে ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে ওঠে। চালের দাম একাত্তর সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল মণ প্রতি ৩০ টাকা। ৭৩ সালে এটা উঠে ৪০০ টাকায়। এবং ৪০০ টাকায়ও পাওয়া যেত শুধু মোটা চাউল। এ রকম ভাবে ডাল- তেল- লবণ, মরিচ, হলুদ এসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে এমন এক পর্যায়ে ওঠে যে ১০/১২ হাজার টাকার আয় যাদের ছিলো তাদের ভালো খাবারের কথা ভাববার উপায় ছিলো না। ৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে উত্তর বঙ্গে যে কয়েক হাজার লোক প্রাণ হারিয়ে ছিলো সে কথা আগে একবার উল্লেখ করেছি। আমি লক্ষ্য করলাম যে হয়তো টেকনিক্যাল অর্থে দেশের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ছিলো না কিন্তু আসলে যে অবস্থায় আমরা তখন বাস করেছি ৭০- ৭১ সালের অবস্থার তুলনায় তাকে দুর্ভিক্ষ বলা যায়।

তৃতীয়তঃ বৃটিশ শাসনের পর আবার নতুন করে টের পেলাম, উপনিবেশবাদ কাকে বলে। ভারতের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনার অধিকার কারো ছিলো না। তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা উপলব্ধি করতে পারেন যে ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের সব কিছু লুটে- পুটে নিয়ে যাচ্ছে তারাও মুজিব সরকারের রোষানলে পতিত হন। শুনলাম মেজর জলিলের দুর্দশার কারণ এই। তিনি নাকি ছিলেন যশোর সেক্টরে। ১৬ই ডিসেম্বরের পর তিনি যখন স্বাধীনতার আনন্দে প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠেছেন তখন লক্ষ্য করলেন যে ভারতীয় সৈন্যরা যশোর ক্যান্টনমেন্টের সবকিছু তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন। এভাবে কিছুটা তাঁর মোহভঙ্গ হয়। এ ছিলো এক আশ্চর্য ঘটনা। দালাল, আল- বদর, আল- শামস এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো যে এরা আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সমর্থন করেনি। কিন্তু হাজার হাজার যুবক যারা মনে করেছিলো যে পাকিস্তানী 'দুঃশাসনে'র অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবে তারাও দেখতে পেলো যে নতুন ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের তাবেদারীকে স্বাধীনতার সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে মাত্র। শেখ মুজিব গান্ধীর কাছে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ প্রথমেই বেরুবাড়ী এবং এ রকম আরো কয়েকটা অঞ্চল ভারতকে দান করে বসেন। তার বিনিময়ে বাংলাদেশের তিন বিঘা নামক ছিটমহলের সঙ্গে করিডোর পাওয়ার কথা।

চতুর্থতঃ উপনিবেশবাদের আরেক নমুনার কথা কানে এলো। শুনতে পেলাম ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা ঢাকার সেক্রেটারিয়েটে বসে দেশের প্রশাসনের নীল নকশা তৈরী করে দিচ্ছেন। এ সময় ভি পি ধর, পি এন হাসকার প্রমুখ ভারতীয় অফিসার যারা অপারেশন বাংলাদেশ পরিচালনা করেন তারা কয়েকবার ঢাকা পরিদর্শনে আসেন। শুনেছি কোন ব্যাপারে কোন নীতি অনুসরণ করা হবে তা ঠিক করে দেওয়া হতো দিল্লী থেকে। আরেক কারণে প্রশাসনে অচলাবস্থা দেখা দেয়। যে সমস্ত অফিসার একাত্তর সালে নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন তাদেরও মাফ করা হলো না। এদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিকে চাকরীচ্যুত করা হয়; কেউ জেলও খেটেছেন। সুতরাং সর্বত্র ছিলো ত্রাসের অবস্থা। সরকারী অফিসারদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ছিলো ইন্ডিয়া ফেরত যুবকদের হাতে। তাদের ইচ্ছা মতেই অফিসারদের বদলি করা হতো। কারো হতো পদোন্নতি; কারো শাস্তি।

আইনের শাসন বলে কিছুই ছিলো না। ১৬ই ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত পাকিস্তানী মুদ্রার মান ছিলো ভারতীয় মুদ্রার চেয়ে বেশী। ১৬ই ডিসেম্বরের পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের মুদ্রার মান হ্রাস পায় এবং এই পরিস্থিতি থেকে আজো দেশ রেহাই পায়নি। জেলে নিজেদের টাকা পয়সা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি, তার অনুমতি ছিলো না। পুরানো ব্যাংকগুলি সব বন্ধ করে নতুনভাবে আবার ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হলো। সোনালী, রূপালী, জনতা, অগ্রণী, পূবালী প্রভৃতি নামের নতুন কতগুলি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করা হয় যেনো পাকিস্তান আমলের নাম গুলিও গ্রহণযোগ্য নয়। এর ফলে অর্থনীতিতে যে ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন সেটা ধ্বংস করা হয়।

শুধু অর্থনীতি নয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, কলা সব ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছিলো যে ১৬ই ডিসেম্বর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। শুধু পাকিস্তানের ২৩ বছর নয়, মুসলিম আমলের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসকেও অগ্রাহ্য করা হলো। যেনো ও সময় এমন কিছুই হয়নি, যদ্বারা এ অঞ্চলের অধিবাসীরা উপকৃত হয়েছে বা যার কোনো প্রভাব এদের জীবনের উপর অনুভব করা যায়। কোলকাতা ফেরত এক ভদ্রলোক ঘোষণা করলেন যে যুগে যুগে নাকি ইসলামের নামে পূর্ব বঙ্গের বাঙালীরা প্রবঞ্চিত হয়েছে। তুর্কি, মোগল, পাঠান যেমন প্রবঞ্চক ছিলো তেমনি ছিলো পাকিস্তানীরা। আশ্চর্যের কথা এই ভদ্রলোকটি '৪৮ সালের পর একদিন এই বলে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের অস্তিত্বের খাতিরে দরকার হলে আমাদের রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বর্জন করতে হবে; এই অতিশয়োক্তির প্রয়োজন

কোনো কালেও ছিলো বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম যে '৪৮ সালের পর যারা এ রকম আস্ফালন করতেন তারাই এখন বলতে শুরু করেছিলেন যে মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা হবে আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এরা একবারও ভেবে দেখেননি যে যুগ যুগান্তের প্রবঞ্চনার যে করুণ চিত্র এরা তুলে ধরেছিলেন তার মধ্যে সত্যের লেশ থাকলেও সেটা আমাদের জন্য হতো চরম অগৌরবের কথা। তাদের অভিযোগের সরলার্থ দাঁড়ায় এই যে পূর্ব বঙ্গে যে কয়েক কোটি মুসলমান বাস করে নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে তারা এতো নিকৃষ্ট যে কোনো যুগেই তারা কিছু করতে পারেননি, শুধু বঞ্চিত, উপেক্ষিত, অবহেলিত, উৎপীড়িত হয়ে এসেছে। এ ছিলো এক অদ্ভুত যুক্তি। অথচ এই যুক্তি কে মুজিববাদী অসংখ্য যুবক নিরেট সত্য বলে মেনে নিয়েছিলো। এই যে অসংখ্য মুসলমান যাঁরা মুসলমান হিসেবে বাংলাদেশ পূর্ব যুগে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন, স্থাপত্যে নিদর্শন রেখে গেছেন, জীবনের নানা ক্ষেত্রে যারা এক নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন যা সামগ্রিক ইসলামের ইতিহাসের একটা দিক মাত্র, তাঁদের অবদান মিথ্যা হয়ে গেলো। বাংলার মুসলমান সুলতানেরাই বাংলা ভাষাকে জাতে তুলে ছিলেন। তাঁরা নিজেরা তুর্কি বা ফার্সি ভাষী ছিলেন কিন্তু বর্তমানের বিচারে তাঁরা হয়ে গেলেন উৎপীড়ক। যাঁরা মগের অত্যাচার থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছেন, যাঁরা মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ থেকে এ দেশকে বাঁচিয়েছেন তাঁরাও ঐ সংজ্ঞায় পড়লেন।

১৯৪৭ সালের বিভাগ পূর্ব ইতিহাসের কথা যাদের মনে ছিলো তাঁরা নিশ্চয়ই জানতো যে এ অঞ্চলের উৎপাদিত শস্য দিয়ে কোলকাতার সমৃদ্ধি ঘটেছিল। পাট উৎপাদন করতাম আমরা; পাটের কল স্থাপিত হয় কোলকাতা এলাকায় অমুসলিম মালিকানায়। এমন কি নারায়ণগঞ্জের পাটের বাজারও ছিল মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের দখলে। জমিদাররা ছিলেন সবই প্রায় হিন্দু। এরা বাস করতেন কোলকাতায়, রাজস্ব গ্রহণ করতেন পূর্ব বঙ্গের জমিদারী থেকে। তবে এসব অত্যাচার নয়, এগুলিকে কেউ এখন উৎপীড়ন ও বলছিল না। কারণ এরা তো ছিল বাংলাভাষী, আমাদের একান্ত আপন লোক। এ যেনো আপন ভাইয়ের হাতে চর থাপ্পর খাওয়ার মতো। তবে মাড়োয়ারীদের শোষণের ব্যাপারটা এরা কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে জানি না। সে প্রসঙ্গ এখন আর কেউ তুলে না।

আরো মজার ব্যাপার যে বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানীদের অত্যাচারের নিত্য নতুন ফিরিস্তি তৈরী হচ্ছিল এবং বলা হচ্ছিল যে পাকিস্তানে যোগ দিয়ে আমরা নিজেদের সর্বনাশ ঘটিয়ে ছিলাম, সে বাংলা ভাষা ভারতে রাষ্ট্র ভাষার

সম্মান পায়নি এবং পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই। যারা বলছিলেন দেশ বিভাগ নাকচ করে আবার ভারতে ফিরে যেতে তাঁরা ইচ্ছা করেই এ প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতেন না। এমন একটা ভাব দেখান হতো যে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে মিশে গিয়েও আমরা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ব্যবহার করতে পাররো। এদের বাংলা ভাষা প্রীতি যে একেবারে মেকী সে সম্পর্কে আমার মনে কোনো কালেই সন্দেহ ছিলো ন। এবং এখনও এ রকম সন্দেহ পোষণ করার অসংখ্য কারণ দেখতে পাচ্ছিলাম। তাদের আসল মতলব ছিলো এ অঞ্চলের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেওয়া এবং এই অভিযানে বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিলো একটা হাতিয়ার মাত্র। অথচ আশ্চর্য যারা একদিকে মাঠে ময়দানে '৪৭ সালের ভারত বিভাগের নিন্দা করতেন তারাই সেজে ছিলেন বাংলা ভাযার সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরদী পৃষ্ঠপোষক। দুঃখ্যের বিষয় তরুণ- ছাত্র জনতা এ দুই মনোভাবের অসঙ্গতি ধরতে পারেনি। আর পারার কথাও ছিলো না। পাকিস্তান আমলের তথাকথিত উৎপীড়ন কাহিনী এমনভাবে পল্লবিত করে এদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছিল যে অন্য কোনো কথা ভাববার অবকাশ এদের ছিল না। এই তরুণদের নিয়ে আপসোস করা যেতো কিন্তু বয়স্ক লোক যারা জেনেশুনে অনবরত মিথ্যা প্রচার করে যেতো তারা বিবেকের কাছে কি জবাব দিয়েছে সে তারাই জানে।

১৯৭৪ সালে প্রকাশ্যে এ সমস্ত প্রশ্ন তুলবার অধিকার আমাদের ছিলো না। কিন্তু স্বাধীনতার নামে '৭১ সালে যা অর্জিত হয়েছিলো সেটা যে চরম ভারতীয় দাসত্ব তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। চারদিকে ছিলো ধ্বংসস্তুপ, বিপর্যস্ত অর্থনীতির দৃশ্য। অথচ নতুন সরকার অনবরত বলে বেড়িয়েছেন যে পুঁজি নিয়োগের এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কখনো হয়নি। কোনো পুঁজিপতি পুঁজি নিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছিলেন বলেও শুনিনি। '৭৪ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়া ও মিশর ব্যতিরেকে আর কোনো মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করেনি। পাকিস্তান তো নয়ই। ঐ সালে লাহোরে একটি ইসলামিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। তখন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিয়ান ঢাকা এসে শেখ মুজিবুর রহমানকে ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত করান এবং তাঁকে তার প্লেনেই লাহোর নিয়ে যান। সেখানে ভুট্টো আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। বুমেদিয়ান মুজিবুর রহমান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোকে কি বলেছিলেন তা আমরা জানি না কিন্তু রাজনৈতি পরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলাদেশ যে ইসলামী জগতের অংশই যে রয়ে গেছে মুজিবুর রহমান তা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। জনগণের মধ্যেও এ নিয়ে বিভ্রান্তির শেষ ছিলো না। একদিকে তাদের

অনবরত বুঝানো হচ্ছিলো যে কাজ- কর্মে চিন্তায় স্বপ্নে- আদর্শে তাদের বাঙালী হতে হবে। তখনো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা কেউ বলতে সাহস পায়নি অন্যদিকে পূর্ব বঙ্গের মুসলিম অধ্যূষিত অঞ্চলে এই বাঙালীত্বের স্বরূপ কি দাড়াবে তা কেউ বলতে পারছিলেন না বা বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না বা এ সম্বন্ধে গভীরভাবে ভেবে দেখবার শিক্ষাও তাঁদের ছিলো না। তারা একদিকে প্রচার করতো যে ছিটেফৌটা দু'এক ব্যক্তিকে বাদ দিলে বাংলার মুসলমান নাকি সব হিন্দু বংশোদ্ভুত। সুতরাং নতুন পরিবেশে তাদের মুসলমান পরিচয় ত্যাগ করলে তাদের হিন্দু ধর্মে পুনঃ প্রবেশ শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অত্যাবশ্যক হয়ে দাড়ায়। একে তো হিন্দু ধর্মে কেউ নতুনভাবে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেনা। অন্যদিকে কয়েক শতাব্দী ধরে এই মুসলমান সমাজ যে জীবন ধারা অনুসরণ করে এসেছে সেটার বিকল্প কি হতে পারে এই নেতারা তা বলতে পারছিলেন না। এদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিলেন যারা সম্ভব হলে নাম পাল্টিয়ে কপালে তিলক লাগিয়ে হিন্দু হতে পারলে গৌরববোধ করতেন। কেউ কেউ অবশ্য ছেলেমেয়েদের হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজেদের বাঙ্গালীত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে এরা কোন সমাজেই স্থান পাচ্ছেন না।

আর অশিক্ষিত জনসমাজের কথা তো আলাদা। শহরে বসে দু- এক ব্যক্তি যা করেছেন, গ্রামের সমাজে তা কোন কালেই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এটা শুধু নিছক সাধারণ অর্থে ধর্মীয় ব্যাপার নয়। আচার- ব্যবহারে, নৈতিক আদর্শে দুই সমাজের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। তার অর্থ এই নয় যে হিন্দু- মুসলমান প্রতিবেশী হিসাবে বাস করতে পারে না। বহু শতাব্দী ধরেই তারা এভাবে বসবাস করছিলো। এবং একটা দুরত্ব রক্ষা করে তারা চলছিল। কিন্তু এখন শুনলাম এ দূরত্ব রক্ষা করার প্রয়োজন একেবারেই নেই। সুতরাং জিন্নাহ হলকে সূর্যসেন হলে পরিবর্তন করে এরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে সূর্য সেনের মতো ব্যক্তিরাই আমাদের আসল হিতাকাংক্ষী। আর নওয়াব সলিমুল্লা, এ কে ফজলুল হক, মওলানা আকরাম খাঁ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমূখ যারা মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলতেন তারা ছিলেন আমাদের সমাজের পরম শত্রু। তবে একথা স্বীকার করতে কেউ সাহস পায়নি যে আমাদের মিত্রদের পরামর্শ মতো চলতে গেলে, পাকিস্তানের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোনো প্রয়োজন হতো না। আমরা কৃষক গাড়োয়ান এবং দর্জী হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম।

জেল থেকে বেরিয়ে আরো একটা অদ্ভুত কথা শুনতে পেলাম। শেখ মুজিব নিজে এবং তার দলের লোকজন দাবী করতে শুরু করলো যে পাকিস্তানের কাছে

তাদের পাওনা অনেক কিছু। ঢাকা, চাটগাঁও, খুলনা, রাজশাহী, ঈশ্বরদী, রংপুর প্রভৃতি এলাকায় উর্দূভাষীদের সম্পত্তি যা কিছু ছিলো তাতো দখল করে নেওয়া হলো। কিন্তু তার উপর তার স্বরে চিৎকার করে বলা হলো যে করাচীতে, ইসলামাবাদে, লাহারে বাঙালীরা অনেক সম্পত্তি ফেলে এসেছে যে জন্য পাকিস্তানকে খেসারত দিতে হবে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী এবং নৌ- বাহিনীর জাহাজ দাবী করা হলো। এ রকম আরো দাবী তখন উঠেছিল যে আলোচনা করা সম্ভব হতো যদি লেখাপড়া করে একটা যুক্তি মারফত পূর্ব পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। যেমন হয়েছিলো ১৯৪৭ সালে। পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত একটি আইনের আওতায়। পাকিস্তান যদি লড়াই করে ইন্ডিয়া থেকে বেড়িয়ে আসতো, আইনের চোখে তার কোন দাবীই তো গ্রাহ্য হতো না। আইন করে বেড়িয়ে এসেও পাকিস্তান তার প্রাপ্য বিশেষ কিছুই পায়নি। পার্টিশন কাউন্সিল ইন্ডিয়ার সৈন্য বাহিনীর যে সমস্ত মালামাল পাকিস্তানকে দিতে বলেছিলেন নেহেরু সরকার তার কিছুই হাতছাড়া করেন নি। বরঞ্চ পাকিস্তানের প্রাপ্য ৯০ কোটি টাকাও আটক করে পাকিস্তানের শ্বাস রোধ করার চেষ্টা করেছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গলের নতুন চিফ মিনিস্টার বিধান চন্দ্র রায় ঘোষণা করলেন যে পূর্ব বঙ্গে সরকারী সম্পত্তি কি আছে তার হিসাব না হওয়া পর্যন্ত কোলকাতা থেকে তিনি এক কপর্দক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাছে হস্তান্তর করবেন না। যদি নতুন বাংলাদেশ সরকার সেই পুরানো দাবী আদায়ের চেষ্টা করতো বুঝতাম যে তারা সত্যই দেশের হিতাকাংক্ষী কিন্তু ও প্রসঙ্গ কেউ তুললো না। শুধু শুনলাম যে অত্যাচারী পাকিস্তানীরা ন্যায্য পাওনা দিচ্ছে না।

এ সমস্ত উক্তির মধ্যে যুক্তির কোনো বালাই ছিল না। শুধু তরুণ সমাজকে উত্তেজিত করে রাখার একটা চেষ্টা হচ্ছিলো। যুদ্ধ করে যে অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়েছে সে কথা কেউ আর এ প্রসঙ্গে তুললেন না। আমেরিকা, এককালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। যারা আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস জানেন তাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে জর্জ ওয়াশিংটন বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভ করেন। আমেরিকার সঙ্গে বহুদিন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সদ্ভাব ছিলো ন। তারা একবার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছে। ১৯৫৬ সালে আমি যখন আমেরিকা গেলাম তখন পূর্বাঞ্চলে কোন কোন এলাকা ইংরেজরা বিধ্বস্ত করেছিলো তা দেখানো হয়। খেসারতের প্রশ্ন কখনো ওঠেনি। আলজেরিয়া আট বছর যুদ্ধ করে ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু শেষ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট দ্য গলের হস্তক্ষেপের ফলে একটা চুক্তির মারফত এই সংঘাতের অবসান ঘটে। সেজন্য এ ক্ষেত্রে লেনদেনের ব্যাপার

নিয়েও একটা মীমাংসা হয়েছিলো। বাংলাদেশের নতুন নায়কেরা যে দাবী তুললেন সেটা আন্তর্জাতিক কোন আদালতে স্বীকৃতি পাবার সম্ভাবনা ছিলো না। সেজন্য এ প্রসঙ্গ কেউ উত্থাপন করেনি। শুধু ধমক দিয়ে আদায় করার চেষ্টা করেছে। আরো মজার কথা যে আনুষ্ঠানিকভাবে আগে যেমন পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের জিকির তুলে ছাত্রদের মনে পাকিস্তানের প্রতি একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়, এখনো তেমনি বলা হলো যে পাকিস্তান অন্যায়ভাবে বাংলাদেশের প্রাপ্য হিস্যা ছাড়ছে না। এটা ভবিষ্যতে যাতে এ দু'অঞ্চলের মধ্যে কোনো সদ্ভাবের সৃষ্টি না হয় তারই একটা কৌশল ছিল মাত্র।

৭৩- এর পরিবেশে যে অনুভূতিটা অনবরত টের পাচ্ছিলাম তার সঙ্গে রাষ্ট্র নায়কদের মনোভাবে সঙ্গতি ছিলো না। মন্ত্রীরা এবং আওয়ামী লীগ দল যতোই চিৎকার করুক সাধারণ লোকের মধ্যে ৭১ সাল সম্বন্ধে ছিল একটা অপরাধবোধ। রাগের মাথায় হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে লোকে যেমন অঘটন ঘটিয়ে পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে যায় তেমনি একটা ভাব লোকজনের কথাবার্তায় বুঝা যেতো। সঙ্গে সঙ্গে এরা বলতো যে পাকিস্তানীরা যদি ২৫শে মার্চ ওভাবে আমাদের উপর আক্রমণ না করতো তা হলে দেশটা রক্ষা পেতো। একটু শিক্ষা- দীক্ষা যাদের আছে তারাই ভারতের ভূমিকা সম্বন্ধে শংকিত হয়ে উঠেছিলো। হঠাৎ করে তারা যেনো উপলব্ধি করলো যে ভারত পরিবেষ্টিত হয়ে এ দেশে কখনো স্বাধীন হয়ে থাকতে পারবো না। দেশে এমন কোনো সম্পদ ছিলো না যার উপর নির্ভর করে সে স্বাবলম্বী হতে পারে। আশ্চর্য হলাম যখন শুনলাম যে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে যে পিন্ডির জায়গায় আমরা শুধু দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছি। এ সব আলোচনা- চুপ করে শুনেছি কিন্তু দেশের আবহাওয়া যে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিলো এছিলো তারই প্রমাণ।

এ দিকে দেশের শিল্প- কারখানার যে অবস্থা তাতে উৎপাদন কিছুই হতো না বলে বাজার ছেয়ে গিয়েছিলো ইন্ডিয়ান পণ্যে। তখন থেকেই ইন্ডিয়ান শাড়ী বাজারে শস্তায় চালু হয়। এই প্রতিযোগিতায় আমাদের টিকে থাকবার উপায় ছিল না। কারণ জাতীয়তাবাদ দিয়ে পলিটিক্স করা যায় কিন্তু ক্রেতা হিসাবে একজন লোক যখন বাজারে যায় সে সুলভ পণ্যের সন্ধান করে। জাতীয়তাবাদী হয়ে সে শস্তা জিনিস বাদ দিয়ে চড়া দরে কোনো জিনিস কিনবে না। পাকিস্তান আমলে সরকারী নীতির ফলে দেশী কলকারখানাগুলি যে প্রোটেকশন পেয়েছে শেখ মুজিব বন্ধু রাষ্ট্র ইন্ডিয়ার স্বার্থে সে প্রোটেকশন তুলে নিলেন। বাজারে এলো ইন্ডিয়ান

পণ্যের প্লাবন। আমরাও বাধ্য হয়ে এ সমস্ত জিনিস ব্যবহার করেছি। কারণ উপায় ছিলো না।

সবচেয়ে ব্যথা পেতাম যখন পুরানো সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নানা উদ্ভট অভিযোগ। তারা নিজেরা যে সমস্ত দফতরের পরিচালনা করতেন, যেখানে নীতি প্রণয়নেরও স্বাধীনতা তাঁদের ছিলো, এখন তাঁরাই তাদেঁর অকর্মণ্যতা ঢাকবার জন্য বলতে শুরু করলেন যে পাকিস্তানীদের দৌরাত্ম্যে তারা জেনে শুনেও এ অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেননি। যারা ভিতরের খবর জানে না তাদের কাছে এ সমস্ত যুক্তি খুব গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে এ অঞ্চলের মিনিষ্টার বা সেক্রেটারী কেন এ প্রশ্ন তুলে আগে প্রতিবাদ করেননি? কাউকে তো পদত্যাগ করতেও শুনিনি। অপর পক্ষে উচ্চপদ লাভ করলেই তারা কেন্দ্রীয় সরকারের গুণগান করতে ত্রুটি করেনি। এই মোনাফেকী কি আমাদের চরিত্রেরই একটা বৈশিষ্ট্য?

আওয়ামী লীগের তরফ থেকে যখন আঞ্চলিক বৈষম্যের ধুয়া তোলা হয় তখন সরকারী কর্মচারী একদিকে যেমন গোপনে শেখ মুজিবুর রহমানকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে উৎসাহিত করেছেন, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়েছেন যে এ সমস্ত মিথ্যা চিৎকার নিয়ে আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারও টের পাননি যে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অসন্তোষ কিভাবে ধুমায়িত হচ্ছে। আইয়ুব খান যখন তার ওয়ার্ক্স প্রোগ্রাম প্রর্বতন করেন তখন সরকারী কর্মচারী ও ইউনিভার্সিটি শিক্ষকের মুখে এর প্রচুর প্রশংসা শুনেছি। আবার সত্তর সালে এরাই বলেছিলেন যে ওয়ার্ক্স প্রোগ্রামের দ্বারা দেশে কতগুলো টাউট সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশের উন্নতি কিছুই হয়নি। এ রকমের অভিযোগ পাকিস্তান আমলে সব কিছুর বিরুদ্ধেই করা হতো। অথচ তেইশ বছর আগে যে পূর্ব বাংলা আমরা পেয়ে ছিলাম তার সঙ্গে সত্তর সালের পূর্ব পাকিস্তানের চেহারার তুলনা করলে যে বিরাট ব্যবধান চোখে পড়ে সে কথাটা এখন অস্বীকার করা হচ্ছিলো। রাস্তাঘাটে, কল-কারখানা, বন্দর উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক-মজুর, শিক্ষক-উকিল, ব্যবসায়ী কেউ নাকি উপকৃত হয়নি। আশ্চর্য, তখন যে ক'টি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতো তারা সমস্বরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে একই অভিযোগ উচ্চারণ করে গেছে।

একদিকে এরা অভিযোগ করতো কেন্দ্রীয় সরকারের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন নাকি বিঘ্নিত হয়েছিলো। অন্যদিকে এরা কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তার কথা বলতো। কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এ অঞ্চল থেকে

স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রস্তুত হয়েছে বলে আমি শুনিনি। একদিকে ছিলো কেন্দ্রের উপর এবং অবাঙ্গালী অফিসারদের উপর নির্ভরশীলতা, অন্যদিকে কোনো ভুলভ্রান্তি হলেই বলা হতো যে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চাদপদ করে রাখার ওটা একটা চক্রান্ত।

পূর্ব পাকিস্তানে বৃটিশ যুগের অবস্থা

যখন '৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমার বয়স ২৭। এমন অর্বাচীন তরুণ ছিলাম না যে কি হচ্ছে তার তাৎপর্য একেবারেই বুঝবার ক্ষমতা ছিলো না। যিন্তু '৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত তেইশ বছরের যে ইতিহাস তার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ রাজনীতিবিদদের মুখে একথা একবারও শুনিনি যে নতুন রাষ্ট্রকে লালন করে টিকিয়ে রাখবার পর অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। একে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার প্রমূখ ব্যক্তি যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাঁরা সবাই বিভিন্ন সময়ে সরকারী ক্ষমতা ভোগ করেছেন, কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হওয়া মাত্রই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক উক্তি করতে এদের দ্বিধা হয়নি। হামিদুল হক চৌধুরীর কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি। এদের সবার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির একটা সংকীর্ণতা ছিলো। কেউ যেনো বুঝতে চেষ্টা করতেন না যে, যে অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলো তার পরিবর্তন ঘটাতে হলে নতুন রাষ্ট্রের কাঠামোকে মজবুত করাই হবে সবচেয়ে বড় কর্তব্য। তাঁরা এমন ভাব দেখিয়েছেন যে সামগ্রিক ভাবে পাকিস্তান রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের। আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, আছে শুধু অধিকার। একদিকে দাবী করেছি যে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যদিকে সংখ্যা লঘিষ্ঠের মত সাহায্য চেয়েছি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের কাছে দাবী দাওয়া পেশ করার এই নজীর অন্য দেশের ইতিহাসে বিরল। ১৯৪৭ সালের যে গণপরিষদ গঠিত হয় তার সদস্য সংখ্যার মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো। এ কথা সত্য যে উপযুক্ত লোকের অভাব এ অঞ্চলে ছিলো বলে লিয়াকত আলী খানের মত কয়েকজন মোহাজেরকে এই অঞ্চলের কোটা থেকে নির্বাচন করা হয়েছিলো। কিন্তু বাঙালীদের সংখ্যাই ছিলো বেশী। তবুও কেন্দ্রীয় পরিষদে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে ভূমিকা আমাদের পালন করার কথা, তা আমরা করতে পারিনি। যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার অভাবে। বলা হয়ে থাকে যে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র এবং মিলিটারীতে পূর্ব পাকিস্তানের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকার কারণে আমাদের রাজনীতিকরা

অসহায়বোধ করতেন। এটা তাদের ব্যর্থতা এবং অকর্মণ্যতা ঢাকবার একটা অজুহাত মাত্র। কারণ গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেল হিসাবে গণপরিষদে হস্তক্ষেপ করার আগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই দেশের কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছে। আমলারা এবং মিলিটারী অফিসাররা প্রাইম মিনিস্টার এবং মিনিস্টারদের হুকুম মেনে চলতেন। কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর পূর্ব পাকিস্তানের খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। লিয়াকত আলী হত্যার পর তিনি আবার প্রাইম মিনিস্টারের পদ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ঐ পদ কিছুকালের জন্য অধিকার করেছিলেন। শুনেছি যে ব্যক্তিগতভাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী জাঁদরেল লোক ছিলেন। কোন আমলার কাছে ভীত হওয়ার কোনো কারণ তাঁর ছিল না। শিক্ষা, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা কোন দিক থেকেই। কিন্তু পদচ্যুত হলে এরা যে সমস্ত আস্ফালন করতেন পদে অধিষ্ঠিত থেকে একথা কখনো বলেননি যে কেনো পূর্ব পাকিস্তান আরো বেশী সুবিধা পাচ্ছেনা। বরঞ্চ, আগেই উল্লেখ করেছি যে প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সলিমুল্লা মুসলিম হলে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসনের ৯৮ ভাগ ভোগ করছে। এ সমস্ত কথার অর্থ কি তা একাত্তর সালের বিস্ফোরণের পর বুঝবার উপায় ছিলো না। হয় বলতে হয় যে শহীদ সাহেব আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলে গেছেন- যা বিশ্বাস করা শক্ত। অথবা বলতে হয় যে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে খতম করার উদ্দেশ্যেই এ সমস্ত অভিযোগ তুলেছিলো।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে আমরা পাঞ্জাবের তুলনায় পশ্চাদপদ ছিলাম না তা নয়। এই পশ্চাদপদতার কারণ ১৭৫৭ সালের পরবর্তী ইতিহাস। বৃটিশ আমলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নিষ্পেষণ এবং বঞ্চনার কারণেই পাকিস্তান আন্দোলনে আমরা সবচেয়ে বেশী সাড়া দিয়েছিলাম। আমাদের আশা ছিলো যে বর্ণ হিন্দুদের বেষ্টন থেকে মুক্ত হতে পারলে আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধার করতে পারবো। এবং সেই প্রক্রিয়া যে তেইশ বছরে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলো সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সংশয় ছিলো না।

বৃটিশ আমলে বাংলায় বর্ণ হিন্দুর আধিপত্যের দু- একটা উদাহরণ হয়তো এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বেঙ্গল লেজিসলেচারে স্যার আব্দুর রহীম প্রমুখ সদস্যদের প্রতিবাদের মুখে একবার এমন একটা আইন পাশ হয় যার ফলে বাংলার মুসলমান প্রজারা আরো বেশী করে হিন্দু জমিদারদের খপ্পরে পড়ে।

আইনে অবশ্য হিন্দু- মুসলমানের কথা উল্লেখ ছিলো না। কিন্তু সবাই জানতো যে বাংলার অধিকাংশ জমিদার যেমন হিন্দু তেমনি অধিকাংশ প্রজা ছিলো মুসলমান। আরো আশ্চর্যের কথা এই বিবর্তনমূলক আইনটি পাশ হয় তথাকথিত জনদরদী 'কংগ্রেস' দলের সমর্থনে। যেখানে হিন্দু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেখানে কংগ্রেস তার রূপ সহজেই বদলিয়ে ফেলতো।

আরেকটি ঘটনা হলো, সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল প্রত্যাহারের ঘটনা। ১৯৩৭ সালে যে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তারা মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ কোলকাতা ইউনিভার্সিটির হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উপর অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। প্রস্তাবটি ছিলো সর্বতোভাবে যুক্তি সঙ্গত এবং যে সমস্ত হিন্দু তখন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তারাই পশ্চিম বাংলায়ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করেন। কিন্তু ফজলুল হক সাহেবের মুসলিম লীগ মিনিস্ট্রি যখন প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তখন তার অর্থ করা হলো যে মুসলিম লীগ কোলকাতা ইউনিভার্সিটির স্বার্থে আঘাত হানার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস সদস্যরা এমন প্রচন্ড আন্দোলন শুরু করলেন যে বাধ্য হয়ে হক সাহেবকে প্রস্তাবটিকে পরিত্যাগ করতে হয়, অথচ এই নগ্ন সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করতে পরবর্তী কালে আওয়ামী লীগকেও শুনিনি।

আমি এখানে দু'টি উদাহরণ দিলাম মাত্র। এরকমের ঘটনা অহরহ ঘটতো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও মুসলমানরা চাকরী- বাকরীতে ব্যবসা- বাণিজ্যে সংখ্যালঘু হয়ে ছিলো। একবার ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রী সভার আমলে চাকরীতে মুসলমানদের অনুপাত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে করা হয়। বলা বাহুল্য, প্রবল আপত্তি উঠে। বলা হয় যে সাম্প্রদায়িক অনুপাত সংশোধন করার অজুহাতে কতগুলি 'ইনএফিশিয়েন্ট' বা অদক্ষ লোকদের চাকরী দিলে প্রশাসনের মানের অবনতি ঘটবে। এর প্রতি উত্তরে ফজলুল হক সাহেব ইংরাজীতে এফিশিয়েন্সী সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ বা বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে একজন আমলার জন্য এফিশিয়েন্সীর অর্থ বিশ্বাস যোগ্যতাও বটে। অর্থাৎ যে কর্মচারীর উপর সামাজিক কারণে জনসাধারণের পরিপূর্ণ আস্থা নেই তার পক্ষে সুচারুভাবে তার কর্তব্য সম্পন্ন করা দুরূহ। তিনি বললেন এই কারণে চাকরীতে মুসলমানের অনুপাত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বাংলার জনসাধারণের অধিকাংশই মুসলমান। তাদের আপন সম্প্রদায়ের আমলার উপর তারা যতটা ভরসা করতে পারে ততটা কোন ইংরেজ বা হিন্দু অফিসারের উপর সম্ভব নয়।

যাক, আমি বলছিলাম কেনো আমরা এ অঞ্চলে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলাম সে কথা। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরই একদল আমাদের বুঝাতে লাগলেন যে আমরা কিছুই পাচ্ছিলাম না। শুধু নতুন বঞ্চনার শিকার হয়েছিলাম মাত্র। এ সমস্ত কথা যদি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার ১৫ বছর পর শুরু হতো তা হলে বুঝা যেতো যে ঐ ১৫ বছরে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সমান হতে পারিনি বলেই ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু আমার তো স্পষ্ট মনে আছে ৪৮-৪৯ সাল থেকেই এ অভিযোগের সূত্রপাত। তখনি শুরু হয় ভাষা আন্দোলন, শুরু হয় অবাঙ্গালী অফিসারদের বিরুদ্ধে জেহাদ, নবাগত বিহারী মোহাজেরদের প্রতি শত্রুতা।

আমি যে কথা বলছি তার মর্মার্থ হলো যে পাকিস্তানের পতন পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বঞ্চনার কারণে হয়নি। এবং এ অঞ্চল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অগ্রগতির পথে সমস্ত বাধা অপসারিত হবে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সে কথা বিশ্বাস করতো বলে আমি মনে করি না। তারা ইন্ডিয়ার ইঙ্গিতেই এ আন্দোলন করেছিলো। একদিকে তারা নির্ভর করতো মিথ্যা প্রচারণার উপর অন্যদিকে সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি যা যেকোন দেশেই ঘটে তার সুযোগও তারা নিয়েছে। আমি আগে বলেছি যে পশ্চিম পাকিস্তানেও একদল ছিলো যারা পাকিস্তানের আদর্শের কথা বেমালুম ভুলে যেয়ে শুধু স্বার্থের কথা ভেবেছে এবং তাদের নির্বুদ্ধিতা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যুগিয়েছে।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে যারা এ সমস্ত অভিযোগ তুলে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করে, পাকিস্তানের আদর্শ বাস্তবায়িত করার সদিচ্ছা এবং আগ্রহ তাদের কি কখনোই ছিলো? ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনের 'মাউন্টব্যাটন প্ল্যান' যখন ঘোষিত হয় তখন একজন বৃটিশ সিভিলিয়ান টাইসন পূর্ব বঙ্গকে পাড়াগাঁয়ের বস্তি (রুরাল স্লাম) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। বৃটিশ শাসনের থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে এটাই আমাদের প্রাপ্য হলো। এই শাসনের প্রারম্ভকালে বৃটিশরা যেমন এ দেশের সম্পদ লুটে, এ দেশের মুসলমান সমাজকে ধ্বংস করে তাদের সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন এবং ইংল্যান্ডে এক নতুন বিত্তবান সমাজের উথানের পথ সুগম করেন, তেমনি এ দেশ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, ১৯৪৩ সালে তারা এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটায়। সরকারী হিসাবে এই মন্বন্তরে ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং সরকারী কমিশন বলেছিলো যে, এই দুর্ভিক্ষ ছিলো ম্যানমেড (কৃত্রিম)। এই বিধ্বস্ত অঞ্চলই '৪৭ সালের ১৪ই অগষ্ট রুপান্তরিত হয়েছিলো স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে। অথচ ৪৮ সাল থেকেই আবার শুনতে আরম্ভ

করি যে আমাদের সমস্ত দুর্দশার কারণ করাচীস্থিত তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা, উপেক্ষা এবং শোষণ। পাঞ্জাব বা সিন্ধু অঞ্চলে যেমন যুদ্ধের সময় কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি তেমনি ১৭৫৭ সাল থেকে উনিশ শতাব্দীর শেষ অবধি পর্যন্ত যে নির্যাতন বাংলার মুসলমানদেরকে সইতে হয়েছে তার নজির পশ্চিম পাকিস্তানের ইতিহাসে নেই। হান্টার সাহেবের সে বিখ্যাত বইয়ের কথা এখানে উল্লেখ করার হয়তো দরকার নেই। তিনি বলেছিলেন যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পূর্বে যারা ছিলেন বাংলার সম্ভ্রান্ত সমাজ তারাই পরিণত হলেন কাঠুরিয়া আর ভিস্তির শ্রেণীতে। আগে যেমন কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের পক্ষে দারিদ্র্যের কবলে পতিত হওয়া অসম্ভব ছিলো তেমনি ১৮৫৭-এর পর কারো পক্ষে স্বচ্ছলতা রক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই তো হলো আমাদের ইতিহাস। উনিশ শতাব্দীতে বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সমাজে যে পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁস-এর সূত্রপাত হয়, যার প্রধান প্রতিনিধি হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ঠাকুর পরিবার সেই পুনর্জাগরণে মুসলমান সমাজের কোন ভূমিকা ছিল না এবং থাকবার কথাও নয়।

এই বিধ্বস্ত সমাজকে নিয়ে ১৯৪৭ সালে আমাদের যাত্রা শুরু। ৪৩ সালে যে দুর্ভিক্ষের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি তার ভয়াবহতার চিত্র আমার বয়সী কোনো লোকের মন থেকে মুছে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ৭১ সালে ছিল না। জাপানীরা তখন বার্মা দখল করেছে। আরাকান পর্যন্ত থাবা বাড়িয়েছে। কোলকাতায় বোমা পড়ছে এবং যে কোনো মুহূর্তে তারা আসাম ও বাংলার একটা অংশ দখল করে নিতে পারে এই আশংকায় বৃটিশ সরকার পোড়ামাটি বা SCORCHED EARTH নীতি অবলম্বন করে। জেলে এবং কৃষকদের নৌকা ধ্বংস করে ফেলা হয়, ধ্বংস করা হয় খেত খামারের ফসল; একেতো তখন বার্মা থেকে চাল আমদানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো অন্য দিকে এ অঞ্চলে উৎপাদিত চাল সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজনে ক্রয় করে উত্তর এবং মধ্য ভারতে চালান দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় এই প্রক্রিয়ায় কয়েকজন দুর্ণীতিপরায়ণ মুসলমান রাজনীতিবিদও জড়িত ছিলেন। মাড়োয়ারীদের সাথে জোগসাজশে এরা চাল পাচার করতেন। এ নিয়ে একটা মামলাও হয়। এই মামলার তথ্য উদঘাটন করতে গেলে এমন সব নাম আবিস্কৃত হবে যা শুনলে বর্তমান প্রজন্ম রীতিমত আঁৎকে উঠবে। কারণ এরা এদের পরম শ্রদ্ধেয় জাতীয় বীর হিসাবে চেনে।

যাক সে সব কথা। তখন যুদ্ধের সময় সেন্সরশীপের কারণে দুর্ভিক্ষ কথাটা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ ছিল। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কোলকাতা

স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ইয়ান স্টিফেন্স। তিনি এ সম্বন্ধে অনেকগুলো সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে বাংলার অবস্থার দিকে দিল্লীর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর একটা মন্তব্য আমার এখনো মনে আছে। বলেছিলেন সুদূর দিল্লীতে মোটা মোটা (ফ্যাট) পান্জাবী অফিসারদের মধ্যে পরিবৃত্ত থেকে বৃটিশ সরকারের পক্ষে বাংলার দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুরতার অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ সমস্ত আলোচনার একটা সুফল দেখা দেয়। নতুন বড় লাট লর্ড ওয়েভল কোলকাতা আসেন স্বচক্ষে এই দুর্ভাগা প্রদেশের হালহকিকত দেখতে। স্টিফেন্স সাহেবের সে সময়কার প্রবন্ধগুলো আমার কাছে এখনও রক্ষিত আছে।

১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তখনো আমরা দুর্ভিক্ষের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সেই দুর্ভিক্ষের সময় প্রবর্তিত রেশনিং প্রথা ৪৭ সালের পরও চালু ছিল। কিন্তু ৪৭ এর আগস্টের পর ৭১ সাল পর্যন্ত অভাব অভিযোগ হলেও ব্যপক দুর্ভিক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের কোন এলাকায়ও হয়নি। একবার বোধ হয় ৫০ সালে কয়েক দিনের জন্য একটা লবণ সংকট দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই সংকট কোন জীবন নাশের কারণ হয়নি এবং মাত্র কয়েকদিন স্থায়ী হয়েছিল।

উপসংহার

পাকিস্তানে পাটকল, সুতার কল, টেক্সটাইল মিল ইত্যাদি যা প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা নাকি শুধু বঞ্চনা এবং শোষণের প্রমাণ। পাকিস্তান আমলেই এ অঞ্চলে গ্যাস আবিষ্কৃত হয়। গ্যাস তো হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। বহু শতাব্দী ধরে মাটির নীচে মওজুদ ছিলো। কিন্তু বৃটিশ আমলে কখনোই পূর্ব বাংলায় গ্যাসের অনুসন্ধান করা হয়নি। পাকিস্তানে প্রথম গ্যাস আবিস্কৃত হয় সিন্ধুর সুই এলাকায়। তার অব্যবহিত পরে হরিপুর এবং বাখরাবাদে গাসের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এ তথ্যের মূল্যায়ন আওয়ামী লীগের কাছে পাইনি।

আগাগোড়াই বলা হয়েছে যে পাকিস্তান আমলে আমাদের ইতিহাস ছিলো শুধু বঞ্চনার ইতিহাস; কেন্দ্রীয় শাসনকর্তারা এ অঞ্চলটাকে যথাসম্ভব অনুন্নত রাখবার চেষ্টা করতেন। '৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হবার পর সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মিঃ হাসিব আমার সামনে তাঁর বৃটিশ স্ত্রীকে বলেন, এ অঞ্চলটা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য হচ্ছে শুধু কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্র। ঐ ভদ্র মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন এ বিদ্রোহ কেন হচ্ছে? কৌতুকের কথা আমি জেল থেকে বেরুবার পর মিঃ হাসিব একদিন ঢাকায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। পরনে একটা পুরানো লুঙ্গি, গায়ে ময়লা শার্ট, পায়ে ছেঁড়া স্যান্ডেল এবং হাতে একটা ভাঙ্গা ছাতা। আমি বললাম, আপনার এ অবস্থা কেনো?

জবাব দিলেন, আমি এই মাত্র রমনা মাঠ থেকে শেখ মুজিবের বক্তৃতা শুনে এলাম। জনসাধারণের সঙ্গে যাতে অবাধে মিশে থাকতে পারি তাই এই লেবাস পড়ে মিটিং-এ গিয়েছিলাম। কেউ আমাকে শিক্ষিত বলে ঠাওরাতে পারেনি। আমার সামনে ওরা নির্বিঘ্নে কথাবার্তা বলেছে। তিনি বললেন, আমি লক্ষ্য করলাম যে মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে এ দু'বছরের মধ্যেই একটা চাপা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আমি যেভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে ভেবেছিলাম যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এ অঞ্চলে সুখ-শান্তি ফিরে আসবে, অথচ দেখছি যে আমাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দুর্দশা শত গুণে বেড়ে গেছে। তেমনি সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবে লক্ষ্য করলমে, জনসাধারণের মধ্যেও এই বিশ্বাস জন্মেছে যে ইন্ডিয়ার দালালরা তাদের ঠকিয়েছে।

হাসিব সাহেব কিছুকাল পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বিদেশী স্ত্রী দু'টি মেয়ে নিয়ে বৃটেনে থেকে গেছেন। উনি বেঁচে থাকলে তাঁর প্রতিক্রিয়া আরো তীব্র রূপ ধারণ করতো বলে আমার বিশ্বাস।

যাক, আসল কথায় ফিরে আসা যাক। যে মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে পাকিস্তানের আদর্শের বিরুদ্ধে এ দেশের যুব সমাজকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিলো সেটাই হলো পাকিস্তানের পতনের কারণ। শোষণ, অত্যাচার, গণতন্ত্রের অভাব এগুলি ছিলো নিছক ধুয়া। আমি আগেই বলেছি যে এই অভিযান শুরু হয় পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। সুতরাং পাকিস্তানে যা কিছু ঘটেছে তার বিচার আমরা করেছি জন্ডিস রোগাক্রান্ত চোখ দিয়ে। উন্নয়ন যা হয়েছে প্রথম থেকেই বলা হতো যে প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিলো একান্তই অপর্যাপ্ত। যেনো দু'তিন বছরের মধ্যেই আমরা আমরা আগেকার দুশ বছরের অনগ্রসরতা অতিক্রম করে পাঞ্জাবের সমান হতে পারি। দেশ গড়তে যে সময় লাগে বিশেষ করে একটা উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে না উঠলে যে এ অঞ্চলের পক্ষে সমগ্রিকভাবে পাঞ্জাবের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিলো না সে কথা ভুলেই বসেছিরাম বা সে কথা চাপা দেয়া হচ্ছিলো যেনো অল্প শিক্ষিত একজন কবিরাজকে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের পদে বসিয়ে দিলে তিনি সুচারু রূপে তাঁর দায়িত্ব নিষ্পন্ন করতে পারবেন। কিন্তু এই নীতি ক্রমশঃ সিভিল সার্ভিসে, ইউনিভার্সিটিতে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুসৃত হাত থাকে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা পদ অনেকগুলি পেলেন কিন্তু যে অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা থাকলে তাঁরা পুরানো আইসিএস অফিসারদের সমকক্ষ হতে পারতেন, সেটা ছিলো কোথায়?

আইয়ুব খানের আমলে এক পর্যায়ে যখন এ অভিযোগ প্রবল হয়ে দাঁড়ায় যে অবাঙালী অফিসারদের দিয়ে এ অঞ্চল সুচারুভাবে শাসন করা যাবে না তখন স্থির করা হয় যে বাঙালী অফিসারদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনা হবে এবং এখানে অবাঙালী যাঁরা ছিলেন তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হবে। এটা করা হয়েছিলো আওয়ামী লীগ সমর্থিত জনমতের চাপে। কিন্তু এই নীতি গ্রহণ করে বিচ্ছিন্নতার বীজ আরো ভালো করে যেনো রোপণ করা হয়। ৬৯-৭০ সালের দিকে প্রশাসনিক দিক থেকেও চিফ সেক্রেটারী থেকে শুরু করে সব দপ্তরে প্রধান আমলা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানবাসী কোনো ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে প্রথমে যে ব্যক্তি এ অঞ্চলের চিফ সেক্রেটারী হন তিনি ছিলেন কাজী আনোয়ারুল হক।

কথা হলো যে এ অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব অবাঙালী অফিসারদের উপর ন্যস্ত বলে আমাদের অনগ্রসরতা কাটছে না- এ অভিযোগ খন্ডন করার জন্যই আইয়ুব খান এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাতে অভিযোগ খন্ডানো যায়নি। কারণ অভিযোগের উদ্দেশ্য ছিলো তো অন্যকিছু। '৭১ সালের ১৬ই

ডিসেম্বরের পর আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেরাই স্বীকার করলেন যে, পাকিস্তানকে ঘায়েল করার জন্য তারা বিভিন্ন পর্যায়ে নানা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি যে '৪৭ সাল থেকেই যদি কেন্দ্রীয় সরকার এ অঞ্চলে কোনো হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তার ফলও অন্যরূপ হতো না। তখন হয়তো বলা হতো আমরা যে নৈতিক সাহায্য আশা করছিলাম তা পাচ্ছি না বলেই আমাদের কিছু হচ্ছে না। যদি ধরে নেয়া যায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখানে মোতায়েন না করা হতো, অবাঙালী কোনো আইসিএস অফিসারকে এখানে কোনো দায়িত্বে নিয়োগ না করা হতো তবে এ অঞ্চল কি অতিদ্রুত কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের সমকক্ষ হয়ে উঠতো? ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ৫০ সাল পর্যন্ত তিনবার পুলিশ এ্যাকশন করে পূর্ব পাকিস্তান দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন নিরদ চৌধুরী। এক পর্যায়ে জয় প্রকাশ নারায়ণের মতো ব্যক্তিও সৈন্য ঢুকিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের অংশ ছিলাম বলেই এসব দুর্ঘটনা ঘটেনি। আর যদি পাকিস্তান আর্মি এখানে না থাকতো ইন্ডিয়ান আক্রমণের বিরুদ্ধে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার মতো সামরিক শক্তি তো আমাদের ছিলো না। তবুও শুনলাম যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীও ২৩ বছর এ অঞ্চলটাকে শুষে খেয়েছে।

যাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করতেন তাঁরা ছিলেন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী ছিলেন মরহুম আবুল হাশেম এবং মরহুম আবুল মনসুর আহমদের মতো। তাঁরা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন কিন্তু অত্যন্ত অবাস্তবভাবে এ বিশ্বাসও পোষণ করতেন যে প্রথম থেকেই এ অঞ্চলটাকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত ছিলো। এ অঞ্চলের জনসম্পদ সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক অবস্থান এ সবদিকে তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করেননি। শুধু বলেছেন, লাহোর প্রস্তাবে STATES বা একাধিক রাষ্ট্রের কথা ছিলো। অথচ তাঁরা যেনো ইচ্ছাকৃতভাবে এ কথা চেপে যেতেন যে ১৯৪০- এর পর যে পাকিস্তান আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে তার মধ্যে একাধিক রাষ্ট্রের কথা কেউ ভাবতো না। আমরাও ভাবিনি। আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান যে একমাসও টিকতে পারতো না তার উল্লেখ আবুল মনসুর আহমদ বা আবুল হাশেমের কোনো লেখা বা বিবৃতিতে পাইনি। ইন্ডিয়া যখন পাকিস্তানের প্রাপ্য ৯০ কোটি টাকা আটকে দেয় তখন পাকিস্তান টিকে থাকবে কিনা এই প্রশ্ন দেখা দেয়। হায়দরাবাদের নিজামের প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলীর চেষ্টায় নিজামের তহবিল থেকে এ টাকার ব্যবস্থা হলে সংকট কেটে যায়। এরপর অবশ্য অন্তর্জাতিক জনমতের চাপে ইন্ডিয়া

ঐ টাকা ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিলো। প্রশ্ন হলো ৪৭-৪৮ সালে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান এ রকম একটা সংকটের মোকাবেলা করতো কিভাবে?

তারপর ঠিক স্বাধীনতার প্রাক্কালে মাউন্টব্যাটেন আর একটি চাল দিয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে তিনিই হবেন ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের যৌথ রাষ্ট্রপ্রধান। কায়েদে আজম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ এ ক্ষেত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতো না এবং মাউন্টবেটেন এবং কংগ্রেস সম্ভবতঃ প্ল্যান করেছিলেন যে এই কৌশলেই ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের বিভক্তি অচিরেই বাতিল হয়ে যাবে। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যেও তাই ঘটতো। এই অঞ্চলের বহু প্রবীণ রাজনীতিবিদের মুখেও শুনেছি যে মাউন্টবেটেনকে যৌথ গভর্নর জেনারেল হিসাবে মেনে নিলে পাকিস্তান আরো অনেক কিছু পেতো। এই বালসুলভ যুক্তি যে একেবারেই অসার পরবর্তী ইতিহাসে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম।

তবুও শুনছি লাহোর প্রস্তাব সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বলেই আমাদের যতো রাজনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিলো। এবং এ কারণেই নাকি শেষ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অন্যদিকে আরেক দল সমালোচক ছিলেন যারা কোনো কালেই দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করেননি এবং গোড়া থেকে পাকিস্তানকে প্রথমে ঘায়েল এবং পরে একেবারে ধ্বংস করে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলেন। কোন অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিলেই এরা বলতেন ভারত বিভক্ত না হলে এসব ঘটতো না। শতসহস্র মুসলমান বাঙালী নতুন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পে এঁরা অগ্রসর হতে শুরু করলেন, মাড়োয়ারী আধিপত্যের অবসান ঘটলো, শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে সংস্কার করার সুযোগ পেলাম- এ সমস্তই যেনো মিথ্যা কথা। অবশ্য আমি আগেই বলেছি শিক্ষা এবং শিল্প ক্ষেত্রে দেড়শত বছরের অনগ্রসরতার কারণে নতুন সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

পাকিস্তান গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ইস্ট পাকিস্তান সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড স্থাপিত হয়। '৪৭-এর ১৪ই অগস্টের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা শহর বাদ দিয়ে সারা বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা এবং পরীক্ষা পরিচালনার ভার ছিলো কলকাতা ইউনিভার্সিটির উপর। এই দায়িত্ব নতুন বোর্ডকে নিতে হয়। স্বাধীনতার পূর্বে ঢাকায় যে ইস্ট বেঙ্গল এডুকেশন বোর্ড ছিলো তার জুরিসডিকশন বা ক্ষমতা ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজ এবং বাংলা প্রদেশের হাই মাদ্রাসাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ

ছিলো। নতুন ইস্ট পাকিস্তান বোর্ড ব্যাপকতর ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হলো এবং এর প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হন প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ। তিনি মুসলিম লীগ পন্থী রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং বহুদিন করোটিয়া সাদত কলেজের প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত থেকে শিক্ষাবিদ হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই ভদ্রলোক উৎসাহের আতিশয্যে এমন এক কান্ড করে বসলেন যাতে ইংরেজী শিক্ষার মান নিম্নমুখি হতে শুরু করলো। কলকাতা ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রকাশিত বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের রচনা সম্বলিত সংকলন বাদ দিয়ে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ এক নতুন সংকলন বোর্ডের নামে প্রকাশ করলেন। যার মধ্যে ছিলো স্থানীয় লেখকদের ইংরেজী নিবন্ধ। তিনি নিজেও কিছু কিছু লিখেছিলেন। এর ভাষা ছিলো নিকৃষ্ট, অসংখ্য ব্যাকরণ ভুলে জর্জরিত। আরো আশ্চর্য লাগলো যে সংকলনটিতে অর্ধেক ছিলো মুসলমান নেতাদের জীবনী আর অর্ধেকে এমন সব ভারতীয় হিন্দু নেতাদের জীবন আলেখ্য যাঁদের সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতার কারণে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্রের কথা ভাবতে হয়।

আমি তখন সিলেটের এমসি কলেজের ইংরেজীর লেকচারার। সংকলনটি হাতে পেয়ে আমি হতাশ হয়ে ভাবলাম যে এভাবেই যদি পাকিস্তানের শিক্ষা জীবনের শুরু হয় ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। কলকাতা ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভুল ইংরেজী বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্যে তো আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করিনি। তাড়াহুড়া করে কলকাতার সংকলন বাদ দেবার কোনো কারণই ছিলো না। দেশপ্রেমের নামে নিকৃষ্ট বইপত্র প্রচলন করে কি হয় তার প্রমাণ তো গত চার দশকে আমরা প্রচুর পেয়েছি। আমি সিলেট থেকে প্রকাশিত ইস্টার্ন হেরালড নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকে এ সম্বন্ধে বেনামীতে দু'টি প্রবন্ধ লিখি। ১৯৪৮ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেবার পর একদিন বোর্ডের মিটিং-এ ইবরাহীম খাঁ সাহেব অনুযোগের স্বরে আমাকে বললেন, দেখুন, কে এক ভদ্রলোক বোর্ডের সমালোচনা শুরু করে দিয়েছেন। আপনিই বলুন, এ বই-এ সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ অংশ কোনগুলি? আমি জানতাম না যে কিছু কিছু অংশ তাঁর নিজের রচনা। আমি বললাম যে বইটির কোনো প্রবন্ধই ছাত্রদের পাঠ্য হবার যোগ্য নয় আর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি রচনা শৈলী, স্টাইল এবং ব্যাকরণের দিক থেকে সবচেয়ে দূর্বল। আমি তখন জানতাম না যে এগুলি তারই রচিত। প্রিন্সিপাল সাহেব আমার জবাবে একটু হতাশ হলেন। পরে এই সংকলনটি বাতিল করা হয়।

ঘটনার আমি উল্লেখ করছি এই জন্য যে শুধু দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে শিক্ষাগত অযোগ্যতা ঢাকা যায় না। প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ বাংলার লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধ কিন্তু নিজের অপটু ইংরেজী রচনা ছাত্রদের উপর কেনো চাপিয়ে দিয়েছিলেন সেটা আমার পক্ষে বোধগম্য হয়নি।

নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ১৯৫৫ সালে আবার পাকিস্তান অবজারভারে একটি প্রবন্ধ লিখি। এখানেও আমার বক্তব্য ছিলো এই যে নিকৃষ্ট রচনা নিকৃষ্ট কাগজে ছেপে পাঠ্য পুস্তকের অভাব মোচনের যে চেষ্টা আমরা করছিলাম তা সুফলপ্রসু হতে পারে না। আসল কথা হলো, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং অন্যান্য এলাকায়ও পূর্ব পাকিস্তানে যাঁদের উপর দেশ গঠনের গুরু দায়িত্ব হয়েছিলো তাঁরা ছিলেন অপেক্ষাকৃতভাবে অনভিজ্ঞ এবং অযোগ্য। প্রথম থেকেই বাঙালী, অবাঙালীর প্রশ্ন তুলে অবাঙালী অফিসারদের বিশ্বাস করা হতো না। আজিজ আহমদ, এন এম আহমদ, জিএম মাদানী প্রমুখ আইসিএস অফিসার যাঁরা কর্মজীবনের শুরু থেকে এ অঞ্চলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে শুনেছি যে তাঁরা নাকি পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন অবিশ্বাস প্রচারণার ফল আরো তীব্র হয়ে উঠে, এরা সব এ অঞ্চল ত্যাগ করে যান। আমরা আরো অপটু কর্মচারীর খপ্পরে পড়ি।

একদিকে ছিলো এক শ্রেণীর মধ্যে পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধা, অন্যদিকে অপটুত্ব এবং অকর্মণ্যতা। কাজেই কয় বছরের মধ্যে নিন্দুকের দল তাদের সমালোচনার সপক্ষে এমন সব যুক্তি- প্রমাণ বের করতে পারলেন যার দ্বারা জনসাধারণকে বুঝানো যায় যে সত্যি এ অঞ্চলে কিছু হচ্ছে না।

কোটার ভিত্তিতে আমাদের অঞ্চলের অর্থনীতিবিদরা কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য হয়েছেন, কিন্তু এঁরা ঢাকায় এসে অনেক কথা বলতেন, যাতে মনে হতো যে পশ্চিম পাকিস্তানী আফিসারবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করতে একেবারেই নারাজ ছিলেন। এ রকম কথা স্টেট ব্যাংকের গভর্নর রশীদ, প্রফেসর নূরুল ইসলাম, ডক্টর নুরুল হুদা প্রমুখর মুখে শুনেছি। একবার আমি যখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর তখন পদাধিকার বলে আমাকে একবার ইকনমিক কাউন্সিল জাতীয় একটা কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে হয়। কাউন্সিলটির নাম এ মুহূর্তে আমার ঠিক মনে পড়ছে না তবে সম্ভবতঃ এটা ১৯৭০ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। সভায় সভাপতিত্ব করলেন এম এম আহমদ। পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর সুনাম ছিলো। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম আমাদের

সদস্য নুরুল ইসলাম তাঁর প্রস্তাবগুলির একটুও সমালোচনা করতে সাহস পেলেন না। আমি তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। কথা ছিলো কোনো ভোটাভুটি হলে আমরা তাঁর সমর্থন করবো, কিন্তু উনি যখন কোনো কথাই বললেন না তখন ভোটাভুটির প্রশ্নই উঠেনি, এই ছিলো শোষণের আসল চিত্র। মিটিং শেষ হবার পর আমি নুরুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করলাম যে প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্ত আপত্তির কথা বলেছিলেন সেগুলি উত্থাপন করলেন না কেনো? আমরা তাঁকে সমর্থন করতাম। এর কোনো সদুত্তর পাইনি। এম এম আহমদের ব্যক্তিত্বের সামনে তিনি এতই সংকুচিত হয়ে পড়েছিলেন যে কোনো কথা বলবার সাহস তাঁর হয়নি। অথচ এই ব্যক্তি ঢাকায় অনেক কথা বলতেন যে যার মানে হলো যে পশ্চিম পাকিস্তান অনবরত আমাদের। শোষণ করে যাচ্ছে।

আমি এ সমস্ত কথা বলছি এই যুক্তির সমর্থনে যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ এবং অর্থনীতিবিদরা হয় এমন উদ্ভট প্ল্যান উপস্থিত করতেন যা পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধেই হুমকিস্বরূপ। অর্থাৎ যার মধ্যে রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি নেই। অথবা যেখানে ন্যায়সঙ্গত আপত্তির কোনো কারণ ছিলো সেখানে ভয়ে কোনো কথাই বলা হতো না আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর একদিকে যেমন রাইটার্স গিল্ড গঠন করে দু' অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীদের তাঁর নিজের রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন- (সে ঘটনা আগেই উল্লেখ করেছি) তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন আঙ্গিকে সাজাবার একটা প্রক্রিয়াও শুরু করেন। শরিফ কমিশন এই প্রক্রিয়ারই ফল। এই কমিশনের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে প্রফেসর আতাউর হোসেন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর ডক্টর আবদুর রশীদ যুক্ত ছিলেন। কমিশন একজন বা একাধিক আমেরিকান বিশেষজ্ঞকে শিক্ষা সংস্কারের দায়িত্বে নিয়োগ করে। কয়েক মাস পর তাদের রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয় আমরা স্তম্ভিত হলাম। কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব কলেজের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে স্কুলের উপর ন্যস্ত করতে হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিলো যে বিএ পাস কোর্সের মেয়াদ দু'বছরের জায়গায় বাড়িয়ে তিন বছর করা হবে। অনার্সের মেয়াদও হবে আগের মতো তিন বছরই তবে অনার্সের পর যারা এম এ- এমএসসিতে ভর্তি হবে তারা অনার্স ডিগ্রী থাকলে এক বছরের মধ্যেই এম এ- এমসি- এমকমের জন্য পরীক্ষা দিতে পারবে। আর বিএ পাস ডিগ্রী প্রাপ্ত ছাত্ররা দু'বছরের কোর্স নিবে। মানে

হলো একই ডিগ্রীর জন্য এক শ্রেণীর ছাত্রের লাগবে দু'বছর আর আরেক শ্রেণীর ছাত্রের লাগবে এক বছর।

শরীফ সাহেব যখন ঢাকায় এসে ভাইস চান্সেলর মাহমুদ হোসেন সাহেবের বাসায় ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের সঙ্গে তাঁর কমিশনের সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা করেন, আমরা অনেকেই তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে তিনি যে সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছেন তা অত্যন্ত অবাস্তব এবং তার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশৃংখলা ঘটবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ভার গ্রহণের ক্ষমতা কোনো স্কুলের নেই। এবং তাদের উপর নতুনভাবে এই ক্ষমতা ন্যাস্ত করতে গেলে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া এম এ ডিগ্রীর মেয়াদে যে তারতম্য তারা ঘটিয়েছেন সেটা ছাত্র সমাজের কাছে মোটেই যুক্তিযুক্ত মনে হবে না। অতিরিক্ত এক বছরের ব্যয়ভার গ্রহণ করাও সাধারণ পরিবারের পক্ষে সম্ভব হবে না।

এ কথা সবাই জানেন যে, শেষ পর্যন্ত শরীফ কমিশনের সমস্ত সুপারিশ পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যে দু'তিন বছর এ সংস্কার চালু ছিলো তার প্রভাবে অনেক অনাবশ্যক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো। আর এরই বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিলো পূর্ব পাকিস্তানে। অথচ কমিশনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি যাঁরা ছিলেন তাঁরা অকপটে শরীফ সাহেবকে সমর্থন জানিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মোকাবিলায় তারা সংকুচিত বোধ করতেন।

শরীফ সাহেব যে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, তা নয়। অকৃতদার এই ব্যক্তি এক স্বপ্ন জগতে বাস করতেন। তিনি ভাবতেন মার্কিন বিশেষজ্ঞরা যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছেন তা গৃহীত হলে দেশ শনৈ শনৈ অগ্রসর হবে।

আমি নিজে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে সংস্কার উপর থেকে চাপিয়ে না দিয়ে নীচের ক্লাস থেকে শুরু করলে ছাত্ররা নতুন নিয়মে পরীক্ষা দিতে এবং পড়াশোনা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। এখানেও দেখরাম কমিশনের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা শরীফ সাহেবকে সমর্থন জানিয়ে বললেন যে, এদেশে ধীরে সুস্থে কিছু করতে গেলে কাজ হয় না; নতুন সরকারের হাতে যখন নিরংকুশ ক্ষমতা রয়েছে একই সঙ্গে নিম্নতম শ্রেণী থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস পর্যন্ত চালু করা সমীচীন হবে। অর্থাৎ যে সমস্ত ছাত্র দু'বছরের বিএ কোর্সে ভর্তি হয়েছে তাদেরও আরেক বছর ক্লাস করতে হবে। যখন এই নিয়ে প্রচন্ড আপত্তি উঠতে থাকে তখন ভাইস চান্সেলর মাহমুদ হোসেন সাহেব এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন যে, যারা দু'বছরের কোর্স শেষ করেছে তারা নীতিগতভাবে পরীক্ষা ছাড়াই

ডিগ্রী পাওয়ার যোগ্য। কারণ তারা তাদের কোর্স সমাপ্ত করেছে। এভাবে তখন কয়েক হাজার ছাত্র- ছাত্রী বিনা পরীক্ষায় বিএ, বিএসসি, বিকম ডিগ্রী পেয়েছিলো। পরীক্ষা দিলে কেউ ফার্স্ট, কেউ সেকেন্ড আবার কেউ থার্ড ডিভিশন পেতো। আবার কেউ ফেল করতো। কিন্তু ঢালাওভাবে বিনা পরীক্ষায় ডিগ্রী প্রাপ্তির এই ঘটনা নজিরবিহীন। এবং এর কুফল থেকে আমরা এখনো রক্ষা পাইনি।

শরীফ কমিশন নিয়ে হৈচৈ এখানেই সমাপ্ত হয়নি। কমিশনের রিপোর্ট সংশোধন করার জন্য পরবর্তী সময়ে জাস্টিস হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকটি কমিশন গঠিত হয়েছিলো। তাঁর সুপারিশের বিরুদ্ধেও প্রবল আপত্তি সৃষ্টি হয়। এবং শেষ পর্যন্ত এই দুইকমিশনই একটা প্রহসনে পরিণত হয়। এদেঁর রিপোর্টে যে কোন সুষ্ঠ সুপারিশ ছিলো না তা নয়। কিন্তু কতগুলি ভুলের জন্য শিক্ষা সংস্কারের এ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাকিস্তান বিরোধী দলের মধ্যে এ দু'টি কমিশনকেই পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করা হতো। দ্বিতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান জাস্টিস হামিদুর রহমান ছিলেন এ অঞ্চলেরই অধিবাসী। আর শরীফ কমিশনেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন। যদি এই কমিশনগুলোর সুপারিশ সত্যিই বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে, আমাদের প্রতিনিধিরা আগে মুখ খুললেন না কেনো?

আসল কথা হচ্ছে যে আমাদের আমলা, শিক্ষাবিদ প্রমুখ যাঁরা পাকিস্তানের কারণে, বহুক্ষেত্রে কোটার জোরে, গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, অভিজ্ঞতায় এবং কর্মক্ষমতায় তাঁদের অধিকাংশই অবাঙালী কর্মচারীদের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁদের সামনে এঁরা কাবু হয়ে পড়তেন এবং নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকবার উদ্দেশ্যে বাইরে এসে অভিযোগ করতেন যে ওঁদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁরা কিছু করতে পারেননি। ষড়যন্ত্রের অজুহাত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চাদপদতা ব্যাখ্যা দেবার প্রবণতা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে ষাটের দশকে এসে শেখ মুজিব এবং তাঁর সহকর্মীরা যত্রতত্র ষড়যন্ত্রকারীদের সন্ধান পেতেন। অথচ সত্য কথা হচ্ছে পাকিস্তানে গণতন্ত্র এবং শাসনতান্ত্রিক বৈধতার বিরুদ্ধে যতগুলি ষড়যন্ত্র হয়েছে তার মূলে ছিলেন এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ। এঁদের সমর্থন নিয়েই গোলাম মোহম্মদ প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালে ইস্কান্দর মির্জা এবং জেনারেল আইয়ুব খানের ষড়যন্ত্রের সঙ্গেও পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়ার মোহম্মদ আলী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী জড়িত ছিলেন। মোহাম্মদ আলী তো বটেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবও ইস্কান্দর মির্জার অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয়ে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য

করেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো ব্যক্তি যাঁকে তাঁর স্তাবকেরা গণতন্ত্রের মানসপুত্র ও অতন্দ্র প্রহরী বলে চিহ্নিত করে রেখেছে তিনি কোন যুক্তিতে ইস্কান্দর মির্জার মতো গণতন্ত্রের শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়েছিলেন, সেটা আমার কাছে রহস্যময়। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী সভায় আবুল মনসুর আহমদের মতো ব্যক্তিও ছিলেন। এঁদের সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে মিলিটারি শাসন স্থায়ীভাবে কায়েম হতে পারতো না। যে ব্যক্তিটিকে গোলাম মোহাম্মদ বরখাস্ত করে প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন সেই নাজিমুদ্দিন সাহেবকে আওয়ামী লীগ মহলে নানাভাবে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করা হয়। অথচ তিনি একবারও ক্ষমতার লোভে কোনো মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করেননি এবং সামরিক শাসনের সঙ্গে সহযোগিতাও করেননি। বরঞ্চ মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহ যখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ইলেকশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন। অদৃষ্টের এমন পরিহাস যে বাংলাদেশের ইতিহাসবেত্তারা তাঁকে বলছেন পশ্চিম পাকিস্তানের তাবেদার, গণতন্ত্রের দুশমন ইত্যাদি।

১৯৫৮ সালে যে ক্যুর মাধ্যমে শাসনতন্ত্র একেবারে বাতিল করে ইস্কান্দর মির্জা এবং আইয়ুব খান ক্ষমতা অধিকার করেন তার পিছনেও রয়েছে এক কলংকের ইতিহাস। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই জানে না যে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান যখন একক ক্ষমতার মালিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ইস্কান্দর মির্জাকেও সরিয়ে দেন তার পিছনে জনমতের একটা বিরাট অংশের সমর্থন ছিলো। দেশের দুই অংশেই চরম অরাজকতার ফলে একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো। সে বছরই পূর্ব পাকিস্তানে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী আওয়ামী লীগের কতিপয় সদস্যের হাতে নিহত হন। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে শহীদ সাহেবের দল প্ল্যান করেছিলো যে যেমন করেই হোক তারা ইলেকশনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। দেশের সর্বত্র গুন্ডা বাহিনী নিয়োজিত করা হয় যাদের উপর ভোট কেন্দ্র দখল করে ব্যালট বক্স ছিনতাই করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এ রকম গুজব সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্য সৈয়দ কামরুল আহসান- যাঁর নাম আমি আগে উল্লেখ করেছি- তাঁর আত্মজীবনীমূলক PORTRAITS FROM MEMORY নামক বইয়ে লিখেছেন যে আওয়ামী লীগের এই ষড়যন্ত্র না হলে আইয়ুব খান জনমতের সমর্থন লাভ করতে পারতেন না। আজ ৩৩- ৩৪ বছর পর এ সমস্ত কথা অনেকেই ভুলে গেছেন। যাদের বয়স পঞ্চাশের নীচে তাদের এ সমস্ত কথা জানবারও কথা নয়।

কিন্তু কেনো এবং কি উপায়ে ষাটের দশকের শেষদিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা গণবিক্ষোভ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিলো সেটা বুঝতে হলে এ সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন।

১৯৬৫ সনের যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালী বিরোধী মনোভাব যখন তীব্রতর হতে শুরু করে তখন আগাখানী এবং বোহরা সম্প্রদায়ের অনেক ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি বাড়ীঘর এবং ধন- সম্পত্তি বিক্রয় করে এ অঞ্চল থেকে সরে পড়েন। তাঁরা এসেছিলেন স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করে ব্যবসা- বাণিজ্য করবেন এ উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল আওয়ামী লীগের অবাঙালী বিরোধী অভিযান। এর ফলে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক অবস্থার আরো দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

এমন কি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ভাইস চান্সেলর ডক্টর মাহমুদ হাসান ও ডক্টর মাহমুদ হোসেন যাঁরা উভয়েই ঢাকায় বাড়ীঘর তৈরী করেছিলেন, তাঁরা এসব বিক্রি করে ফেলেন। ডক্টর আহমদ হাসানদানীর মতো অধ্যাপক যিনি প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং যাঁর চেষ্টায় পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়, তিনিও চলে যান। এ রকম আরো অনেকে যাঁদের সুবিধা ছিলো, পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে যান। এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এ অঞ্চলে একটা বিশেষ দল যে জাতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে যাচ্ছে তাতে একটা বিস্ফোরণ ঘটবার আশংকা সৃষ্টি হচ্ছিলো। আগে সেখানে কাবুলী, পেশোয়ারী, বিহারী, উত্তর প্রদেশের আগ্রা- দিল্লীর লোকেরা ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে অবাধে বসবাস ও ব্যবসা- বাণিজ্য করতে পারতো এবং তাদের কেউ বিদেশী মনে করতো না। কারণ তারা ছিলো মুসলমান। সেই পরিবেশে একটা আমূল পরিবতর্ন ঘটছিলো। আমি যে বাসায় শিক্ষা জীবন কাটিয়েছি সেখানে চাকর- বাকর সবই ছিলো বিহারের দার ভাঙ্গ এবং মুংগের জেলার। একজন হিন্দু উড়িয়া মালিও ছিলো। বাড়ীতে দারোয়ান বা নৈশ প্রহরী ছিলো একজন পাঞ্জাবী। কখনো মনে হয়নি এরা বিদেশী। কারণ ঐ উড়িয়াকে বাদ দিলে আর সবাই ছিলো মুসলমান। আমরা মনে করতাম ঐ উড়িয়া মালিই বিদেশী। আর অন্য সবাই এক জাতের।

৬০ দশকের ক্রমাগত প্রচারণার ফলে এবং ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে পাকিস্তানের ভিত্তিমূল ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে পড়তে থাকে। উর্দূভাষী একজন সাধারণ কুলিকে দেখলেও বলা হতো এরা শোষকের দলের লোক। বৃটিশ আমলে এবং পাকিস্তানের প্রথম দিকে রেলওয়ে স্টেশনে, স্টিমারঘাটে বহু উর্দূভাষী গরীব

বিহারী কুলিগিরি করতো। বাস্তবিক পক্ষে কুলিদের সঙ্গে উর্দুতেই কথা বলতে হয়। এই অভ্যাস প্রায় সবারই হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৪৭ সালের পর আরো কয়েক লক্ষ মোহাজের বিহার-উড়িষ্যা এবং কোলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ৪০/৫০ বছর আগে থেকে যে সমস্ত উর্দূভাষী এ অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস করছিলো এবং স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলো। তাদেরও এখন চিহ্নিত করা হলো চক্রান্তকারী দুশমন হিসাবে। অল্প পুঁজির ব্যবসায়ীদের কথা জানতাম যারা ঢাকার চকবাজার, মৌলবীবাজার, উর্দু রোড, মোগলটুলি প্রভৃতি এলাকায় জর্দার দোকান, পান-বিড়ির দোকান, টুপির দোকান প্রভৃতি ছোট ছোট ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতো, তারাও হলো আমাদের দুশমন। এবং ৭১ সালে এরা অনেকে তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর হাতে নির্মমতার শিকার হয়েছে।

এ কথা স্বীকার করবো যে ৪৭-এর আগে যে সমস্ত অবাঙালী অফিসার বা সাধারণ লোক কোনো কালে পূর্ব বাংলায় আসেনি তাদের একটা ধারণা ছিলো যে বাংলাভাষী মুসলমানরা সম্ভবত ভালো মুসলমান নয়। তারা কেউ কেউ ইসলাম এবং উর্দুকে সমান করে দেখতো। এরকম কথাবার্তায় অনেক বাংলাভাষী ক্ষুদ্ধ হতো। ফিরোজ খান নুন, যখন এই প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হোন তিনি এই ধারণা নিয়ে এসেছিলেন যে এ অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে খতনা প্রথা নেই। তিনি আরো এক কান্ড করেন। বিনা মূল্যে গ্রামে গ্রামে কোরআন বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। যেনো এ অঞ্চলের মুসলমানরা ভালো করে কোরআন শরীফের সাথে পরিচিত নয়। অথচ পূর্ববঙ্গের এমন কোনো পাড়া-গাঁ নেই যেখানে মসজিদে এবং অধিকাংশ মুসলমান বাড়িতে কোরআন পাওয়া যেতো না। কোরআন বিতরণ করা কোনো দোষের কাজ নয়, কিন্তু যে ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি কোরআন প্রচারের প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছিলেন সেই ধারণার মূলে সত্য কিছুই ছিলো না। আবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরোজ খান নুন-(যিনি ইংরেজীতে একটা উপন্যাস এবং একটি আত্মজীবনী প্রকাশ করেন এবং পরে এককালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন)-এটা বুঝতেন যে পূর্বাঞ্চলের ভাষা বাংলার সঙ্গে পরিচিত না হলে এখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা দুরূহ। আমার পরিচিত ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের এক অধ্যাপককে তাঁর জন্য বাংলা টিউটার নিযুক্ত করা হয়। ঢাকায় ভিকারুননেসা স্কুলটি তাঁর বৃটিশ স্ত্রীর প্রচেষ্টার ফল।

তাই বলছিলাম যে এ অঞ্চলের ভাষা এবং কালচার সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই কোনো কোনো অবাঙালী অফিসার বা প্রশাসক যে সমস্ত মন্তব্য করতেন

বলে শুনেছি সেগুলি পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এঁদের সংখ্যা ছিলো মুষ্টিমেয়। কিন্তু তবুও তাঁরা যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিরেন তাকে কোন রূপেই মার্জনীয় মনে করা যায় না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম এডুকেশন সেক্রেটারী এক অবাঙালী আইসিএস মিঃ ফজলে করীম প্রস্তাব করে বসেন যে বাংলা আরবী লিপিতে লেখা উচিত। একথা আমরা অনেকেই ভুলে গেছি যে হরুফুল কোরআন বলে একটা আন্দোলন অনেক দিন থেকে এ অঞ্চলে চালু ছিলো। এক মওলানা সাহেব আরবী লিপিতে চাটগাঁ থেকে একটা বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করতেন। এ কথা সত্য যে এ আন্দোলনের পিছনে বাংলাভাষী কিছু কিছু লোকের সমর্থন ছিলো। কিন্তু অবাঙালী আইসিএস অফিসার যখন এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন তখন সবাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন তুললো যে বাংলা কিভাবে লিখিত হবে সে সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার তাঁর কোথায়? পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত পন্ডিত সুনীতি চ্যাটার্জী বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষাগুলির জন্য একটা সাধারণ লিপি গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং তিনি বলতেন রোমান লিপির কথা। সুভাষ চন্দ্র বসুও কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর অভিভাষণে ঐ প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর একথাও শুনেছি যে তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় নাকি তাঁর উপন্যাসগুলি দেবনাগরী অক্ষরে ছাপাবার পক্ষপাতী ছিলেন। এ সমস্ত প্রস্তাব যাঁদের কাছ থেকে এসেছিলো তাঁরা সবাই ছিলেন বাংলাভাষী। সুতরাং অবাঙালীরা কেউ বাংলা ভাষার চরিত্র বদলাবার চক্রান্তে নেমেছে তখন এ কথা বলা চলতো না। কিন্তু মিঃ ফজলে করীম ফজলীর প্রস্তাবে যারা আরবী লিপির সমর্থন করতো তারাও অস্বস্তিবোধ করেছে। তারপর ইতিমধ্যেই ৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে তমুদ্দুন মজলিস গঠিত হওয়ায় বাংলা ভাষা নিয়ে একটা পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিলো। সেই পরিস্থিতিতে যখন ফজলে সাহেবের প্রস্তাব শোনা গেলো সেটা চক্রান্তকারীদের জন্য হলো সোনায় সোহাগা।

এ সমস্ত ছোটোবড়ো নানা ঘটনার সমন্বয়ে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিলো যে যখনই কোনো পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ বা কর্মচারী অবাঙালী কোনো অফিসারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে অবাঙালী ব্যক্তিটিকে পূর্ব পাকিস্তানের চরম শত্রু বলতে দ্বিধা করেননি। ফলে অনেক অবাঙালী অফিসার হতাশ হয়ে এ অঞ্চল থেকে ট্রান্সফার নেয়ার চেষ্টা করতেন। নতুবা রাগের মাথায় ঝগড়া-বিবাদ করতে শুরু করতেন। এ ঘটনা পরম্পরাও হলো চক্রান্তকারীদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। বাঙালী অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, আমলা, কারিগর যে পর্যাপ্ত সংখ্যায় নেই এ কথা যেনো পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধেই চাপা পড়ে

গেলো। তখন কোন কোন রাজনীতিকের মাথায় এই বুদ্ধি এলো যেকোন রকমে এই অবাঙালী ও কারিগরদের তাড়িয়ে দিলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির পথে সমস্ত অন্তরায় অপসারিত হবে। এ সমস্ত রাজনীতিক সবাই যে সজ্ঞানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চক্রান্তে নেমেছিলেন, মোটেই নয়। কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান এবং বাস্তবতাবোধ থাকলে- তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের সত্যিকারের ভবিষ্যৎ কোথায় তা বুঝতে পারতেন, সেটা তাঁদের ছিলো না। বাংলায় আমরা বলি ফলেন পরিচয়তে অর্থাৎ ফল দিয়ে বৃক্ষের পরিচয়। এদেঁর দূরদৃষ্টি অভাবজনিত সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষিত হলো না। এই অনস্বীকার্য সত্যের আলোকে পূর্ববর্তী ২২ বছরের ইতিহাস বিচারের অপেক্ষা রাখে। এঁদের মধ্যে যাঁরা এখন সমস্ত দোষ পশ্চিম পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে তাঁরা হলো একমাত্র দেশপ্রেমিক তাদের নিজেদের কর্মকান্ডের বিশ্লেষণ করলেই এই যুক্তি আর টেকে না।

'৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসে কারাগার মুক্ত হয়ে '৭৫ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেশে ছিলাম। তারপর জীবিকার অন্বেষণে বিদেশে যেতে হয়। '৭৪ সনে দেশে যে অশনি সংকেত দেখেছি তখন হয়তো সমালোচকের দল বলতে পারতো যে ওটা আমার ব্যক্তিগত হতাশার প্রতিলফন মাত্র। কিন্তু আজ ১৯৯২ সালে যখন এ সমস্ত কথা লিখছি তখন এ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে '৭৪ সনে যে আশংকায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভীত হয়ে উঠেছিলাম সেটা মোটেই অমূলক ছিলো না। বাংলাদেশের বয়স বিশ বছর হলো। এখনও আমাদের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভিক্ষার উপর। সাহায্যদাতা দেশগুলির দয়া না পেলে আমাদের পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। আমাদের পাট, চা, চামড়া এ সমস্ত কাঁচামাল নিয়ে নাকি পাকিস্তানীরা ব্যবসা- বাণিজ্য করে আমাদের সম্পদ শোষণ করতো তা সবই রয়ে গেছে কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের কোন উন্নতি হয়নি। আজ অধিকাংশ কলকারখানা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে আছে, নচেৎ প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিয়ে সেগুলো চালু রাখা হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম জুট মিল আদমজী মিলে নাকি দৈনিক প্রায় এক কোটি টাকার মতো লোকসান হয়। এ মিলটি বাংলাদেশ সরকার জাতীয়করণ করেছিলেন। সুতরাং উৎপাদন হোক বা না হোক শ্রমিকদের বেতন এবং বোনাস দিতে হয়। চিনিতে এককালে পূর্ব পাকিস্তানে সারপ্লাস ছিলো অর্থাৎ উৎপাদিত চিনি আমরা রপ্তানী করতে পারতাম। সেখানে আজ রয়েছে চিনির অভাব। আমদানী করে ঘাটতি মেটাতে হয়। পাটের আন্তর্জাতিক বাজার ইন্ডিয়া দখল করে নিয়েছে এবং সেটা বিচিত্র কিছু নয়।

বিদেশী ক্রেতারা যেখানে সুবিধা বেশি পাবেন সেখানেই যাবেন। অন্যান্য পণ্যের ব্যাপারেও আমরা প্রতিযোগিতায় ইন্ডিয়ার সঙ্গে পেরে উঠছি না। কারণ স্থানীয় প্রায় প্রত্যেকটি বস্তুর দাম আমদানীকৃত পণ্যের চেয়ে বেশি। শিল্পপতিরা বলেন যে, এর কারণ এখানে বিদ্যুৎ, গ্যাস, ফোন প্রভৃতি খাতে তাঁদের ইন্ডিয়ার চেয়ে দ্বিগুণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিন- চার গুণ বেশি চার্জ দিতে হয়। ভারতের পণ্য চোরাপথে আমদানী করেও তার চেয়ে সস্তা দরে বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব। কৃষিক্ষেত্রে অবস্থা এতো শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পেয়াজ- রসুন, আদা, মরিচ সবই আমাদের আমদানী করতে হচ্ছে। এমন কি আজকাল আমরা সুপারীও আমদানী করি।

পাকিস্তান আমলে শুনতাম কর্ণফুলী মিলের কাগজ আর খুলনা নিউজপ্রিন্ট পাকিস্তানীরা আমাদের ঠকিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতো। এবং ওগুলো আবার চড়া দরে আমাদের কাছে বিক্রয় করতো। আজ এক দিস্তা সাদা কর্ণফুলী কাগজের দাম কমপক্ষে দশ টাকা। ষাট পৃষ্ঠার একটা খাতার দাম নয় থেকে দশ টাকা। টাইপের কাগজ ৫০০ শিটের এক বান্ডিল ১২০ টাকা। ষাটের দশকে বাজারের সেরা লুঙ্গি কেনা যেতো ১৪/১৫ টাকায়, একটু কম দামের লুঙ্গি ৫/৬ টাকায় পাওয়া যেতো। এখন ভালো লুঙ্গি একটা কিনতে হলে লাগে প্রায় ৩০০ টাকা। অতি সাধারণ লুঙ্গির দাম ১৫০/১৭৫ টাকা। ভালো চালের দর উঠেছে ৬৫০/৭০০ টাকা। পঁচিশ টাকা কিলোর নীচে পোলাও এর চাল পাওয়া যায় না। মুসুরির ডালের দাম ২৫/২৬ টাকা কিলো। চিনি কিলো প্রতি ২৫ থেকে ৩০ টাকা। এ রকম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যা না হলে জীবনধারণ করাই অসম্ভব তা চলে গেছে ধরা- ছোঁয়ার বাইরে। পাকিস্তান আমলের তুলনায় জিনিসপত্রের দাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৭/৮শ' গুণ বেড়ে গেছে। আমি যখন প্রথম পরিবারের জন্য হরলিক্স কিনতে শুরু করি তখন প্রতি বোতলে লাগতো পঞ্চাশ পয়সা। ১৯৭০ সালে এক বিয়ে উপলক্ষে দশ টিন ডানো দুধ কিনেছিলাম দুইশ' আশি টাকায়, প্রতি টিন আটাশ টাকা হিসাবে। এখন দুইশ' আশি টাকায় এক টিনও কেনা সম্ভব নয়।

পৃথিবীব্যাপী ইনফ্লেশনের প্রভাব এই ব্যাপারে অবশ্যই আছে। কিন্তু বাংলাদেশে দুর্নীতি, প্রশাসনিক অযোগ্যতার কারণে আমাদের যে খেসারত দিতে হচ্ছে তার নজির ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানে নেই। ইন্ডিয়ার বাজারে তুলনামূলকভাবে কাপড়- চিনি, চাল, আটা সবই সস্তা। আরো একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ করবো। বর্তমানে নাকি বছরে ৫০০ কোটি টাকার গুঁড়ো দুধ আমদানী করা হয়। কারণ দু'টো। প্রথম হলো দেশে দুধের উৎপাদন বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ গুঁড়ো দুধের ব্যবসা যারা করে তারা ষড়যন্ত্র করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে দুধ উৎপাদনে কেউ উৎসাহী না হয়ে উঠতে পারে। এ রকমভাবে দেখছি যে সর্বক্ষেত্রেই দেশের উৎপাদন হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা এমন পর্যায়ে নেমে এসেছে যে বাধ্য হয়েই নূন্যতম চাহিদা মেটানোর জন্য এটা- ওটা- সেটা আমদানী করতে হয়। অসংখ্য ভুঁইফোঁড় ব্যবসায়ী এলসি খুলে দেশ থেকে টাকা পাচার করেন অথচ যে সমস্ত জিনিস আমদানী করার কথা তা বাজারে দুষ্প্রাপ্য। তার মানে মুষ্টিমেয় অসাধু ব্যবসায়ীর শিকারে পরিণত হয়ে বাংলাদেশ এমন অবস্থায় নেমে এসেছে যে প্রতিবছর সাহায্যদাতা কনসর্টিয়ামের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। বতর্মানে কোন সরকার কনসর্টিয়াম থেকে আবেদন- নিবেদন করে ভিক্ষা করে কি পরিমাণ ডলার আনতে পারেন সেটাই সে সরকারের কৃতিত্বের বড় মাপকাঠি। ১৯৯১ সালে যে জলোচ্ছ্বাসে কয়েক হাজার লোক প্রাণ হারায় তখন আমরা বিদেশ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি, সে জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা সবাই আমরা জানি। কিন্তু দুঃখ্য লাগলো যখন আমাদের ভিক্ষা প্রবণতার প্রতি তীর্যক ইঙ্গিত করে বিদেশী কাগজে মন্তব্য করা হলো যে বাংলাদেশ থেকে প্রাণহানির যে সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ এ রকম দুর্ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে ভিক্ষার পরিমাণ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে বাঙালীরা ওস্তাদ।

আরো আশ্চর্যের কথা যে তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা যারা '৭১ সালে তাদের ভূমিকা নিয়ে গর্ব করে বেড়ায় তারাই আবার দেশের অভাব, অরাজকতা প্রভৃতির অজুহাত তুলে খোলাখুলিভাবে বলতে শুরু করেছে যে বাংলাদেশের পক্ষে ইন্ডিয়ার একটা প্রদেশ হিসাবে পুনঃপ্রত্যাবর্তনই হবে তার ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক। আশ্চর্য যুক্তি বটে! তার মানে তারা কোন দিনই এ অঞ্চলের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেনি। যে বাংলা ভাষা নিয়ে এতো লম্ফঝম্ফ তা নিয়েও তাদের মাথা ব্যথা নেই। তারা নিশ্চয়ই জানে যে ভারতের অংশ হিসাবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দী। তাহলে পাকিস্তান বিরোধী যে আন্দোলনের পরিণতি হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, একদল লোক এটাকে পূর্ব পাকিস্তানের ভারতভুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কাজে লাগিয়েছে। এরাই বলছে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে একটা অবাস্তব স্বপ্ন মাত্র। যারা ৪০ দশকে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো তারা চেয়েছিলো এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাতে এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পাকিস্তান থেকে

এ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এর নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক চরিত্র বদলায়নি। সুতরাং বাংলাদেশ যদি বর্তমান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারে তা হলে ৪০ দশকে আমরা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম তা অন্ততঃ আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশে তাই এক অদ্ভুত রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। ‘৭১ সালে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধিতা করেছিলো তাঁরাই বর্তমানে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রকৃত- সপক্ষ শক্তি। '৭১ সালে যে চক্রান্তের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিলো তার আসল রূপ বদলায়নি। শুধু বদলেছে কতগুলি লেবেল। দু'পক্ষের মধ্যে এই সংঘাত কিরূপ নেবে তার ওপর নির্ভর করছে এদেশের ১২ কোটি জনগণের সত্যিকার ভবিষ্যৎ।

(অবশিষ্ট অধ্যায়গুলো (২, ৭ ও ১১) শিঘ্রই এখানে সংযোজন করা হবে। তবে সেসব অধ্যায়গুলো ছবি হিসেবে পেতে নিম্নের লিঙ্ক পরিদর্শন করুন, www.storyofbangladesh.com)